প্রকাশক
সুশীলকুমার সিংহ
নতুন সাহিত্য ভবন
৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট
কলিকাতা-২০

মুদ্রক
দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং প্রাইভেট লিঃ
২৮ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

নক্‌শা
অমূল্য দাশ
রণেন্দ্রমোহন সিংহ

প্রচ্ছদপট
পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

দাম পাঁচ টাকা

— এই লেখকের —

মহাকাশের ঠিকানা ॥ পৃথিবীর ঠিকানা ॥ মানুষের ঠিকানা

অনিলকুমার সিংহ্

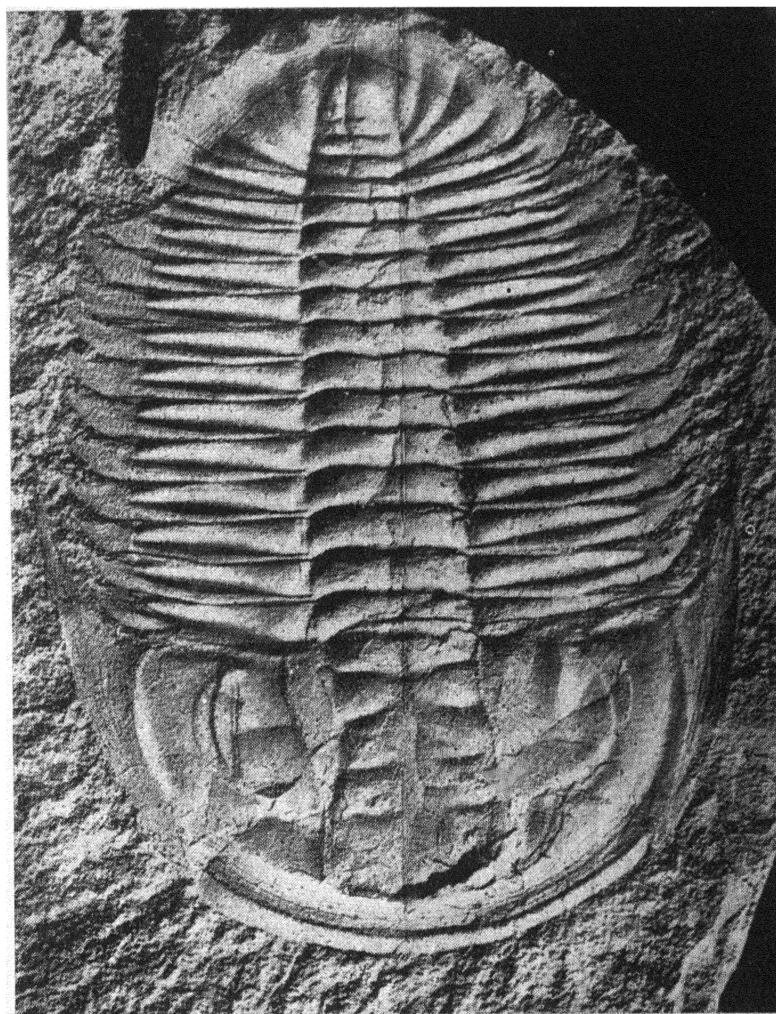
বন্ধুবরেষু

সূচীপত্র

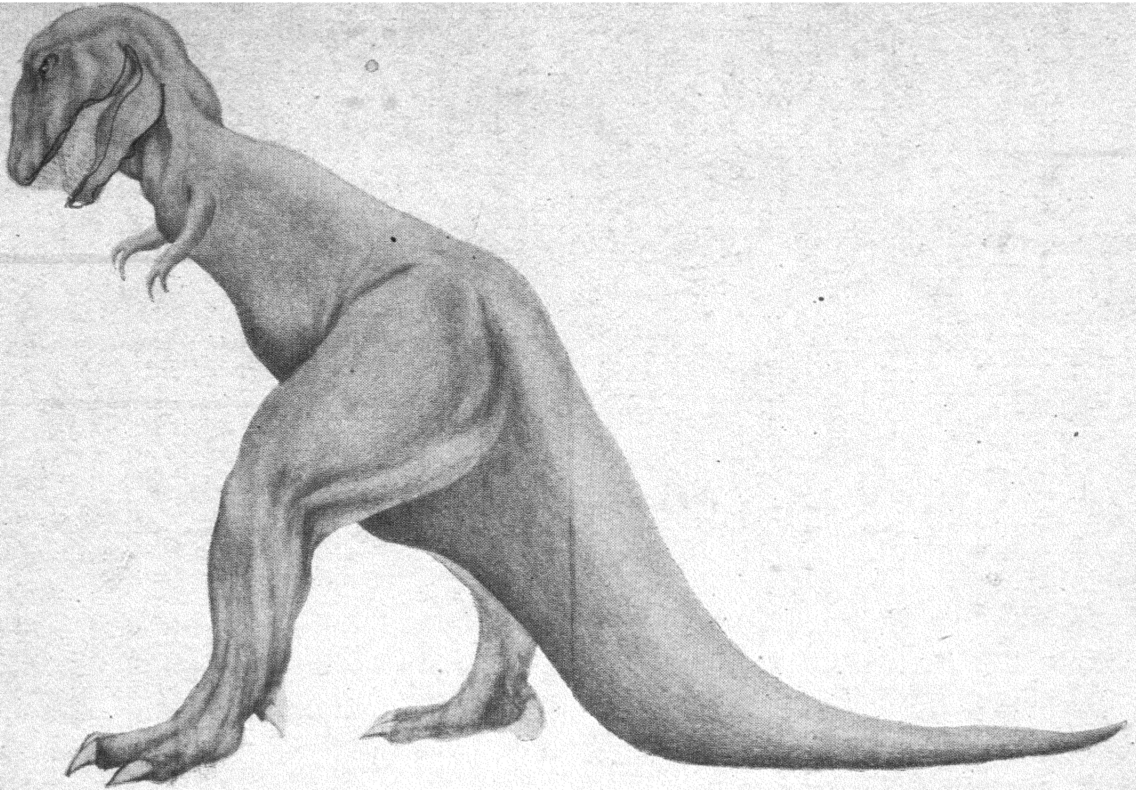
[পরিচ্ছেদের শীর্ষে উদ্ধৃত সমস্ত কবিতা রবীন্দ্রনাথের]

গ্রন্থপঞ্জী

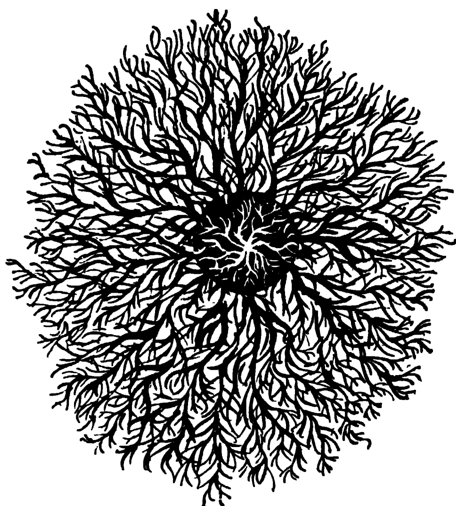
1. Science for the Citizen—Lancelot Hogben.
2. The Origin of Species—Charles Darwin.
3. Man in Search of his Ancestors—Andre Senet.
4. The Meaning of Evolution—George Gaylord Simpson.
5. Man and the Vertebrates, Vol. 1—A. S. Romer.
6. The Forest and the Sea—Marston Bates.
7. Animal Biology—J. B. S. Haldane & Julian Huxley.
8. Nature (·Earth Plants Animals), Vol. 2—Edited by James Fisher, Sir Julian Huxley and others.
9. Inside the Living Cell—J. A. V. Butler.
10. How Life Began—Irving Adler.
11. The Origin of Life—A. I. Oparin.
12. Giants of Science—Philip Cane and Samuel Nisenson.



ক্যামব্রিয়ান কালের ফসিল ট্রাইলোবাইট



মধ্যজীবীয় যুগের সরীসৃপ টাইরানোসরাস



যতোদূর পথ

তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছ প্রতি মুহূর্তের সংগ্রাম,
ফলে শস্যে তার জয়মাল্য হয় সার্থক।
জলে স্থলে তোমার ক্ষমাহীন রণরঙ্গভূমি,
সেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত বিজয়ী প্রাণের জয়বার্তা।

জানলার কপাটে বসে একটা চড়াই কিচিরমিচির করছে। দেওয়ালের গায়ে একটা টিকটিকি অনেকক্ষণ ধরে একটা আরশোলাকে তাক করছিল—আচমকা বিদ্যুৎগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আরশোলাটাকে মুখের মধ্যে চেপে ধরল। জানলা দিয়ে একফালি রোদ ঘরের মধ্যে এসে পড়েছিল—পুষি বেড়ালটা গোল হয়ে শুয়ে সারা গায়ে রোদ্দুর মাখছে। কচি কচি লালচে পাতা গজিয়েছে নিমগাছের ডালে। একঝাঁক পাখি আকাশটাকে কোনাকুনি পার হয়ে গেল। এসব দৃশ্য এতই নিত্যকার যে আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করতেও ভুলে যাই। তবুও এই পৃথিবী এই আকাশ ও এই বিপুল মহাবিশ্বে এই নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ঘটনাগুলোকে আশ্রয় করে যে লক্ষণটি প্রকাশ পেল তার মহিমা ও মাধুর্যের কোনো তুলনা নেই। এই লক্ষণ জীবনের, যে-জীবন পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা

সম্পদ। জীবন আছে বলেই পৃথিবী এত সুন্দর। এমন কি আকাশের চাঁদকেও আমাদের আরো সুন্দর লাগে যখন আমাদের খোকনের মুখে তার আদলটি খুঁজে পাই। অন্যদিকে আমাদের খোকন কিন্তু চাঁদকে সত্যিকারের মামা বলেই মনে করে। আমরা যখন খোকনের কপালে টিপ দেবার জন্যে চাঁদমামাকে ডাকি তখন খোকনও হাত নাড়ে, যেন খোকনের ডাক শুনে চাঁদ সত্যিসত্যিই আকাশ থেকে নেমে আসবে। শুধু খোকন কেন, আমাদের ভুলু কুকুরটা পর্যন্ত মাঝে মাঝে চাঁদের দিকে তাকিয়ে কান্না জুড়ে দেয়।

আমাদের এই খোকন ও ভুলুর ব্যাপার স্যাপারই অদ্ভুত। চেয়ার থেকে পড়ে গেলে খোকন চেয়ারকে চড় মারে। পাথর গড়িয়ে পড়তে দেখলে ভুলু ঘেউ ঘেউ করে ডাকে। দুজনেই চেয়ার ও পাথরকে সজীব মনে করছে। আমরা অবশ্য ওদের কাণ্ড দেখে হাসি। কারণ আমরা জানি, চেয়ারের বা পাথরের প্রাণ নেই। ও-দুটো নির্জীব পদার্থ। কাজেই খোকনের হাতে চড় খেয়ে বা ভুলুর ঘেউ ঘেউ ডাক শুনে চেয়ারের বা পাথরের কোনো অনুভূতি হওয়াই সম্ভব নয়।

অথচ আমরা যখন পুরাণের গল্প পড়ি তখন কিন্তু দেখি, নির্জীব পদার্থও সজীব পদার্থের মতো কথা বলছে, নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে ও নানা আজব কাণ্ডকারখানা করছে। প্রাচীন কালের মানুষরা আমাদের খোকন ও ভুলুর মতোই ভাবত যে সকল পদার্থই সজীব। পাহাড়-পর্বত জল-মাটি, আগুন-বাতাস, এসব থেকে একটা পাখি বা জন্তু যে মৌলিক ভাবেই আলাদা—সে-ধারণা প্রাচীনকালের মানুষদের খুব স্পষ্টভাবে ছিল না।

জীবনের লক্ষণ

তাহলে প্রশ্ন ওঠে: জীবন কী? একটা মাটির ঢেলা থেকে একটা গাছ বা চড়াই পাখি বা পুষি বেড়াল কোন্ দিক থেকে আলাদা?

জীবনের লক্ষণ কী?

একটি লক্ষণ, শরীরের পুষ্টির জন্যে খাদ্যগ্রহণ। জন্তুজানোয়ারদের দেখে তো মনে হয়, শুধু খাওয়া ও খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া তাদের অন্য কোনো কাজ নেই। মানুষের জীবনেও একটা বড়ো অংশ কাটে এই একই উদ্দেশ্যে। জীবের খাদ্যের প্রয়োজন হয় কেন? অবশ্যই পুষ্টির জন্যে। জীবের শরীরের মধ্যে এমন একটি আয়োজন আছে যার ফলে খাদ্য থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পুষ্টি সংগৃহীত হতে পারে। পুষ্টি সংগ্রহের জন্যে খাদ্যগ্রহণ—এই হচ্ছে জীবনের একটি লক্ষণ।

জন্তুজানোয়ারের বাচ্চা হয়ে থাকে। গাছের বীজ থেকে নতুন চারা গজায়। এ-ব্যাপারটিকে এক কথায় বলা হয় বংশবৃদ্ধি। এই হচ্ছে জীবনের অপর লক্ষণ।

প্রত্যেকটি জীবের শরীরের মধ্যে এমন সমস্ত আয়োজন আছে যার ফলে নানা ধরনের রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ঘটে। মোটামুটি তারই ফল জীবনের এই দুটি লক্ষণ। আবার রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মূলে রয়েছে পদার্থের অণু ও পরমাণু। কাজেই জীবনকে বুঝতে হলে পদার্থের গড়ন সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা থাকা দরকার।

কিন্তু তারপরে আরও একটি গোড়ার প্রশ্ন থেকে যায়। জীবনের উদ্ভব কি-ভাবে? বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন, পৃথিবীতে জীবনের উদ্ভব দু-শো কোটি বছর আগে। পৃথিবীর বয়স প্রায় চারশো কোটি বছর। অর্থাৎ, পৃথিবীতে এমন সময়ও ছিল যখন কোনো রকম উদ্ভিদ বা প্রাণীর চিহ্নমাত্র ছিল না। সেই উদ্ভিদহীন প্রাণীহীন পৃথিবীতে কোন্ আশ্চর্য প্রক্রিয়ায় জীবনের প্রথম স্ফুলিঙ্গটির সূত্রপাত হয়েছিল—তাও অবশ্যই জানা দরকার।

আদিম মানুষের ভাবনায় জীবন

জীবনের উদ্ভব কি-ভাবে—এই প্রশ্নটি নিয়ে মানুষের ভাবনা-চিন্তার আর শেষ নেই। এমন কি সেই আদিম যুগে যখন মানুষের ভাবনা-

চিন্তা করার বিশেষ অবসর ছিল না তখনো মানুষ নিজের মতো করেই প্রশ্নটির জবাব খুঁজতে চেষ্টা করেছে।

জীবের মৃত্যু হলে তার নিশ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। জীবিত ও মৃতের তফাৎ লক্ষ্য করতে গিয়ে আদিম যুগের মানুষ এই ঘটনাটিকেই সবচেয়ে জরুরি বলে মনে করেছিল। তার মানে, প্রাণের সঙ্গে যেন নিশ্বাসের বায়ুর একটা কিছু সম্পর্ক আছে। এ থেকেই আদিম মানুষের ধারণা হয়েছিল যে বায়ুই হচ্ছে প্রাণ, যা এই দেহটাকে আশ্রয় করে থাকে। বাংলা 'প্রাণ' কথাটার একটা মানে 'প্রশ্বাস বা ফুসফুসে গৃহীত বায়ু'। আমরা কথাতেও বলে থাকি প্রাণবায়ু। ইংরেজি 'স্পিরিট' কথাটা এই ধারণা থেকেই। অর্থাৎ, জীবের শরীরটা হচ্ছে নিতান্তই একটা কাঠামো বা ঘর বা খাঁচা। প্রাণবায়ু যতোদিন এই আশ্রয়ের মধ্যে থাকে ততোদিনই জীবন, প্রাণবায়ু আশ্রয়-ছাড়া হলেই মৃত্যু।

অনেক দিন পর্যন্ত এই ছিল প্রাণ বা জীবন সম্পার্কে মানুষের ধারণা। এ থেকে নানা ধরনের বিশ্বাস ও সংস্কার সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন, মনে করা হত, প্রাণবায়ু বা আত্মা একটি শরীর থেকে বেরিয়ে আসার পরেও ইতস্তত ঘুরে বেড়ায় এবং সুযোগ পেলেই অন্য একটি শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এইভাবে যদি কোনো দুষ্ট আত্মা ভর করে তাহলেই ব্যাধিতে ভুগতে হয়। আমরা হাই তোলার সময়ে মুখের সামনে তুড়ি মারি। এও সেই আদিম যুগের অভ্যেস। হাই তোলার অন্যমনস্কতায় মুখের ফাঁক দিয়ে যাতে বাইরের কোনো আত্মা শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়তে না পারে সেজন্যেই এই ব্যবস্থা।*

আমরা এ-যুগের মানুষরা অবশ্য হাই তোলবার সময়ে তুড়ি মারি না। আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের শিখিয়েছে যে জীবনটা শ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ু নয়, যদিও শ্বাসপ্রশ্বাস অবশ্যই একটা বায়ুপ্রবাহ।

---

*যাঁরা এ-বিষয়ে বিস্তৃতভাবে জানতে চান তাঁরা **Fraser**-এর **The Golden Bough** বইটি পড়তে পারেন।

আর জীবনটাও এমন একটা বিশেষ বস্তু নয় যাকে শরীর থেকে পৃথক করা চলে। জীবন হচ্ছে একটা প্রক্রিয়া। জীবের শরীর কতকগুলো বিশেষ উপাদানে তৈরী। এই উপাদানগুলোর বিশেষ ক্রিয়াকলাপ আছে। সব মিলিয়েই জীবন।

জীবনের উদ্ভব কি-ভাবে– এ প্রশ্নের জবাবও আদিম মানুষ নিজেদের মতো করেই ভাবতে চেষ্টা করেছিল। আমরা জানি, মানুষ মাটির পাত্র তৈরি করতে শিখেছিল চাষ করতে শেখার আগেই। একতাল মাটি থেকে একজন মানুষ বিভিন্ন ধরনের ও আকারের পাত্র তৈরি করছে—এটা তার দেখা ও জানা ঘটনা। এ থেকেই সে অনায়াসে ভাবতে পেরেছিল যে মাটির পাত্র যেমন কুমোরের সৃষ্টি তেমনি এই জীবজগতও একজন বিধাতাপুরুষের সৃষ্টি। একজন কুমোরের মতো এই বিধাতাপুরুষও সৃষ্টির কাঁচা উপাদান থেকে বিভিন্ন আকারের ও ধরনের জীব সৃষ্টি করেছেন।

তারপরে শুরু হয় কৃষিকার্য ও পশুপালন—(আজ থেকে প্রায় সাত হাজার বছর আগে। মানুষ চোখের সামনে দেখতে লাগল কি-ভাবে বীজ থেকে গাছ হয়, কি-ভাবে বংশবৃদ্ধির জন্যে কোনো কোনো জীব ডিম পাড়ে, কোনো কোনো জীব বাচ্চা প্রসব করে। সৃষ্টি-রহস্যের ব্যাখ্যাকেও এ দুয়ের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে কোনো অসুবিধে হল না। এ-জগতে যতো প্রকার জীব থাকা সম্ভব তাদের প্রত্যেকটির আদি জোড়াটি বিধাতাপুরুষের সৃষ্টি। সেই আদি জোড়াগুলো থেকে বংশবৃদ্ধি হতে হতেই জীবজগতের প্রসার। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি দেশের ধর্মগ্রন্থে সৃষ্টি-রহস্যের এই ব্যাখ্যাই দেওয়া হয়েছে।

এই ব্যাখ্যার মধ্যে দুটি বিষয় স্পষ্ট। এক, উদ্ভিদ থেকেই উদ্ভিদের বা জীব থেকেই জীবের সৃষ্টি। দুই, জীবজগতে যতো প্রকারের জীব রয়েছে তারা সৃষ্টির গোড়া থেকেই এই রকমটি। তাদের চেহারায় কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। শুধু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যা-বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র।

তবে মানুষের চোখের দেখার জগতে অন্য একটা ব্যাপারও সেই প্রাচীন কাল থেকেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল। বসবাসের এলাকায় যাতে বৃষ্টির জল বা পাঁক বা আবর্জনা জমতে না পারে, তার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখা গেল—জমে থাকা জলে বা পাঁকে বা আবর্জনায় আপনা থেকেই অজস্র পোকার জন্ম হয়ে থাকে। এই পোকাগুলো কোত্থেকে এল? মনে রাখা দরকার যে তখনো পর্যন্ত মাইক্রোস্কোপ বা অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি।* মানুষের যা কিছু পর্যবেক্ষণ সবই সাদা চোখের সাহায্যে। আর এই সাদা চোখে তাকিয়ে মানুষ যতোটুকু দেখতে পারে তা খুব বেশি দূর পর্যন্ত হয়। কাজেই, চোখের দেখার প্রমাণ থেকে সিদ্ধান্ত করতে বাধা থাকল না যে পচা নোংরায় কয়েক ধরনের পোকা আপনা থেকেই জন্মেছিল।

আমরা এখন হাসতে পারি, কিন্তু সেই প্রাচীন কালের মানুষের পক্ষে দ্বিতীয় কোনো সিদ্ধান্ত সম্ভব ছিল না। আমরা যদি সেকালের মানুষ হতাম তাহলে আমরাও এই সিদ্ধান্তই করতাম। কী দেখতাম আমরা? দেখতাম, মাঠের গোবরে সদ্য তুলে আনলে পোকা নেই, কিন্তু পচতে দিলেই অজস্র পোকা। দেখতাম, মাটি ফুঁড়ে ফুঁড়ে কেঁচো বেরিয়ে আসছে। ফসল রাখবার জায়গায় ইঁদুরের ছানা। পাঁকের মধ্যে ব্যাঙের বাচ্চা। পচা মাংসে সাদা সাদা পোকা। এমন কি মানুষের ঘামেও এক ধরনের উকুন। আমাদের পক্ষে কিছুতেই জানা সম্ভব ছিল না যে পচা গোবর অদৃশ্য জীবাণুর বাসা

*কম্পাউণ্ড মাইক্রোস্কোপের আবিষ্কার সতেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে। একই সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কতকগুলো যুগান্তকারী আবিষ্কার হয়েছিল: আলোর নির্দিষ্ট গতিবেগ, চন্দ্রের পর্বতমালার মানচিত্র, বর্ণালীর অনুশীলন। এই সমস্ত আবিষ্কারের ঢেউ সাড়া জাগিয়েছিল জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও। আধুনিক জীববিজ্ঞানের সূত্রপাতও এই সময়ে, যখন কম্পাউণ্ড মাইক্রোস্কোপ এতকালের সম্পূর্ণ অ-দেখা এক জগতকে মানুষের চোখের সামনে পুরোপুরি মেলে ধরেছিল।

হয়ে উঠেছিল, মাটির নিচে কেঁচো ডিম পেড়েছিল, ফসল রাখবার জায়গায় হানা দিয়েছিল ধাড়ী ইঁদুর, ব্যাঙের বাচ্চা হয়েছিল জলের ওপরে ভেসে থাকা জেলির-মতো-দেখতে ব্যাঙের ডিম থেকে, পচা মাংসে ডিম পেড়ে গিয়েছিল এক ধরনের মাছি। এমন কি মানুষ যদি বহুদিন স্নান না করে তাহলে তার গায়ের ঘামে উকুনের ডিম পাড়বার জায়গা হওয়া অসম্ভব ব্যাপার নয়। অনেক কিছু আমাদের অ-দেখা থাকত বলেই আমরা অনায়াসে সিদ্ধান্ত করতাম যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আপনা থেকেই জীবের আবির্ভাব হতে পারে।

প্রাচীন কালের মানুষদেরও বিশ্বাস করতে বাধেনি যে একেবারে শূন্যতা থেকেও জীবের উদ্ভব সম্ভব, যাদের বলা যেতে পারত স্বতঃ-উদ্ভূত জীব (Spontaneous Generation)। জীবের স্বতঃ-উদ্ভবে মানুষের বিশ্বাস বহুদিন পর্যন্ত অটুট ছিল। বিখ্যাত গ্রীক বিজ্ঞানী ও দার্শনিক আরিস্টট্‌ল পর্যন্ত জীবের স্বতঃ-উদ্ভবের তত্ত্বে বিশ্বাস করেছিলেন। আরিস্টট্‌ল-এর পরেও আরো প্রায় দু-হাজার বছর এই তত্ত্ব টিকেছিল। তার কারণ, যে-ধরনের আয়োজন থাকলে এই তত্ত্বকে বাতিল করার মতো যুক্তি খাড়া করা যেতে পারত তা সতেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ের আগে পর্যন্ত মানুষের হাতে আসেনি। জীবের স্বতঃ-উদ্ভব তত্ত্ব বাতিল হতে পেরেছিল অণুবীক্ষণযন্ত্রের আবিষ্কার হবার পরে।

অবশ্য, প্রথম যে-বিজ্ঞানী স্বতঃ-উদ্ভব তত্ত্বের বিরুদ্ধে হাতেকলমে প্রমাণ হাজির করেছিলেন, তিনি অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্য নেননি। তিনি একজন ইতালীয় বিজ্ঞানী, নাম রেদি। ১৬৬৮ সালে তিনি বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। তাঁর পরীক্ষাকার্যটি ছিল অতি সরল। একখণ্ড মাংসকে ব্যাণ্ডেজ-কাপড় দিয়ে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। দেখা গেল, মাংসের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে মাছি এসে বসছে সেই ব্যাণ্ডেজ-কাপড়ের ওপরেই আর সেখানেই ডিম পেড়ে যাচ্ছে। কারণ, দেখা গেল, মাংস ব্যাণ্ডেজ-কাপড়ে জড়ানো না থাকলে যে পোকাগুলো মাংসের গায়ে কিলবিল করত, সেগুলো এবারে মাংসের

গায়ে না থেকে রয়েছে ব্যাণ্ডেজ-কাপড়ের ওপরে। প্রায় একই সময়ে অপর একজন ইতালীয় বিজ্ঞানী প্রমাণ করেছিলেন যে ফলের ভেতরের পোকাও কীটের ডিম থেকে হয়ে থাকে। কীটগুলো ফল বড়ো হতে শুরু করার আগেই ডিম পেড়ে গিয়েছিল।

অণুবীক্ষণের যুগে

প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কে নতুন ভাবনার এই ছিল সূত্রপাত। তারপরে অণুবীক্ষণযন্ত্র প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এমন সমস্ত প্রমাণ পাওয়া যেতে লাগল যাতে জীবের স্বতঃ-উদ্ভব তত্ত্বটিকে আর কিছুতেই টিকিয়ে রাখা গেল না। অণুবীক্ষণযন্ত্রের আতসকাচের মধ্যে দিয়ে যে জগতটি বিজ্ঞানীদের চোখের সামনে ধরা পড়ল তা তখনো পর্যন্ত কল্পনাতীত ছিল। অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে গবেষণা করার পরেই বিজ্ঞানীদের প্রথম স্পষ্ট ধারণা হল যে কীটপতঙ্গের ডিমে আর হাঁসমুরগির ডিমে মূলত কোনো তফাৎ নেই—আকারে ছোট-বড়ো হওয়া ছাড়া। তার চেয়েও বড়ো কথা, অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যেই প্রথম প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল যে জীব থেকেই জীবের জন্ম। যাদের মনে করা হচ্ছিল স্বতঃ-উদ্ভূত জীব তারাও আসলে জন্মেছে ডিম থেকে। এই গবেষণার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ছিলেন হল্যাণ্ডের একজন বিজ্ঞানী, নাম আণ্টন লিউভেনওয়েক্ (Anton Leeuwenhoek) (১৬৩২-১৭২৩)।

লিউভেনওয়েক্ ছিলেন হল্যাণ্ডের একটি ছোট শহরের অতি নগণ্য একজন আপিস-কর্মচারী। তাঁর কাজ ছিল সকালে এসে আপিসের দরজা খেলা, ঝাড়ামোছা করা, চুল্লীর আগুন ধরানো আর রাত্রিবেলা আপিস তালাবন্ধ করা। অবসর সময়ে তিনি লেন্স নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন। নানা ধরনের লেন্স তৈরি করতে করতে তাঁর হাত খুবই পাকা হয়ে গিয়েছিল। তিনি যে ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস বা আতসকাচ তৈরি করেছিলেন তার ভেতর দিয়ে তাকালে পদার্থকে ১৬০ থেকে ২০০ গুণ বর্ধিত ব্যাসে দেখা যেতে পারত। লিউভেন-

ওয়েক্-এর এই আতসকাচই এক অদৃশ্যপূর্ব জগতকে উদ্‌ঘাটিত করেছিল।

লিউভেনওয়েক্ এই আতসকাচটি নিয়ে প্রায় একটি শিশুর মতো মেতে উঠেছিলেন। যা কিছু হাতের সামনে পেতেন তারই ওপরে আতসকাচ ধরে পর্যবেক্ষণ শুরু করে দিতেন। এমন কি দাঁতের ময়লাকেও তাঁর এই আতসকাচের নিচে আসতে হয়েছিল। সর্বত্রই তিনি দেখতে পেলেন অজস্র ক্ষুদে ক্ষুদে উদ্ভিদ ও প্রাণী। এই অদৃশ্য জগতের ক্ষুদে ক্ষুদে উদ্ভিদ ও প্রাণীর নাম দেওয়া হল জীবাণু (micro-organisms)। লিউভেনওয়েক্ অবাক হয়ে আবিষ্কার করলেন, পৃথিবীতে যতো না মানুষ তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি সংখ্যক অদৃশ্য জীবাণু। লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির কাছে তিনি লিখে পাঠালেন : "গোটা নেদারল্যাণ্ড রাজ্যে যতো না মানুষ আছে তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক জীবাণু আছে আমার মুখের মধ্যে।" লণ্ডনের এই রয়েল সোসাইটির কাছেই তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণের ফলাফল বর্ণনা করে নিবন্ধ পাঠাতেন। পরে ১৬৯৫ সালে 'প্রকৃতির রহস্য' (Secrets of Nature) নাম দিয়ে তাঁর এই নিবন্ধগুলোকে একসঙ্গে প্রকাশ করা হয়। জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে এই গ্রন্থটি একটি নতুন যুগের সূচনা। এই গ্রন্থটিতেই সর্বপ্রথম জীবাণুদের সম্পর্কে গবেষণা ও বর্ণনা পাওয়া গিয়েছিল।

লিউভেনওয়েক্ কোনো কিছুকেই তাঁর পর্যবেক্ষণের আওতা থেকে বাদ দেননি। বিশেষভাবে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন উদ্ভিদ, পশুপাখি ও জৈব পদার্থকে। তিনি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন, জৈব পদার্থে যতোই পচন ধরে ততোই তার মধ্যে জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। একপাত্র দুধ বা মদ বা ফলের রস বা এমনি ধরনের অন্য যে-কোনো জৈব পদার্থকে দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। দুধ বা মদ বা ফলের রস যতোই পচবে ততোই আরো বেশি বেশি সংখ্যক জীবাণুকে কিলবিল করতে দেখা যাবে। ঠিক মনে হবে যেন অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে নানা ধরনের অজস্র মাছের চলাফেরা।

ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোনো কোনো বিজ্ঞানী আবার পুরনো প্রশ্নটাকেই নতুন করে তুললেন। দুধে বা মদে বা ফলের রসে গোড়ার অবস্থায় জীবাণুর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তাহলে, পরবর্তী কালে যে জীবাণুগুলো দেখা গিয়েছিল সেগুলো এল কোত্থেকে? তাহলে নিশ্চয়ই এই জীবাণুলো স্বতঃ-উদ্ভূত। কিন্তু অন্য একদল বিজ্ঞানী সমান জোরের সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে জীবাণুর জন্ম জীবাণু থেকেই। এই জীবাণুগুলো অদৃশ্যভাবে বাতাসে ভেসে বেড়াতে বেড়াতে দুধ বা মদ বা ফলের রসকে আশ্রয় করেছে। বলা বাহুল্য, শুধু মুখের কথায় এই তর্কের নিবৃত্তি হবার কথা নয়। স্ব-স্ব বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ উপস্থিত করবার জন্যে বিজ্ঞানীরা তৎপর হয়ে উঠলেন। শুরু হয়ে গেল বৈজ্ঞানিক এক্স্পেরিমেণ্টের লড়াই। একদল পরীক্ষা করে দেখাতে চেষ্টা করলেন, বাতাস থেকে আড়াল করে রাখতে পারলে জৈব পদার্থে কোনো সময়েই জীবাণুর আবির্ভাব হয় না। অন্যদলের চেষ্টা থাকল জীবাণুর আবির্ভাবকে সর্বক্ষেত্রেই অবশ্যম্ভাবী প্রমাণ করা।*

প্রায় দু-শো বৎসর ধরে এই বৈজ্ঞানিক এক্স্পেরিমেণ্টের লড়াই চলেছিল। শেষ পর্যন্ত উনিশ শতকের শেষদিকে বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানী লুই পাস্তুরের গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হবার পরে এই বিতর্ক শেষ হয়। লুই পাস্তুর (১৮২২-১৮৯৫) অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নানা বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন। তাঁর গবেষণা থেকে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হয় যে পৃথিবীর এই বাতাসেই অসংখ্য জীবাণু ভেসে বেড়াচ্ছে। ফলে প্রত্যেকটি পদার্থকে এই জীবাণুদের সংস্পর্শে আসতেই হয়। জীবাণুর জন্ম পচনশীল জৈব পদার্থ থেকে নয়। একদল জীবাণু যখন কোনো জৈব পদার্থে বাসা বাঁধে এবং দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে থাকে তখনই সেই জৈব পদার্থে পচন ধরে। যদি এমন কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় যে জৈব পদার্থে জীবাণু

* বিষয়টিকে যাঁরা বিস্তৃতভাবে জানতে চান তাঁরা Charles Singer-এর A History of Biology বইটি পড়তে পারেন।

কখনোই বাসা বাধতে ও বংশবৃদ্ধি করতে পারবে না তাহলে জৈব পদার্থটির পচনও রোধ করা যাবে। আজকাল বাজারে যে পাস্তুরাইজ্‌ড্‌ দুধ পাওয়া যায় তা বিশেষ প্রক্রিয়ায় জীবাণুমুক্ত। এই কারণে পাস্তুরাইজ্‌ড দুধ কখনো নষ্ট হয় না। পাস্তুর আরো প্রমাণ করলেন যে জীবাণুর জন্মও জীবাণু থেকেই। জীবাণুরাও কোনো ক্ষেত্রেই স্বতঃ-উদ্ভূত নয়।

জীববিজ্ঞানের অগ্রগতি

তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই উনিশ শতকের শেষদিকে এসেই প্রথম সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হল যে জীবন থেকেই জীবন, প্রাণ থেকেই প্রাণ। কোনো বিশেষ প্রকারের জীব সেই বিশেষ প্রকারের জীবেরই জন্ম দিয়ে থাকে।

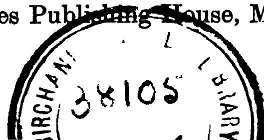
পাস্তুরের গবেষণার পরে একশো বছরও পার হয়নি। সঠিকভাবে বলতে গেলে পাস্তুরের মৃত্যুর পরে পার হয়েছে মাত্র সাতষট্টিটি বছর। এই অল্প সময়ের মধ্যে জীববিজ্ঞানের যে বিপুল অগ্রগতি হয়েছে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে বিজ্ঞানীরা যে শুধু জীবাণু-জগত সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর সংগ্রহ করেছেন তাই নয়, পেনিসিলিন ইত্যাদি অ্যান্টিবায়োটিকস্‌ আবিষ্কার করে জীবাণুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে চূড়ান্তভাবে জয়ী হয়েছেন। আজকালকার একটি স্কুলের ছেলেও যদি কাউকে বলতে শোনে যে পচা গোবরে আপনা থেকেই পোকা জন্মায় তাহলে হেসে উঠবে। যে ধারণাটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে আরিস্টটল থেকে পাস্তুর পর্যন্ত সময়-কালের মস্ত মস্ত বিজ্ঞানীদের সময় লেগেছিল প্রায় আড়াই হাজার বছর—তা মাত্র সাতষট্টি বছরের মধ্যেই আমাদের বিশ্বাসের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, জীবের জন্ম হওয়ার ব্যাপারটির ওপরে খোদকারি করতে দেখেও আমরা আর আজকাল অবাক হই না। বিজ্ঞানীরা যখন ঘোষণা করেন যে অদূর ভবিষ্যতে জীবের বংশগতিকে (heredity)—অর্থাৎ, কোন্‌ ধরনের জীবের কী ধরনের

বাচ্চা হবে এই ব্যাপারটিকে—খুশিমতো নিয়ন্ত্রণ করবেন, তখনো আমরা সহজভাবেই তাঁদের কথায় বিশ্বাস করতে পারি। লক্ষণ দেখে মনে হয় আগামী বছরগুলিতে জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অগ্রগতি হবে, যেমনটি হয়েছে বিগত বছরগুলিতে রসায়ন ও পদার্থ-বিদ্যার ক্ষেত্রে। সব মিলিয়ে আগামী বছরগুলিতে এই পৃথিবীর মানুষের জীবনযাত্রা ও ধ্যানধারণা এমন আমূল পরিবর্তিত হবে যে-সম্পর্কে এত আগে থেকে কোনো রকম কল্পনা করাও সম্ভব নয়। সম্প্রতি একদল সোভিয়েত বিজ্ঞানী ২০১০ সালে আমাদের এই পৃথিবী ও আমাদের এই জীবন কেমনধারা হবে সে-সম্পর্কে একটি বই* লিখে কিছুটা আভাস দিতে চেষ্টা করেছেন। এই বইয়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে জীববিজ্ঞানের ওপরে। কারণ, বিজ্ঞানীদের ধারণা, আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে আশ্চর্য সমস্ত কাণ্ডকারখানা ঘটবে এই জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই। পদার্থবিজ্ঞানীরা যেমন পরমাণুর ভেতরকার রহস্যকে উদ্ঘাটিত করেছেন, তেমনি জীববিজ্ঞানীরা উদ্ঘাটিত করবেন জীবনের রহস্যকে।

আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দুরারোগ্য ব্যাধি প্রায় কিছুই থাকবে না। মানুষ যেমনি ভাবে কলেরা, প্লেগ, বসন্ত, হাইড্রোফোবিয়া ইত্যাদি রোগকে পরাভূত করেছে, ঠিক তেমনি ভাবে পরাভূত করবে ক্যানসার ইত্যাদি রোগকে। মানুষের জীবনের পরমায়ুকে আরো নানাভাবে বাড়িয়ে তোলা হবে।

পঞ্চাশ বছরের মধ্যে জৈব ব্যাপারের প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মানুষের কর্তৃত্ব আরো অনেক বেশি প্রতিষ্ঠিত হবে। বিশেষ করে বংশগতির ব্যাপারে। খুব সম্ভবত আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বংশগতির ব্যাপারটিকে মানুষ এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে যার ফলে জীবজগৎ ও উদ্ভিদজগতকে খুশিমতো ঢেলে সাজা সম্ভব হবে তার পক্ষে।

* Reports from the Twenty-first Century—M. Vasieylv & S. Gushchev. Foreign Languages Publishing House, Moscow.



এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুত অগ্রগতি হবে চিকিৎসাবিদ্যা ও কৃষিবিদ্যার ক্ষেত্রেও।

অন্যদিকে একালের মানুষ হিসেবে আমরাও যেন ধরেই নিয়েছি যে বিজ্ঞানের এমনিধারা অগ্রগতি হতেই হবে। আমাদের আজকের জীবন ও চিন্তাভাবনার সঙ্গে আগামীকালের জীবন ও চিন্তাভাবনার আকাশ-পাতাল তফাৎ হওয়াটাও কিছুমাত্র অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। মাত্র পাঁচ বছর আগেও আমরা স্পষ্টভাবে ভাবতে পারতাম না যে পৃথিবীর এই মানুষই মহাকাশে অভিযান শুরু করবে। আজ আমরা অনায়াসেই ভাবতে পারছি, চন্দ্রে ও মঙ্গলগ্রহে ও শুক্রগ্রহে মানুষ উপনিবেশ গড়ে তুলবে এবং ফোটোন রকেটের যাত্রী হয়ে এই মানুষই পাড়ি দেবে নক্ষত্রলোকের উদ্দেশে।

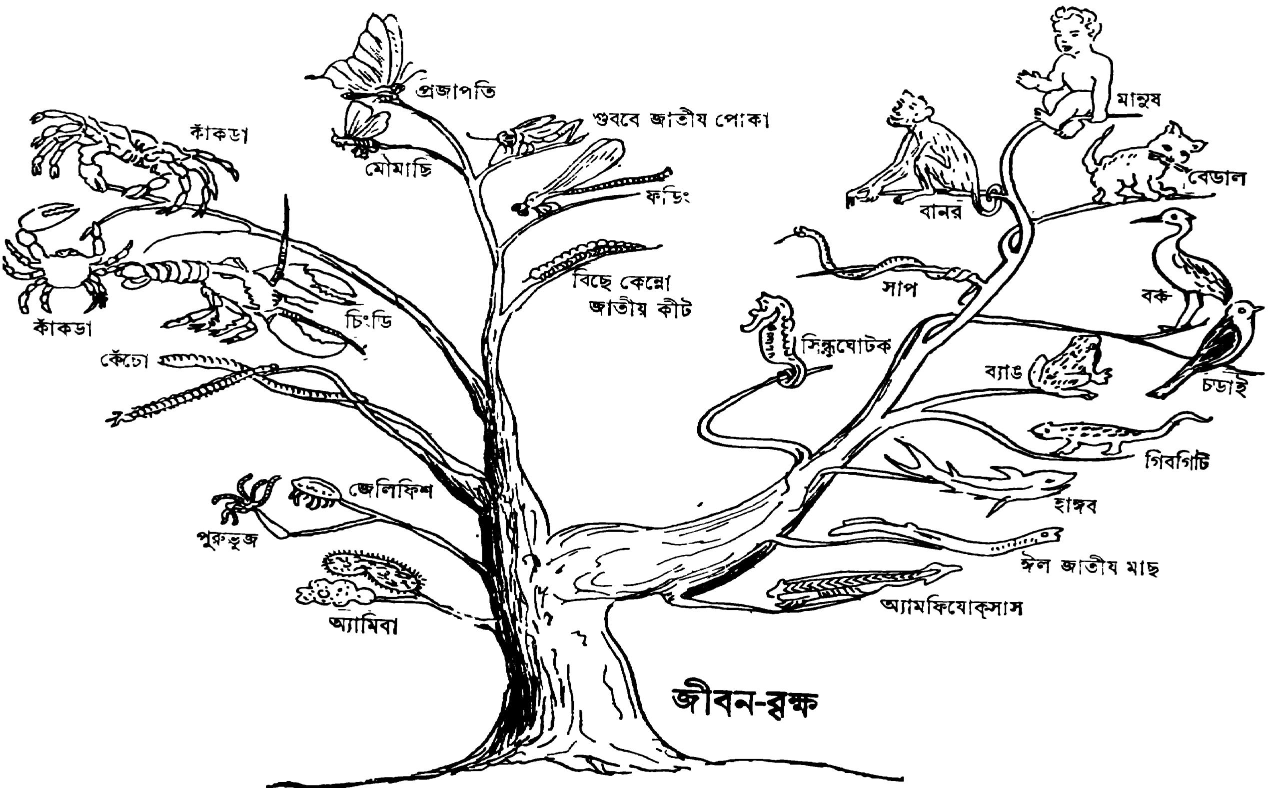
তেমনি একসময়ে আমরা ভাবতাম যে আজকের এই জীবজগতটি ঠিক এমনি রূপেই সৃষ্টির গোড়া থেকে এই পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত। আর মানুষও ছিল এমনি মানুষ হিসেবেই জীবজগতে সবার ওপরে। কয়েক হাজার বছরের এই ভাবনা আমরা চূড়ান্তভাবে বাতিল করেছি মাত্র একশো বছর আগে। এখন আর আমাদের কাউকে তর্ক করে বোঝাতে হয় না যে জীবজগতের আজকের রূপটি চিরকালের নয়। ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে, অনেক অবলুপ্তি ও রূপান্তর পার হয়ে এসে তবেই জীবজগতের আজকের এই বিশেষ রূপ।

মিল ও অমিল

অথচ আমরা সবাই জানি, ব্যাপকতায় ও বৈচিত্র্যে আজকের এই জীব-জগতের কোনো তুলনা নেই। মহাকাশের বিপুল বিস্তৃতিতে অতি অকিঞ্চিৎকর বস্তুপিণ্ড এই পৃথিবী—তবুও এই পৃথিবীই লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি জীবের আশ্রয়। আকাশে, সমুদ্রে, অরণ্যে, মাঠে-ঘাটে জনপদে, সর্বত্রই বিভিন্ন ধরনের জীবকে আশ্রয় করে প্রাণের এক বিপুল সমারোহ প্রত্যক্ষ করা চলে। যতোটুকু আমরা দেখতে পাই তারই যেন শেষ পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের দেখার এলাকার

বাইরে—গভীর সমুদ্রে ও গভীর অরণ্যে—এখনো এমন অনেক জীব থেকে গিয়েছে যাদের আমরা কোনো হিসেবের মধ্যেই ধরতে পারিনি।

অন্যদিকে, একটু মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, জীবজগতের বৈচিত্র্যের মধ্যেও যেন একটা মিল রয়েছে। যেমন, নেকড়ে, শেয়াল ও কুকুর। এরা বিভিন্ন প্রজাতির জীব। কিন্তু তবুও এদের মধ্যে মিলও অনেকখানি। তেমনি সিংহ, বাঘ ও বেড়াল। এই মিল দেখে মনে হয়, এই বিভিন্ন প্রজাতির জীবগুলো সম্ভবত একই বংশের অন্তর্ভুক্ত। ঠিক এমনি মিল পাওয়া যায়। সহোদর ও জ্ঞাতি ভাইবোনদের মধ্যে, কারণ তারা একই বাপমায়ের সন্তান ও একই পূর্বপুরুষের বংশধর। পশুদের বেলাতেও এই চেহারার মিল দেখেই বংশ ঠিক করা হয়েছে। নেকড়ে, শেয়াল ও কুকুরের বংশটিকে বলা হয় শ্ব (canine) ; সিংহ, বাঘ ও বেড়ালের বংশটিকে বলা হয় মার্জার (feline), ইত্যাদি। আবার, বিভিন্ন বংশের মধ্যেও কতকগুলো দিকে মিল থেকে যাচ্ছে। যেমন, শ্ব ও মার্জার বংশের মিল—গায়ে লোম থাকা, বাচ্চা প্রসব করা (ডিম পাড়া নয়), মায়ের দুধ খেয়ে বড়ো হওয়া। শেষের লক্ষণটির জন্যে এই দুই বংশের জীবদের আবার একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার নাম স্তন্যপায়ী (mammals)। মানুষও স্তন্যপায়ী। কিন্তু মাছেরা নয়। এই কারণেই মাছদের শ্রেণী আলাদা। তাই বলে এইসব আলাদা আলাদা শ্রেণীর মধ্যেও কি কোনো দিক থেকেই মিল নেই ? নিশ্চয়ই আছে এবং এই মিলটুকু খুবই ঋজু ও স্পষ্ট। শ্ব, মার্জার, মানুষ, মাছ—সব জীবের শরীরেই রয়েছে একটি করে মেরুদণ্ড। তার মানে এই জীবগুলোকে বলা যেতে পারে মেরুদণ্ডী। এমনিভাবে ভাবতে ভাবতে অগ্রসর হলে দেখা যাবে যে আজকের এই ব্যাপক ও বিচিত্র জীবজগতটি শেষ পর্যন্ত যেন একটি বৃহৎ মিলের কাণ্ডে গিয়ে শেষ হচ্ছে। অর্থাৎ জীবজগতকে যেন তুলনা করা চলে বহু শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট একটি বৃক্ষের সঙ্গে। এই


প্রজাপতি
গুবরে জাতীয় পোকা
কাঁকড়া
মৌমাছি
ফড়িং
মানুষ
বেড়াল
বানর
বিছে কেন্নো
জাতীয় কীট
সাপ
বক
কাঁকড়া
চিংড়ি
সিন্ধুঘোটক
কেঁচো
ব্যাঙ
চড়াই
গিরগিটি
জেলিফিশ
হাঙ্গর
পুরুভুজ
ঈল জাতীয় মাছ
অ্যামফিয়োক্সাস
অ্যামিবা

জীবন-বৃক্ষ

বৃক্ষটিকে খুব মোটা দাগে এঁকে নিলে দেখা যাবে, মূল কাণ্ডটি ঠিক খাড়াভাবে উঠে যায়নি, অনেকগুলো শাখায় বিভক্ত হয়ে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তেমনি প্রত্যেকটি শাখা ছড়িয়েছে অনেকগুলো প্রশাখায়। মানুষ রয়েছে এমনি একটি শাখার একেবারে শীর্ষে। সঙ্গের ছবির দিকে তাকিয়ে দেখলে জীবন-বৃক্ষের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন জীবের অবস্থান সম্পর্কে কিছুটা ধারণা হবে।

বিবর্তনবাদ ও ডারউইন

জীবজগতের এই মিল ও অমিল এবং একই কাণ্ড থেকে উদ্ভূত হয়ে শাখাপ্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করার জন্যে যে তত্ত্বটিকে হাজির করা হয়েছিল তারই নাম বিবর্তনবাদ (Theory of Evolution)। এই তত্ত্বের প্রবক্তা হিসেবে একজন ইংরেজ বিজ্ঞানীর নাম আমাদের কাছে খুবই পরিচিত। তিনি হচ্ছেন চার্লস ডারউইন (১৮০৯—১৮৮২)।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে ডারউইনের আগে এবং ডারউইনের সমসাময়িক কালে বিবর্তনবাদের প্রবক্তা হিসেবে একাধিক বিজ্ঞানীর নাম পাওয়া যায়। অন্তত দুজনের নাম তো আমাদের কাছে খুবই পরিচিত। একজন হচ্ছেন ফরাসী বিজ্ঞানী লামার্ক। ডারউইনের প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে তাঁর কাছ থেকে বিবর্তনবাদের ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়েছিল। অপরজন ইংরেজ বিজ্ঞানী ওয়ালেস। বিবর্তন-বাদের যুগ্ম-ব্যাখ্যাতা হিসেবে স্বয়ং ডারউইনই তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবুও বিবর্তনবাদের প্রসঙ্গে বিশেষ করে ডারউইনকেই আমরা স্মরণ করি এজন্যে যে তিনিই সর্বপ্রথম বিবর্তনবাদের সমর্থনে অকাট্য সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করতে পেরেছিলেন।

১৮৩১ সালের শীতকালে 'বীগ্‌ল্‌' নামে একটি জাহাজ পাঁচ বছরের জন্যে সমুদ্র-অভিযানে বেরিয়েছিল। ডারউইন ছিলেন এই জাহাজে। যখন যাত্রা শুরু করেছিলেন তখনো পর্যন্ত তাঁর ধারণা ছিল জীবজগতে স্পিসিস বা প্রজাতির মধ্যে কোনো অদলবদল ঘটে না। অর্থাৎ,

ঘোড়া চিরকালই ঘোড়া, মানুষ চিরকালই মানুষ, প্রত্যেকটি প্রজাতি আবহমান কাল ধরে একই চেহারা নিয়ে এই পৃথিবীতে বাস করছে। এই অবস্থায় সেই একশো বছর আগেকার কালের সংগৃহীত উপকরণের ওপরে ভিত্তি করে বিবর্তনবাদের ব্যাখ্যায় পৌঁছতে পারা এবং সেই ব্যাখ্যাকে একটি বৈজ্ঞানিক মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা—এই ঘটনার মধ্যে এক অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় রয়েছে।

অরিজিন অফ স্পিসিস

১৮৫৯ সালের ২৪শে নভেম্বর ডারউইনের বইটি প্রকাশিত হয়। বইটির পুরো নাম—'অরিজিন অফ স্পিসিস বাই মীন্স অফ ন্যাচারাল সিলেক্শন ফর দি প্রিসার্ভেশন অফ রেসেস্ ইন দি স্ট্রাগ্ল্ ফর লাইফ'। বাংলায় বলা যেতে পারে—'প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রজাতির উদ্ভব বা আনুকূল্যপ্রাপ্ত জাতিসমূহের বেঁচে থাকার সংগ্রামে টিকে থাকা'। এই নামটির মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথাটিও বলে দেওয়া হয়েছে: প্রাকৃতিক নির্বাচন। পরে বইয়ের ভেতরে পরিচ্ছেদের শিরোনামায় তিনি আরেকটি নতুন শব্দ ব্যবহার করেছেন: 'দি সারভাইভাল অফ দি ফিটেস্ট,' অর্থাৎ যোগ্যতমের টিকে থাকা। যদিও দুটি আলাদা কথা কিন্তু অর্থের বিশেষ তারতম্য নেই। ডারউইনের নিজের ভাষায়: "(জীবদেহে) যতো সামান্য অদল-বদলই ঘটুক তা যদি কাজের অদলবদল হয় তাহলে তা বজায় থাকে। এই নীতিটিকে আমি 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' কথাটির সাহায্যে বোঝাতে চেয়েছি। নির্বাচন করার ক্ষমতা যেমন আছে মানুষের তেমনি প্রকৃতির—এই সম্পর্কটি আমি 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' কথাটির মধ্যে স্পষ্ট করে তুলতে চাই। নইলে, মিঃ হার্বার্ট স্পেন্সার 'যোগ্যতমের টিকে থাকা' কথাটি প্রায়ই ব্যবহার করেছেন; ব্যাপারটিকে বোঝাবার পক্ষে এই কথাটি আরো বেশি সঠিক এবং কখনো কখনো সমান সুবিধাজনক।" কাজেই ডারউইনের মতবাদকে

কেন এমনটি হয়? জবাবে ডারউইন বলছেন, স্তন্যপায়ী জীবরা এই বিশেষ সময়ের ফেভর্‌ড্‌ বা আনুকূল্য-প্রাপ্ত। সব জীবই পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করে। কেউ পারে, কেউ পারে না। যারা পারে তারাই হচ্ছে ফেভর্‌ড্‌ বা আনুকূল্য প্রাপ্ত। তারাই যোগ্যতম।

এ থেকেই চতুর্থ কথাটি ওঠে। জীবকোষের পরিবর্তনীয়তা (যার পরিবর্তন হতে পারে) এবং পরিবর্তমানতা (যার পরিবর্তন হয়ে থাকে)। একেবারে গোড়ার যে অবস্থা থেকে জীবদেহের শুরু তাকেই বলা হয় জীবকোষ। এই পদার্থটি বড়োই অস্থির এবং অনবরত চেহারা পালটিয়ে চলে। এজন্যেই দেখা যায় একই পিতামাতার পাঁচটি সন্তানের মধ্যে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের কিছু-না-কিছু পার্থক্য থাকেই। এক পুরুষের সামান্য একটু পার্থক্য পরের পুরুষে হয়ে ওঠে আরো একটু প্রকট। যেমন, হালের একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে ম্যামথ। যে-জীবকোষ থেকে হাতির জন্ম সেই জীবকোষের মধ্যে অনবরত পরিবর্তন ঘটছিল। ফলে যে-সব বাচ্চা জন্মাচ্ছিল তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের কিছু-না-কিছু পার্থক্য থেকে যাচ্ছিল। এদের মধ্যে একদল বাচ্চা ছিল যারা জন্মেছিল সারা শরীরে ঘন লোম গজাবার দিকে একটা প্রবণতা নিয়ে। স্বাভাবিক নিয়মেই বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে এদের শরীর লোমশ হয়ে যায়। হিমযুগের আবহাওয়ায় এই লোমশ হাতিরাই বেঁচে থাকার সংগ্রামে জয়ী হয় ও দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। এরাই হিমযুগের ম্যামথ। ব্যাপারটা এই নয় যে হিমযুগ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একদিন সাধারণ একটা হাতি বলে উঠেছিল,—'নাঃ, বড়ো ঠাণ্ডা লাগছে, আমার গায়ে ঘন লোম গজাক'—আর অমনি তার গায়ে লোম গজিয়েছিল। প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মেই হিমযুগে ম্যামথদের আবির্ভাব। আবার প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মেই হিমযুগ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ম্যামথদের আয়ুও শেষ।

বিবর্তন

তাহলে দেখা যাচ্ছে, জীবজগতে বংশ বজায় রাখতে পারাটা রীতিমতো সংগ্রামের ব্যাপার। যতো জীব জন্মায় তার মধ্যে বেঁচে থাকে গোনাগুণতি সংখ্যক। বাদবাকিরা লোপ পায় কারণ তারা পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারেনি। এমনটি হওয়ার কারণ, প্রত্যেক জীবের নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য থাকে। এই বৈশিষ্ট্য যদি পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার ব্যাপারে সহায়ক হয় তবে জীবটি বেঁচে থাকে ও বংশবৃদ্ধি করে। আবার এই বংশ-ধরদের মধ্যেও পূর্বপুরুষের বৈশিষ্ট্য তো থাকেই, তার ওপরে নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য এসে যায়। এবারেও সেই একই কথা। এদের এই বৈশিষ্ট্য এবং আরো কিছু নিয়ে জন্মায় এদের বংশধররা। এমনিভাবে বংশের পর বংশে জীবনের ধারা বয়ে চলে। তার মানে, জীবনের ধারাটি একই চেহারায় কখনো দু-বার হাজির হচ্ছে না। অনবরত বদলাচ্ছে, অনবরত নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করছে। এইভাবে চেহারা বদলাতে বদলাতে শেষ পর্যন্ত এমন একটা সময় আসে, যখন মনে হয় জীবনের ধারাটি যেখান থেকে শুরু হয়েছিল আর যেখানে এসে শেষ হয়েছে—এ দুয়ের মধ্যে সরাসরি কোনো যোগ নেই। এই প্রক্রিয়াটিকেই বলা হয় বিবর্তন।

তার মানে, আজকের দিনে যেখানে যতো প্রজাতি দেখা যাচ্ছে তাদের আজকের দিনের চেহারাটাই বরাবরকার চেহারা নয়। যেমন ধরা যাক, মানুষ। মানুষ বরাবরই মানুষ ছিল না, 'অ্যানথ্রপয়েড এপ' বা 'মনুষ্যসদৃশ বিশেষ জাতীয় বানর' থেকে মানুষের বিবর্তন ; গোরিলা, শিম্পাঞ্জী, ওরাং-ওটাং মানুষের নিকট-জ্ঞাতি। এমনিভাবে প্রত্যেকটি প্রজাতির জীবই বিবর্তনের কতক-গুলো নির্দিষ্ট ধাপ পেরিয়ে এসেছে। অর্থাৎ, প্রত্যেকটি জীবই বিবর্তনের একটি ধারা বহন করে চলেছে। এমন কি মানুষও। কথাটা আজকাল আমরা সবাই মানি বলেই শুনতে খুব সহজ

লাগছে। কিন্তু একশো বছর আগে এই সহজ কথাটিই মানুষের চিন্তাজগতে বিপ্লব ঘটিয়েছিল। বলতে গেলে এই সময় থেকেই মানুষ নিজেকে চিনতে পেরেছিল মানুষ হিসেবে। শুধু এই অবদানের জন্যেই ডারউইন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। মানুষকে তিনি অলৌকিকতা থেকে মুক্ত করে এনে দাঁড় করিয়েছেন এই মাটির পৃথিবীতে জীবজগতের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিভূমিতে।

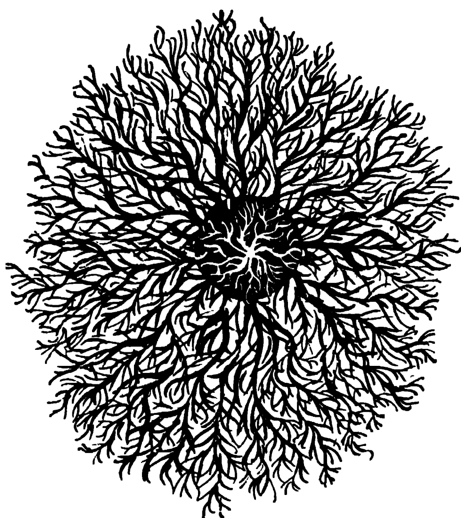
গত একশো বছরে জীবাশ্মবিদ্যার (Palaeontology) আবিষ্কারের ফলে ডারউইনের এই মত পুরোপুরি সমর্থিত হয়েছে। ডারউইনের সময়ে জীবজগতের ক্রমবিবর্তনের পুরো ছবিটি আঁকা সম্ভব হয়নি। তার মধ্যে অনেকগুলো 'মিসিং লিংক্' বা খুঁজে-না-পাওয়া যোগসূত্র ছিল। পরবর্তী কালের আবিষ্কার প্রায় সবকটি যোগসূত্রকেই খুঁজে বার করেছে। যেমন, এক ধরনের উভচর জীব যাদের চারটি পা আছে কিন্তু তার ওপরেও আছে মাছের মতো লেজ ও হাড়-সমেত পাখনা। যেমন, এক ধরনের লম্বা লেজওলা পাখি যাদের দাঁত আছে। এমনি আরো অনেক কিছু। এইসব আবিষ্কারের ফলে মেরুদণ্ডী জীবদের বিবর্তনের ধারাটি এখন আর কোথাও অস্পষ্ট নয়। অন্যদিকে, এখনো পর্যন্ত এমন একটি সাক্ষ্যও পাওয়া যায়নি যার দ্বারা বিবর্তনবাদ নাকচ হতে পারে। যেমন, ধরা যাক, মধ্যজীবীয় যুগের শেষদিকে যদি ঘোড়া বা মানুষের ফসিল পাওয়া যেত বা পুরাজীবীয় যুগে সরীসৃপ ও পাখির ফসিল—তাহলে আমরা অনায়াসেই বিবর্তনবাদকে বাতিল করতে পারতাম। এখনো পর্যন্ত এ-ধরনের কোনো আবিষ্কার হয়নি এবং যতোই দিন যাচ্ছে ততোই এই আবিষ্কার-না-হওয়াটাই বিবর্তনবাদের পক্ষে জোরালো যুক্তি হয়ে উঠেছে।

সেই একশো বছর আগেও ডারউইন বিবর্তনবাদকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে পেরেছিলেন যে তা মোটামুটি গ্রাহ্য হয়েছিল। তারপরে গত একশো বছরে এই মতবাদ আরো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন আর বিবর্তনবাদ নিয়ে কোনো তর্ক নেই।

জীবজগতে বিবর্তন যে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা—এই প্রশ্নটি নিয়ে ডারউইন নিজে তাঁর বইয়ে আলোচনা শুরু করেছেন দশম পরিচ্ছেদে। পাঁচটি পরিচ্ছেদ আছে এই আলোচনায়। প্রথম পরিচ্ছেদের আলোচনা ঘরে পালিত জীবদের নিয়ে—তাদের বিবিধায়ন (variation), সেই বিবিধায়নের বংশগত প্রকাশ এবং কৃত্রিম নির্বাচনের ফলাফল। তার পরের আলোচনা প্রাকৃতিক পরিবেশে পালিত জীবদের বিবিধায়ন নিয়ে। তার পরের দুটি পরিচ্ছেদে আলোচনা প্রাকৃতিক নির্বাচন সম্পর্কে এবং একটি পরিচ্ছেদে বিবিধায়নের সূত্র সম্পর্কে।

অর্থাৎ ডারউইনের মনে এ-বিষয়ে কোনো সংশয় ছিল না যে জীবজগতে নিয়তই বিবিধায়ন ঘটছে। তাঁর নিজের ভাষায়: "(জীবদেহে) যেটুকু বৈশিষ্ট্যই থাকুক না কেন তা পরের পুরুষে সঞ্চারিত হবে। এইটেই নিয়ম। না-হওয়াটাই ব্যতিক্রম।" তিনি ঘরে পালিত জীব ও উদ্ভিদের ওপরে কৃত্রিম নির্বাচনের প্রক্রিয়া পরখ করে দেখেছিলেন যে বিবিধায়ন সত্যিই ঘটছে। কাজেই তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে একইভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়াতেও বিবিধায়ন ঘটে এবং তার ফলে নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়। তার মানে, আমরা যদি বলি, জলের মাছের বিবিধায়ন ঘটতে ঘটতেই শেষ পর্যন্ত ডাঙার মানুষ তাহলে মিথ্যে বলা হবে না। গত একশো বছরের জীবাশ্মবিদ্যার সাক্ষ্যপ্রমাণের দিকে তাকিয়েও এ-কথাটি বলা যেতে পারে।

তবে গত একশো বছরের অন্য আরেকটি বিদ্যার ক্ষেত্রেও আশ্চর্য সব আবিষ্কার হয়েছে। এই বিদ্যাটি জেনেটিক্‌স্ বা প্রজননবিদ্যা। এই বিদ্যার আলোয় ডারউইনের মতবাদকে কিছুটা সংশোধন করে নেবার প্রয়োজন আছে। এ-আলোচনায় আমরা পরে আসব। প্রথমে গত একশো বছরের জীবাশ্মবিদ্যার সাক্ষ্যপ্রমাণের দিকে একবার তাকিয়ে নেওয়া যাক।



শাখামৃগ থেকে মানুষ

অনেক হাজার বছরের
মরু-যবনিকার আচ্ছাদন
যখন উৎক্ষিপ্ত হল,
দেখা দিল তারিখ-হারানো লোকালয়ের
বিরাট কঙ্কাল ;—
ইতিহাসের অলক্ষ্য অন্তরালে
ছিল তার জীবনক্ষেত্র।

নেয়ানডার্টাল মানুষ

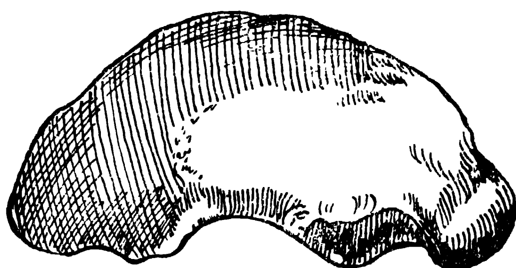
১৮৬৬ সাল। ডারউইনের 'অরিজিন অফ স্পিসিস' প্রকাশিত হবার সাত বছর পরের ঘটনা। জার্মানির ডুসেলডোর্ফ-এর কাছে নেয়ানডার্টাল নামে একটি গিরিপথ—তারই সামনে ফেল্ড্হোফার নামে একটি গুহা। এখানে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে পাওয়া গেল মানুষের মাথার একটি খুলি। যারা মাটি খুঁড়ছিল তাদের কাছে এই খুলিটির কোনো দাম ছিল না—তারা বুঝতেও পারেনি যে এটি হচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের একটি নিদর্শন, বা যাকে বলা হয়

'ফসিল'। ভাগ্যক্রমে ডঃ ফিউল্‌রোট্‌ নামে একজন জীববিজ্ঞানী এই ফসিলটির সন্ধান পেয়ে গেলেন। এই ফসিলটি সম্পর্কে জার্মানির একটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হল। ডারউইনের বইয়ের পরেই এই আবিষ্কার বিপুল এক আলোড়ন জাগিয়ে তুলল বিজ্ঞানীমহলে। তারপরে দশ বছর ধরে বিজ্ঞানীরা এই মাথার খুলিটি নিয়ে তর্কবিতর্ক করেছিলেন। কেউ বললেন, এই হচ্ছে মানুষের পূর্বপুরুষের নিদর্শন। কেউ বললেন, ওসব বাজে কথা, নিতান্তই একটা শিম্পাজীর মাথার খুলি নিয়ে হৈচৈ করা হচ্ছে। কেউ বললেন, খুলিটা মানুষের মাথারই বটে কিন্তু মানুষটা একেবারেই একালের, কোনো একটা রোগে মানুষটার মাথার খুলি অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। মোট কথা বিজ্ঞানীরাও সহজে স্বীকার করতে পারছিলেন না যে মানুষের পূর্বপুরুষের চেহারা আদপেই মানুষের মতো ছিল না। একালের মন নিয়ে আমরা হয়তো এই আবিষ্কার ও তার সিদ্ধান্তকে মামুলি মনে করতে পারি। কিন্তু একশো বছর আগে এমনি কতকগুলো ছোট ছোট আবিষ্কারের মধ্যে দিয়েই মানুষের চিন্তাজগতে সবচেয়ে বড়ো বিপ্লবটির সূত্রপাত হয়েছিল। তাকে মানতে হয়েছিল, জীবজগতের শীর্ষে থাকা সত্ত্বেও সে একটি বিশেষ সৃষ্টি নয়, মানুষ্যেতর জীবের সঙ্গে তার জ্ঞাতিসম্পর্ক থেকে গিয়েছে।

যাই হোক, অনেক তর্কবিতর্কের পরে এই ফসিলটিকে মানুষের পূর্বপুরুষের নিদর্শন হিসেবে মেনে নেওয়া হল এবং তার নাম দেওয়া হল নেয়ানডার্টাল মানুষ (Homo Neanderthalensis)। স্বয়ং ডারউইন ১৮৭১ সালে প্রকাশিত মানুষের উদ্ভব সম্পর্কিত বইয়ে এই ফসিলটি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তা সত্ত্বেও নেয়ানডার্টাল মানুষ স্বয়ং ডারউইনের কাছেও পুরোপুরি স্বীকৃতি পায়নি। তাঁর মন্ত্রশিষ্য হাক্স্‌লের কাছেও নয়। তাঁদের দুজনের মনেই শেষ পর্যন্ত খানিকটা দ্বিধা ছিল। তবে নেয়ানডার্টাল মানুষ যে বিজ্ঞানীদের মনোযোগ এতখানি আকর্ষণ করতে পেরেছিল তার সুফল ফলতেও

বেশি দেরি হয়নি।

১৮৬৪ সালে ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানীদের একটি সভায় এমনি আরেকটি প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মাথার খুলি উপস্থিত করা হয়েছিল। ১৮৬৬ সালে বেলজিয়ামে পাওয়া গেল প্রাগৈতিহাসিক মানুষের চোয়ালের হাড় ও তিনটি মাথার খুলি। এই খুলি তিনটির আবিষ্কারে কিছুটা বিশেষত্ব ছিল। কোথাও মাটি-খোঁড়ার কাজ চলছে, আচমকা মাটির তলা থেকে একটুকরো হাড় বা মাথার খুলি বেরিয়ে এল, তারপরে আনাড়ীদের হাত-ফেরতা হতে হতে সেটা শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল কোনো একজন বিজ্ঞানীর হাতে—এটা সে-ধরনের আবিষ্কার নয়। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা ফসিলের সন্ধানেই বেরিয়েছিলেন এবং নিজেদের তত্ত্বাবধানে মাটির পরত সরিয়ে সরিয়ে ফসিল তিনটি





নেয়ানডার্টাল মানুষের মাথার খুলি

আবিষ্কার করেছিলেন। এই আবিষ্কারের পরে নেয়ানডার্টাল মানুষকে পুরোপুরি স্বীকৃতি দিতে আর কোনো বাধা থাকল না। তার বয়সেরও একটা হিসেব পাওয়া গেল মাটির পরত থেকে। বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করলেন, নেয়ানডার্টাল মানুষ আজ থেকে ৭৫,০০০ বছর আগে এই পৃথিবীর মাটিতে চলাফেরা করেছে।

জাভা মানুষ

নেয়ানডার্টাল মানুষকে নিয়ে উত্তেজনা স্তিমিত হতে না হতেই আবির্ভাব ঘটল দ্বিতীয় প্রাগৈতিহাসিক মানুষের। অবশ্যই সশরীরে নয়, ফসিলের রূপ নিয়ে। এই চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের পর্যন্ত খানিকটা যেন হতবাক করে দিয়েছিল। তাঁরা ব্যাপারটাকে বুঝতে গিয়ে আরো যেন গুলিয়ে ফেললেন। খবরের কাগজে এতদিন এসব বিষয়ে কোনো লেখালেখি হত না। কিন্তু এবারে তাও শুরু হয়ে গেল। সাধারণ মানুষরা পর্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব যাঁর, তিনি হল্যাণ্ডের মানুষ। জন্ম ১৮৫৮ সালে। নাম ইউজেন দ্যুবোয়া (Eugene Dubois)। আঠাশ বছর বয়সে কৃতী ছাত্রজীবন পেরিয়ে তিনি আমস্টার্ডাম বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শারীরবিদ্যার অধ্যাপক হয়েছিলেন। যদি অধ্যাপনায় টিকে থাকতেন তাহলে তাঁর ভবিষ্যৎ ছিল খুবই নিশ্চিন্ত ও উজ্জ্বল। কিন্তু তিনি মানুষটি ছিলেন একটু বেয়াড়া ধরনের। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ সম্পর্কে তাঁর ছিল প্রচণ্ড একটা উন্মাদনা। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে মানুষের সত্যিকারের পূর্বপুরুষকে তিনিই আবিষ্কার করবেন।

আর শুধু প্রতিজ্ঞা নয়, এই উদ্দেশ্যে নিজেকে প'্রাপুরি প্রস্তুতও করেছিলেন। তাঁকে বিশেষভাবে প্রেরণা দিয়েছিল ডারউইন ও আর্নস্ট হেকেল (Ernst Haeckel)-এর লেখা। আর্নস্ট হেকেল ছিলেন সেকালের জার্মানির একজন বিখ্যাত প্রকৃতিবিজ্ঞানী। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে যান। তারপর থেকে তিনি পুঁথিগত চর্চাতেই নিজেকে নিবদ্ধ রেখেছিলেন। ১৮৭০ থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে তাঁর লেখা তিনটি জীববিজ্ঞানের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। শেষ গ্রন্থটি ছিল মানুষের বিবর্তন সম্পর্কে। এই তিনটি গ্রন্থে হেকেল ডারউইনের বিবর্তনবাদকে বিস্তৃত এক ব্যাখ্যার মধ্যে উপস্থিত করতে চেষ্টা করেন। তাঁর মতে একই আদি থেকে উদ্ভূত হয়ে পৃথিবীর এই প্রাণীজগৎ আজকের রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

আদিতে প্রাণ ছিল অতি সরল, তারপরে ক্রমেই তা জটিল হয়েছে ও নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হয়ে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। একেবারে আদি প্রাণের নাম তিনি দিয়েছিলেন মোনেরোন (moneron)। আণুবীক্ষণিক বিন্দুর মতো এই প্রাণটি। তারপরে বিভিন্ন ধাপে অন্যান্য যে-সব প্রাণীর উদ্ভব হয়েছিল তাদেরও তিনি এমনি এক একটি নাম দিয়েছিলেন। সবটাই ছিল তাঁর কল্পনা। কিন্তু পরবর্তী কালের গবেষণায় ও আবিষ্কারে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের মিল পাওয়া গিয়েছিল।

মানুষের ক্রমবিবর্তনের চিত্র উপস্থিত করতে গিয়েও হেকেল এমনি কল্পনাশক্তির পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। মানুষের পূর্বপুরুষের আসনে তিনি বসিয়েছিলেন মনুষ্যসদৃশ বানরকে (anthropoid ape)। এই মানুষ্যসদৃশ বানর থেকে মানুষে পৌঁছতে গিয়ে অবশ্যম্ভাবী একটি ধাপও তাঁকে কল্পনা করতে হয়েছিল। এই না-মানুষ না-বানর নর-বানরটির নাম তিনি দিয়েছিলেন পিথিক্যানথপাস (Pithecanthropus)।

ইউজেন ডুবোয়ার প্রতিজ্ঞা ছিল, হেকেল-কল্পিত এই পিথিক্যান-থ্রপাসকে তিনি আবিষ্কার করবেন। ডুবোয়া খুঁটিয়ে খবর নিতে লাগলেন, পৃথিবীর কোন্ কোন্ অংশে গোরিলা, শিম্পাঞ্জী, ওরাংওটাং জাতীয় নর-বানরের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর দুটি মাত্র এলাকাকেই অনুসন্ধানের কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করতে হল। মধ্য ও পূর্ব আফ্রিকা এবং ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ। হল্যাণ্ডের মানুষ হিসাবে শেষোক্ত জায়গাতেই তাঁর পক্ষে যাওয়া সুবিধে। তিনি সেই চেষ্টাই করতে লাগলেন। নিশ্চিন্ত অধ্যাপনা ছেড়ে অনিশ্চিতের দিকে পা বাড়াতে দেখে অনেকেরই ধারণা হল যে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রতিজ্ঞায় অটল। শেষ পর্যন্ত মিলিটারি ডাক্তারের চাকরি নিয়ে ১৮৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি তাঁর কল্পনার স্বর্গ সুমাত্রায় এসে হাজির হলেন।

প্রথম ছ-মাস হাসপাতাল নিয়েই তাঁকে এমন ব্যস্ত থাকতে হল যে কোথাও গিয়ে মাটি খোঁড়ার ফুরসৎ আর পেলেন না। তারপরেও আরো আড়াই বছর তাঁকে নানা জায়গায় হাতড়ে বেড়াতে হয়েছিল।

পিথিক্যানথ্রপাসের ফসিল তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন ১৮৯১ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে। স্থানটি যবদ্বীপের পূর্বার্ধে, ত্রিনিল নামে একটি গ্রামের কাছে। কয়েকটি আগ্নেয়গিরি আছে সেখানে। কোনো কোনোটা থেকে মাঝে মাঝে অগ্ন্যুৎপাতও হয়ে থাকে। এমনি একটি আগ্নেয়গিরি থেকে নেমে এসেছে সোলো নামে একটি নদী। নদীটি প্রথমে গিয়েছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে, তারপরে পশ্চিমে পাক খেয়েছে, তারপরে গিয়ে পড়েছে প্রশান্ত মহাসাগরে। নদীটিকে পথ করে নিতে হয়েছে আগ্নেয়গিরির লাভা ও ভস্মের মধ্যে দিয়ে। এই লাভা ও ভস্ম ও পাঁক খুঁড়তে খুঁড়তেই প্রথমে পাওয়া গিয়েছিল ওপরের পাটির একটি দাঁত, তারপরে করোটি (cranium)। এই দুটি নিদর্শন থেকেই পরবর্তী কালে পিথিক্যানথ্রপাস বা জাভা-মানুষকে খাড়া করা হয়েছিল। বিজ্ঞানীদের অনুমান, রক্তমাংসের জাভা-মানুষের সঙ্গে সশরীরে সাক্ষাৎ করতে হলে একলক্ষ থেকে তিনলক্ষ বছর পিছিয়ে যেতে হবে।

পিকিং মানুষ

এই শতকের গোড়ার দিকে একজন জার্মান ডাক্তার চীনে পসার জমিয়েছিলেন। তাঁর ছিল কিউরিও সংগ্রহ করার বাতিক। বিশেষ করে ফসিল-দাঁত। সে সময়ে চীনের হাতুড়ে চিকিৎসকরা রোগীর ওপরে অদ্ভুত সব ওষুধ প্রয়োগ করতেন। যেমন, সাপের চামড়া, কুকুরের নাড়িভুঁড়ি, হাড়ের টুকরো, দাঁত ও আরো নানা রকমের জিনিস। ফলে, যেগুলোকে বলা হত ওষুধের দোকান সেখানে এই জিনিসগুলো প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। দাঁতগুলোকে বলা হত চীনা পৌরাণিক গল্পের ড্রাগনের দাঁত, যা আসলে ছিল প্রাচীন

কালের জীবজন্তুর ফসিল-দাঁত। জার্মান ডাক্তারটি এই ফসিল-দাঁত প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করেছিলেন। তারপরে তিনি এই ফসিল-দাঁতগুলোকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবাশ্ম-বিদ্যার একজন অধ্যাপকের কাছে। এই অধ্যাপকটি ১৯০৩ সালে লেখা একটি প্রবন্ধে দাঁত সম্পর্কে গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন যে এই ফসিল-দাঁতগুলির মধ্যে একটি খুব সম্ভবত আদিযুগের মানুষের। এর চেয়ে বেশি কিছু বলা হয়নি। একটিমাত্র দাঁতকে অবলম্বন করে এর চেয়ে বেশি বলা হয়তো সম্ভব ছিল না। কিন্তু এই সামান্য উল্লেখটুকুর মধ্যেই পিকিং মানুষের সূত্রপাত।

ফসিলের নিদর্শন থেকে পিকিং মানুষের সত্যিকারের মূর্তিটি খাড়া করতে সময় লেগেছিল আরো প্রায় পঁচিশ বছর। কোনো একটি বিশেষ দেশের প্রচেষ্টায় নয়, অনেকগুলো দেশের। পিকিং মানুষের আবিষ্কারের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিকতার ছাপ থেকে গিয়েছে। সূত্রপাতে রয়েছেন একজন জার্মান ডাক্তার, ভিত্তিস্থাপনে সুইডেনের একজন বিজ্ঞানী, প্রতিষ্ঠায় একজন কানাডীয় আর সম্পূর্ণতা-দানে একজন ফরাসী, একজন চীনা ও একজন আমেরিকান।

১৯১৬ সালে সুইডেন থেকে ডঃ অ্যাণ্ডারসন এসেছিলেন চীনের ভূ-সমীক্ষা বিভাগের পরামর্শদাতা হিসেবে। খনি ও পার্বত্য অঞ্চলে তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হত এবং সেই সুযোগে তিনি হাড়ের টুকরো ও দাঁত সংগ্রহ করতেন। ১৯২০ সালে একবার তিনি পিকিঙের পঁচিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে চাউ কূ তিয়েন (Chou Kou Tien) অঞ্চলে চক-খনি পরিদর্শন করতে গিয়েছিন। এই চক-খনিগুলো আসলে ছিল চক-পাহাড়ের গায়ে কাটা মস্ত মস্ত গুহা। এমনি একটি গুহায় তাঁর চোখে পড়ল যে গুহার মাটি অদ্ভুত রকমের লাল। ভালো করে দেখার পরে তিনি বুঝতে পারলেন যে গুহার মাটির সঙ্গে ফসিল-হাড় মিশে রয়েছে। তাঁর ধারণা হল যে গুহার মাটি খুঁড়লে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ফসিল

পাওয়া যেতে পারে।

ডঃ অ্যাণ্ডারসন নিজের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে স্টকহোল্‌মে চিঠি লিখলেন। ডঃ ঝান্‌স্কি (Zdansky) নামে একজন বিজ্ঞানী এলেন তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে। কালবিলম্ব না করে চাউ কু তিয়েন গুহার মাটি খোঁড়া হল। যেমনটি আশা করা গিয়েছিল, মাটির তলা থেকে পাওয়া গেল অজস্র ফসিল। তার মধ্যে ছিল দুটি দাঁত, যা অনেকটা মানুষের দাঁতের মতোই দেখতে।

ঠিক এই সময়ে, ১৯২৫ সালে, কানাডা থেকে ডঃ ডেভিডসন ব্ল্যাক নামে শারীরবিদ্যার একজন অধ্যাপক এসেছিলেন পিকিঙে। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ সম্পর্কে তাঁর ছিল অদম্য কৌতূহল ও গবেষণা-স্পৃহা। আর বিষয়টি সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি ওয়াকিবহালও ছিলেন। চাউ কু তিয়েন গুহা থেকে আবিষ্কৃত দাঁতদুটো দেখেই তাঁর ধারণা হল, মস্ত একটি আবিষ্কার চাউ কু তিয়েন গুহার মাটির নিচে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে আছে। টাকা পাওয়া গেল রক্‌ফেলার ফাউণ্ডেশন থেকে। শুরু হল সুপরিকল্পিত খননকার্য।

ডঃ ব্ল্যাক হতাশ হননি। ১৯২৭ সালের ২৬শে অক্টোবর তারিখে চাউ কু তিয়েন গুহার মাটির তলা থেকে পাওয়া গেল প্রাগৈতিহাসিক মানুষের একটি ফসিল-দাঁত। পুরো একমাস ধরে তিনি এই দাঁতটিকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলেন। ২রা ডিসেম্বর তারিখে চীনা ভূ-সমীক্ষা সমিতির কাছে তাঁর রিপোর্ট পৌঁছল। এই রিপোর্টে তিনি পিকিং মানুষ বা সিনানথ্রপাস (Sinanthropus pekinensis)-এর অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করলেন। এমনি ভাবে একটিমাত্র দাঁতের সূত্র ধরে পুরো একটি মানুষকে আবিষ্কার করা হল। যেমন তেমন মানুষ নয়, যে-মানুষটি বেঁচেছিল আজ থেকে একলক্ষ বছরেরও আগে এবং নর-বানরের চেয়ে আধুনিক মানুষের সঙ্গেই যার চেহারার মিল বেশি। ঘোষণাটি যেমন দুঃসাহসিক তেমনি চাঞ্চল্যকর।

পরের চার বছরে চাউ কু তিয়েন গুহার খননকার্যের জন্যে রক্‌ফেলার

ফাউণ্ডেশন থেকে আরো কুড়িহাজার ডলার মঞ্জুর হল। একশো জন লোককে কাজে লাগিয়ে তিন বছরে মাটি সরানো হল ১২,০০০ ঘনমিটার পরিমাণ। প্রায় ২০০০ বাক্স ফসিল নিয়ে আসা হল পিকিঙে।

ডঃ ব্ল্যাকের সহকারী ছিলেন ডঃ পাই (Pei) নামে একজন চীনা জীবাশ্মবিদ। তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করছিলেন একজন ফরাসী ও একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী। ১৯২৮ সালে চাউ কূ তিয়েন গুহা থেকে পাওয়া গেল একটুকরো করোটি, নিচের চোয়ালের হাড় ও কয়েকটি দাঁত। ১৯২৯ সালে মাথার খুলির ওপরের অংশ। ১৯৩০ সালে মাথার খুলি। ফরাসী ও আমেরিকান বিজ্ঞানী দুজন জমির পরত পর্যবেক্ষণ করে কোন্ পরত কতটা প্রাচীন তা সঠিক-ভাবে নির্ধারণ করলেন।

এমনিভাবে পিকিং মানুষের অস্তিত্ব ও প্রাচীনত্ব নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হল। এই আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডে সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব অবশ্যই ডঃ ব্ল্যাকের। তিনিই সর্বপ্রথম একটিমাত্র দাঁতের সাক্ষ্য থেকে সম্পূর্ণ মানুষটিকে কল্পনা করতে পেরেছিলেন।

তারপরে ১৯৩৬, ১৯৩৭ ও ১৯৩৯ সালে যবদ্বীপ থেকে আরো কয়েকটি পিথিক্যানথ্রপাসের ফসিল পাওয়া গেল। সমস্ত সাক্ষ্য মিলিয়ে দেখার পরে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করলেন, আজ থেকে একলক্ষ বছরেরও আগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এমন একদল জীব বাস করত যারা না পুরোপুরি নর-বানর, না পুরোপুরি মানুষ। দুয়ের মাঝামাঝি। ডারউইন ও হেকেলের কল্পনা সত্য প্রমাণিত হল। মিসিং লিংক্টি আর মিসিং থাকল না—বাস্তব সাক্ষ্যপ্রমাণের সাহায্যে তার সম্পূর্ণ চেহারাটি চোখের সামনে দাঁড় করানো গেল।

অস্ট্রালোপিথেকাস

পৃথিবীর অন্য একটি অংশেও প্রায় একই সময়ে (১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে) নর-বানরের ফসিল পাওয়া গিয়েছিল। এই

অংশটি হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা। আর যে ফসিল পাওয়া গিয়েছিল তা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ফসিলের চেয়েও প্রাচীন। ফসিল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাগৈতিহাসিক নর-বানরের যে চেহারাটি দাঁড় করানো হয়েছে তার সঙ্গে নরের চেয়ে বানরের মিল বেশি। এই কারণে এই ফসিলকে নর-বানর না ব'লে বানর-নর বলাই ভালো।

দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রাগৈতিহাসিক মানুষের ফসিল প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯২৪ সালে। সে-সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিম ট্রান্সভাল অঞ্চলে একটি খনি-কোম্পানির খননকার্য চলছিল। এই সূত্রেই মাটির তলা থেকে পাওয়া গিয়েছিল একটি মাথার খুলি। এই খুলিটি হাত ফেরতা হতে হতে শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছয় উইট্‌ওয়াটার্সর‍্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যার অধ্যাপক রেমণ্ড ডার্ট (Raymond Dart)-এর হাতে। খুলিটি ছিল পাঁচ-ছয় বছরের একটি শিশুর। এই সামান্য সূত্রটি অবলম্বন ক'রেই অধ্যাপক ডার্ট প্রাগৈতিহাসিক মানুষটির অস্তিত্ব ঘোষণা করলেন আর তার নাম দিলেন অস্ট্রালোপিথেকাস (Australopithecus africanus)।

তারপরে দশ বছর এ-বিষয়ে আর কোনো অনুসন্ধান হয়নি। ১৯৩৪ সালে ডঃ রবার্ট ব্রুম আফ্রিকায় এসেছিলেন প্রিটোরিয়ার যাদুঘরের কাজ নিয়ে। ১৯৩৬ সালের মে মাসে তিনি স্থির করলেন যে অস্ট্রালোপিথেকাসের সন্ধানে তিনি অভিযান করবেন।

অভিযানের স্থান হিসেবে নির্বাচিত হল স্টার্কফোন্‌টাইন নামে একটি কৃষিনির্ভর গ্রামাঞ্চল, জোহান্নেসবার্গ থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে। এই অঞ্চলে অনেকগুলো গুহা ছিল। রবিবারে বা ছুটির দিনে প্রচুর লোক বেড়াতে আসত এখানে। বার্লো নামে একজন লোক গাইডের কাজ করত। এই বার্লোর কাছ থেকে ডঃ ব্রুম শুনতে পেলেন যে এই গুহাগুলোয় নাকি অজস্র ফসিল-হাড় রয়েছে। ডঃ ব্রুমের ধারণা হল যে এই গুহাগুলো থেকেই অস্ট্রালোপিথেকাসের ফসিল পাওয়া যাবে। তাঁর ধারণা মিথ্যে হল না। ১৯৩৬ সালের ১৭ই আগস্ট তারিখে পাওয়া গেল একটি মাথার খুলি। দেখা গেল,

এই খুলিটি অস্ট্রালোপিথেকাসের সগোত্র। ডঃ ব্রুম তার নাম দিলেন প্লেসিয়ানথ্রপাস (Plesianthropus transvaalenis)। পরের কয়েক মাসে এই একই জায়গা থেকে অস্ট্রালোপিথেকাসের সগোত্র আরো আটটি মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছিল।

কিন্তু সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারটি হয় ১৯৩৮ সালের জুন মাসে। ৮ই জুন তারিখে ডঃ ব্রুম বার্লোর কাছ থেকে একখণ্ড ফসিল-হাড় পেলেন। এই হাড়টি ওপরের চোয়ালের। হাড়টি পরীক্ষা করে ডঃ ব্রুম দেখলেন, হাড় থেকে দুটি পেষণ-দাঁত সদ্য ভেঙে নেওয়া হয়েছে। তাঁর ধারণা হল যে এই হাড়টি হয়তো অন্য কোনো অঞ্চল থেকে আনা হয়েছে এবং খোঁজ করলে এই ভেঙে-নেওয়া দাঁতদুটিও কারও না কারও কাছ থেকে পাওয়া যাবে।

অনেক টাকা কবুল করার পরে বার্লোর কাছ থেকে জানা গেল যে হাড়টি সে পেয়েছে গের্ট নামে একটি স্কুলের ছেলের কাছ থেকে। ছেলেটি থাকে টেররাঞ্চে। ডঃ ব্রুম সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন দু-মাইল দূরের টেররাঞ্চে। গের্ট তখন স্কুলে চলে গিয়েছিল। কিন্তু গের্টের মা-বাবা একটি পাহাড় দেখিয়ে ডঃ ব্রুমকে বললেন যে ওই পাহাড় থেকেই নাকি গের্ট হাড়টা কুড়িয়ে পেয়েছে। ডঃ ব্রুম সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন পাহাড়ে। সেখানে পাওয়া গেল মাথার খুলির কয়েকটা টুকরো আর দুটি দাঁত। সেখান থেকে ডঃ ব্রুম ছুটলেন গের্টের স্কুলে। হেডমাস্টারমশাইয়ের ঘরে গের্টকে ডেকে আনা হল। হতভম্ব গের্ট তার ট্রাউজারের পকেট থেকে বার করল দুটি দাঁত। পরে গের্টকে সঙ্গে নিয়ে ডঃ ব্রুম আবার সেই পাহাড়ের ওপর গেলেন ও আরো কিছু ফসিল-হাড় আবিষ্কার করলেন। এমনিভাবে কয়েকটি তুচ্ছ ঘটনার যোগাযোগে জীবাশ্মবিদ্যার ইতিহাসের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারটির সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগৃহীত হল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যে ডঃ ব্রুমের অভিযান তারপরে কয়েক বছরের জন্যে বন্ধ ছিল। ১৯৪৭ সালে এবং পরের তিন বছরে তিনি আবার অস্ট্রালোপিথেকাসের কতকগুলো ফসিল আবিষ্কার করেছেন।

ক্রমবিবর্তনের ধারা

ফসিলের নিদর্শন থেকে মানুষের ক্রমবিবর্তনের একটি ধারা এবারে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। এ-প্রসঙ্গে অবশ্যই মনে রাখা দরকার, যে তিনটি ফসিলের বিবরণ আমরা দিয়েছি তার বাইরেও আরো অজস্র ফসিল আবিষ্কার করা হয়েছে। এইসব ফসিলের সাক্ষ্য মিলিয়ে দেখতে দেখতে বিজ্ঞানীরা একটি সিদ্ধান্ত টানতে বাধ্য হয়েছেন। সময়ের দিক থেকে যতোই পিছিয়ে যাওয়া যায় ততোই যেন মানুষ ও নর-বানরের (ape) মধ্যে চেহারার মিল ফুটে ওঠে। তবে এ থেকে এ-সিদ্ধান্ত করা চলে না যে নর-বানরের ক্রমবিবর্তন হতে হতেই মানুষ। ডারউইন নিজেও একথা কোনো সময়েই বলেননি। কিন্তু ডারউইনের বই প্রকাশিত হবার পরে এই কথাটাই তাঁর নামে চলে গিয়েছিল। ফসিলের সাক্ষ্য থেকে আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি, নর-বানর ও মানুষের উদ্ভব একই পূর্বপুরুষ থেকে। অর্থাৎ, নর-বানরকে আমরা বড়ো জোর মানুষের জ্ঞাতি বলতে পারি —তার বেশি কিছু নয়।

বিজ্ঞানীদের অনুমান, মানুষের এই পূর্বপুরুষদের পাওয়া যেতে পারত আফ্রিকায়, আজ থেকে প্রায় আড়াই কোটি বছর আগে। এদের আমরা নাম দিতে পারি আফ্রিকান নর-বানর। আফ্রিকার এই নর-বানর থেকে দুটি শাখা বেরিয়েছে—একটি শাখায় মানুষ, অপরটিতে আধুনিক নর-বানর (গিবন, শিম্পাঞ্জী, গোরিলা, ওরাং-ওটাং)।

মানুষ ও নর-বানর—এই দুই শ্রেণীর জীবকে একত্রে বলা হয় প্রাইমেট (primate)। যদিও স্তন্যপায়ী—কিন্তু অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের তুলনায় প্রাইমেটরা নানা দিক থেকে বিশিষ্ট। স্তন্যপায়ীদের মতোই প্রাইমেটদের শরীরও লোমে ঢাকা থাকে, মায়ের পেটে অনেক দিন ধরে বড়ো হবার পরে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হয়, মায়ের বুকের দুধ খেয়ে বাচ্চা বড়ো হয়ে ওঠে, তাদের শরীরের রক্ত হয় উষ্ণ, শরীরের ভেতরকার উত্তাপ হয় নির্দিষ্ট মাপের। এ গেল

সাধারণ লক্ষণের দিক। এ ছাড়াও আছে কতকগুলো বিশিষ্ট লক্ষণ। সে-সম্পর্কে ধারণা করতে হলে প্রথমে প্রাইমেটদের ক্রমবিবর্তনের ধাপগুলোকে চোখের সামনে তুলে ধরতে হবে।

প্রথম ধাপে রয়েছে লেমুর। এদের দেখে মনে হয়, কতকগুলো ঘাটতির জন্যে এরা খাঁটি নর-বানর হতে পারেনি। তারপরে বেবুন। এরা খাঁটি নর-বানর। তারপরে শিম্পাঞ্জী, ওরাং-ওটাং, গোরিলা ও গিবন। এরা অতিরিক্ত রকমের খাঁটি নর-বানর। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে ধাপে ধাপে যতোই ওপরের দিকে ওঠা যাচ্ছে ততোই শরীরের অস্ত্রসজ্জা কমছে ও মগজের আয়তন বাড়ছে। শেষ পর্যন্ত মানুষের বেলায় দেখা যায়, মগজের আয়তন ও জটিলতা দুই-ই খুব বেশি।

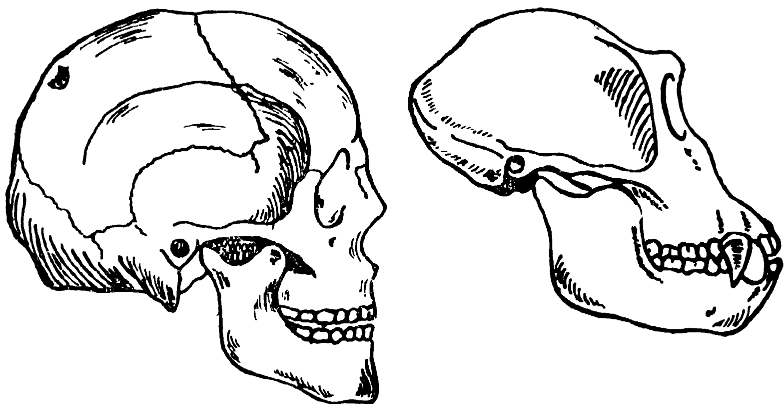
মানুষের শরীরে অস্ত্রসজ্জা প্রায় না-থাকার মতো। এমনিতে মনে হতে পারে, বেঁচে থাকার সংগ্রামে জয়ী হতে হলে জীবের শরীরে অস্ত্রসজ্জা থাকাটা খুবই জরুরি। জীবজগতের দিকে তাকালে দেখা যাবে, আত্মরক্ষার জন্যে কোনো কোনো জীব আগে থেকেই আক্রমণ করে বসে, কোনো কোনো জীব আগে থেকেই পালায়, কোনো কোনো জীব আক্রান্ত হবার পরে প্রতিরোধ করে। মাংসাশী জীবরা প্রথম দলের, তাদের আছে দাঁত ও থাবা। ঘোড়া দ্বিতীয় দলের, তাদের আছে দ্রুত ছুটবার মতো পা। হাতি তৃতীয় দলের, তাদের আছে শুঁড়। এই ভাবে শুধু অস্ত্রসজ্জার দিক থেকে বিচার করলেও স্তন্যপায়ীদের জীবনসংগ্রামের কতকগুলো রীতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রাইমেটরা যদিও স্তন্যপায়ী কিন্তু তাদের শরীরের অস্ত্রসজ্জার আয়োজন অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো নয়। প্রাইমেটদের পাঁচ-আঙুলওলা পা দ্রুত ছুট দেবার পক্ষে অনুপযোগী। তাদের হাতের নখ কোনো ক্ষেত্রেই থাবা হতে পারে না। দাঁত এমনই মাঝারি আকারের যে তার প্রয়োগ খাদ্যবস্তুতে কামড় দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। আবার এই দাঁতের সংখ্যাও অ্যান্থপয়েড ও মানুষে ৩৬ থেকে কমে ৩২ হয়েছে। মানুষের দাঁত

আকারেও খুব ছোট। কিন্তু শরীরের অস্ত্রসজ্জার দিক থেকে এতখানি বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও প্রাইমেটরা কিন্তু আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে খুব অসহায় নয়। অস্ত্রসজ্জার ঘাটতি তারা পূরণ করেছে হাতিয়ার দিয়ে। অনেক নর-বানরই আত্মরক্ষার জন্যে ঢিল ছুঁড়তে বা লাঠি ব্যবহার করতে পারে। আর মানুষের তো নামই দেওয়া হয়েছে হাতিয়ারধারী জীব ; হাতিয়ারের জোরই মানুষের জোর।*

মানুষ ও নর-বানর

মানুষ ও নর-বানরকে একই নামের মধ্যে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু মানুষ ও নর-বানর সবদিক থেকে এক নয়। দুয়ের তফাৎ-গুলোকে একে একে স্পষ্ট করা যাক।

সবচেয়ে বড়ো তফাৎ মাথার খুলির গড়নে। নিচের ছবির দিকে তাকালে তফাৎটা বোঝা যাবে। নর-বানরের মুখখানা সামনের দিকে



মাথার খুলি—(বাঁ দিকে) মানুষের (ডান দিকে) নরবানরের

ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। তার করোটি সমতল (flat) ও খুবই ছোট। মানুষের মুখখানা মোটামুটি সমতল কিন্তু তার করোটি মস্ত ও পেছনদিকে উঁচু হয়ে ওঠা। বিখ্যাত ফরাসী জীববিজ্ঞানী কুভিএ (Cuvier) বলেছেন—জীবজগতে মানুষই একমাত্র জীব যার

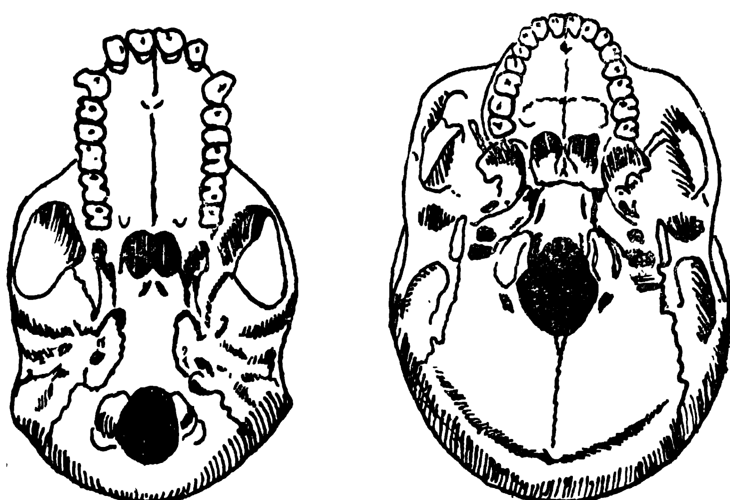
* 'মানুষের ঠিকানা' বইয়ে এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

করোটি সবচেয়ে বড়ো আর মুখ সবচেয়ে ছোট ; জীব যতো হিংস্র ও নির্বোধ হবে ততোই তার করোটি হবে ছোট ও মুখ হবে বড়ো।

আজকাল অবশ্য গণিতের সূত্র প্রয়োগ করে করোটির মাপ স্থির করা হয়ে থাকে। মাপের মাত্রা অনুসারে করোটিকে আবার তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। আমরা এতসব আলোচনার মধ্যে যাব না। শুধু এটুকু জেনে রাখাই যথেষ্ট যে নর-বানর থেকে মানুষে করোটির আয়তন ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে। নর-বানরের করোটির আয়তন ৪০০ থেকে ৬০০ ঘন সেন্টিমিটার, মানুষের করোটির আয়তন ১৩০০ থেকে ১৬০০ ঘন সেন্টিমিটার।

মানুষের ভাষা আছে, নর-বানরের নেই। মানুষের মুখের গড়নই এমন যে জিভ ও আনুষঙ্গিক অংশগুলোকে খুশিমতো নড়ানো চলে। তার মগজে থাকে ভাষা নিয়ন্ত্রণের অংশ।

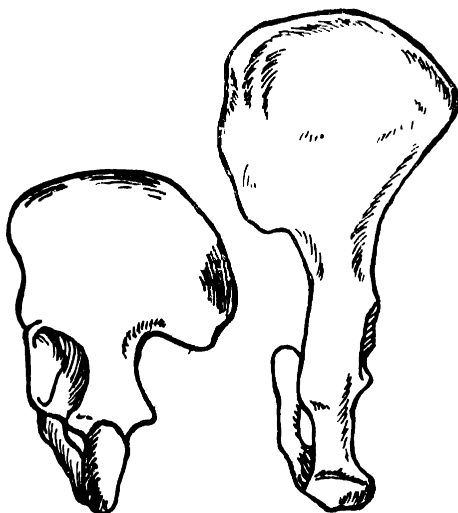
নর-বানরের ও মানুষের দাঁতের গড়নে ও বিন্যাসেও বেশ তফাৎ আছে। নিচের ছবি দেখলে তফাৎটা স্পষ্ট বোঝা যাবে। নর-বানরের দাঁতের বিন্যাস ইংরেজি U অক্ষরের মতো। তাদের শ্ব-দাঁত



দাঁতের বিন্যাস—(বাঁ দিকে) নর-বানরের (ডান দিকে) মানুষের

(canine) এতই মস্ত যে উল্‌টোদিকের মাড়িতে গিয়ে ঠেকে। এই শ্ব-দাঁতের জায়গা করার জন্যে নর-বানরদের দাঁতের পাটিতে শেষ ছেদন (incisor) ও প্রথম পেষণ (molar) দাঁতের মধ্যে খানিকটা করে ফাঁক থেকে যায়। মানুষের দাঁতে এ-ধরনের কোনো ব্যাপার নেই।

এ ছাড়াও আরো একটি খুব বড়ো ব্যাপারে নর-বানরে ও মানুষে তফাৎ থেকে গিয়েছে। নর-বানর ও মানুষ দু-দলই সিধে হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু চলাফেরা করার সময়ে দেখা যায়, নর-বানররা পায়ের সঙ্গে সঙ্গে লম্বা দুটি হাতেরও সাহায্য নিয়ে থাকে। অর্থাৎ চলাফেরা করার সময়ে নর-বানররা অনেকটা চতুষ্পদীদের মতোই। সিধে হয়ে দাঁড়াতে বা চলাফেরা করতে হলে মাথাটাকে শিরদাঁড়ার ওপরে সোজা করে রাখা দরকার। নর-বানর ও মানুষের কঙ্কালে শিরদাঁড়া যেখানে শেষ আর মাথার খুলি যেখানে শুরু সেখানে আছে ছোট্ট একটি ফুটো, যার নাম ফোরামেন ম্যাগ্‌নাম (foramen magnum)। মানুষের কঙ্কালে এই ফুটোটি আছে ভূমির সমান্তরাল (horizontal) সমতলে, নর-বানরে আছে তির্যক (oblique) সমতলে। এই তফাৎটুকুর জন্যেই মানুষের মাথা শিরদাঁড়ার ওপরে



শ্রোণীচক্র—(বাঁ দিকে) মানুষের
(ডান দিকে) নরবানরের

সিধে থাকে, নর-বানরের মাথা ঝুঁকে পড়ে সামনের দিকে। কোনো জীব সিধে হয়ে চলাফেরা করে কিনা তা শরীরের আরেকটি হাড় পরীক্ষা করেও জানা যেতে পারে। এই হাড়টি রয়েছে কোমরের নিচে, নাম শ্রোণীচক্র (pelvis)। মানুষের বেলায় এই শ্রোণীচক্রটি হয় চওড়া আর বড়ো—কারণ এই হাড়টিকে পাকস্থলী ও অন্ত্রদেশের সমস্ত প্রত্যঙ্গের বোঝা বইতে হয়। নর-বানরের শ্রোণীচক্র সরু আর লম্বা—পাকস্থলী ও অন্ত্রদেশের সবটুকু বোঝা এই হাড়টির ওপরে পড়ে না।

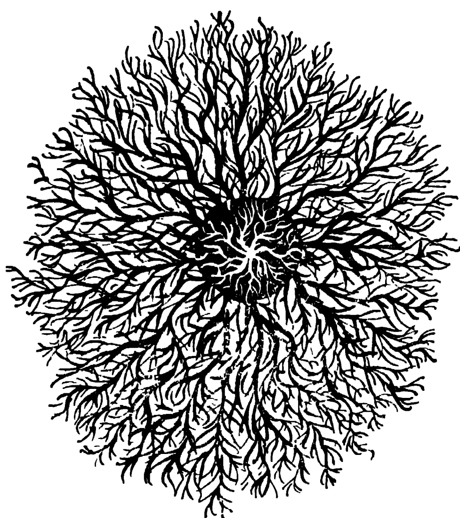
তাহলে দেখা যাচ্ছে, একটি বা দুটি হাড় পরীক্ষা করেই, সেই হাড় যে-জীবের শরীর থেকে এসেছে তার সম্পর্কে অনেক কিছু বলা যেতে পারে। এমনি ভাবেই প্রাগৈতিহাসিক কালের ফসিল হিসেবে পাওয়া একটি দাঁত, একটুকরো মাথার খুলি, ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করেই জীবটির শারীরবৃত্তান্ত সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব হয়েছে। যেমন, শ্রোণীচক্র দেখেই বলা যেতে পারে, জীবটি দ্বিপদ না চতুষ্পদ। করোটির আয়তন দেখে বলা যেতে পারে, জীবটি নর-বানর না মানুষ না দুয়ের মাঝামাঝি। দাঁতের বিন্যাস ও গড়ন দেখেও জীবটির সঙ্গে নর-বানর বা মানুষের সম্পর্ক আঁচ করা সম্ভব। এ ছাড়াও আরো নানা ক্ষেত্রে ছোটখাটো পার্থক্য অবশ্যই লক্ষ্য করা যেতে পারে। নৃতত্ত্ববিদ, জীবাশ্মবিদ ও পুরাতত্ত্ববিদরা ফসিলকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেছেন এমনি সব লক্ষণ দেখেই। এমনি ভাবেই তাঁরা জানতে পেরেছেন—মানুষ কি-ভাবে মানুষ হয়েছে আর মানুষেরও আগে কী ধরনের জীব এই পৃথিবীতে বাস করত। এমনি ভাবেই আরো নানা নিদর্শনকে খুঁটিয়ে বিচার করে তাঁরা জানতে পেরেছেন—আদি-প্রাণের রূপটি কী ছিল আর সেই আদি-প্রাণ কি-ভাবে রূপান্তরিত হতে হতে আজকের এই বিপুল ও বিচিত্র জীবজগৎ। হাজার-লক্ষ-কোটি বছর আগেকার দু-একটি ফসিল—এই বিপুল জীবজগৎ ও বিপুলতর পৃথিবীর যা অতি অকিঞ্চিৎকর নিদর্শন মাত্র—তা থেকেই টেনে বার করা হয়েছে প্রাণের উদ্ভব ও বিবর্তনের অতি

রোমাঞ্চকর এক ইতিবৃত্ত। বিজ্ঞানীদের এ-কৃতিত্বের কোনো তুলনা নেই।

মাত্র একশো বছর আগেও আমরা অন্ধভাবে বিশ্বাস করতাম—আমরা মানুষ, আমরা শ্রেষ্ঠ, এই পশুপাখির জগতের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। গত একশো বছরের জীবাশ্মবিদ্যার আবিষ্কার আমাদের শিখিয়েছে, আমরা সত্যিই মানুষ, আমরা সত্যিই শ্রেষ্ঠ, তবে এই মনুষ্যত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব পশুপাখির জগতের সঙ্গে গভীর সম্পর্কের ভিত্তিতে। রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র প্রবন্ধে এক জায়গায় বলেছেন, "অভিব্যক্তির ইতিহাসে মানুষের একটা অংশ তো গাছপালার সঙ্গে জড়ানো আছে। কোনো এক সময়ে আমরা যে শাখামৃগ ছিলাম আমাদের প্রকৃতিতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারও অনেক আগে কোনো এক আদি যুগে আমরা নিশ্চয়ই শাখী ছিলাম, তাহা কি ভুলিতে পারিয়াছি?" এই উদ্ধৃতি রবীন্দ্রনাথের কোনো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ থেকে নয়। শালবনের নতুন কচি পাতায় বসন্তের হাওয়া লেগেছে—সেদিকে তাকিয়ে তিনি নিজের সম্পর্কে ও মানুষের সম্পর্কে সত্য পরিচয়টি উপলব্ধি করছেন।

আমরা এক সময়ে শাখামৃগ ছিলাম তার কিছুটা বিবরণ এই পরিচ্ছেদে দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমরা যে এক সময়ে শাখীও ছিলাম—সেই বিবরণের দিকেও এবারে যেতে হবে। তারপরে সেখানেই থামা নয়—যেতে হবে আরো পেছনের দিকে—প্রাণের উৎসে।

এই অভিযানে যতোদূর সম্ভব আমরা জীবাশ্মবিদ্যার বাঁধা সড়ক ধরেই এগোতে চেষ্টা করব।



জীবন্ত ফসিল

এসেছি সুদূর কাল থেকে।
তোমাদের কালে
পৌছলেম যে-সময়ে
তখন আমার সঙ্গী নেই।

জাবাশ্মবিদ্যার বাঁধা সড়কে পা দিয়ে গোড়াতেই থমকে দাঁড়াতে হয় জীবন্ত একটি ফসিল আবিষ্কারের কাহিনীর সামনে। এই কাহিনী দিয়েই শুরু করি।

জীবন্ত ফসিল কথাটা অনেকটা সোনার পাথরবাটির মতো। ফসিল আবার জীবন্ত হয় নাকি! আর জীবন্তই যদি হবে তবে আর ফসিল বলব কেন! অবশ্য কোনো কোনো মানুষ সম্পর্কে আমরা বলে থাকি, লোকটা যেন জীবন্ত ফসিল। এই বিশেষণটি প্রয়োগ করে আমরা বোঝাতে চাই যে আধুনিক কালে বাস করেও লোকটির চিন্তাভাবনা মান্ধাতার আমলের। অর্থাৎ, অনেক আগেই যা লোপ পাওয়া উচিত ছিল, তা টিকে আছে। আজ যদি পৃথিবীর কোনো অংশে একটি জীবন্ত ডাইনোসরকে দেখা যায় তাহলে নিশ্চয়ই আমরা সেই ডাইনোসরকে বলব জীবন্ত ফসিল। এমনি এক জীবন্ত

ফসিল আবিষ্কারের কাহিনী জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

ঘটনাটির সূত্রপাত আজ থেকে চব্বিশ বছর আগে ১৯৩৮ সালে। খ্রীষ্টমাস শুরু হতে তখনো কয়েক দিন বাকি। দক্ষিণ-আফ্রিকার সমুদ্র-উপকূলের জেলেরা পুরোদমে মাছ ধরছে। একদিন দেখা গেল, পাঁচফুট লম্বা আর মনখানেক ওজনের একটা মাছ একজনের জালে আটকা পড়েছে।

সমুদ্রের জেলেরা এমনিতেই নানা ধরনের মাছ দেখতে অভ্যস্ত। সহজে তারা অবাক হয় না। কিন্তু এই বিশেষ মাছটি দেখে অনেক দিনের অভিজ্ঞ এই জেলেটিকেও অবাক হতে হল। এমন কিম্ভুত চেহারার মাছ সে আগে আর কখনো দেখেনি। অনেক ভেবেচিন্তে সে স্থানীয় যাদুঘরের কীপার মিস লাটিমারের কাছে জিম্মা দিয়ে এল মাছটিকে।

আর মাছটি দেখে শ্রীমতী লাটিমারও একেবারে থ'। এমনটি তিনিও এর আগে দেখেননি। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি একটি চিঠি লিখলেন দক্ষিণ আফ্রিকার তৎকালীন অগ্রগণ্য মৎস্যবিদ জে. এল. বি. স্মিথের কাছে। চিঠিটার ওপরে অধ্যাপক স্মিথ খুব বেশি গুরুত্ব দিলেন না। এমনি ধরনের চিঠি তিনি প্রতি মাসেই গণ্ডা কয়েক পেয়ে থাকেন। কোনো ক্ষেত্রেই আজ পর্যন্ত নতুন কিছু তাঁর চোখে পড়েনি। তবুও জবাবে তিনি লিখলেন যে শ্রীমতী লাটিমার যেন মাছটি সংরক্ষিত করে রাখেন। খ্রীষ্টমাসের পরে তিনি সময় করে একবার যাবেন।

শ্রীমতী লাটিমার চেষ্টার ত্রুটি করেননি। কিন্তু খ্রীষ্টমাস উৎসব বলে তো আর মাছের পচন বন্ধ করা যাবে না। মাছটা পচতে লাগল আর গলতে শুরু করল। পচা-গলা মাছটাকে জঞ্জালের মতো ফেলে দেওয়া ছাড়া শ্রীমতী লাটিমারের আর গত্যন্তর রইল না। আর ঠিক এমনি সময়ে অধ্যাপক এসে হাজির। মাছটি তিনি দেখলেন আর দেখে এমন অবাক হয়ে গেলেন যে তাঁর মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল। তিনি চোখের সামনে এমন একটি জীব দেখছেন

যা ছয় কোটি বছর আগে পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাবার কথা! জীবাশ্মবিদরা এই জীবটির সঙ্গে খুবই পরিচিত। তাঁরা এর নাম দিয়েছেন সীলাকন্থ (coelacanth)। জীববিজ্ঞানীদের ধারণা, বিবর্তনের ধারায় ডাঙ্গার মেরুদণ্ডী জীবদের একেবারে গোড়ায় রয়েছে এই সীলাকন্থ। অথচ মাত্র দশ দিন আগেও এই জীবটি জীবন্ত অবস্থায় সমুদ্রের জলে চলাফেরা করেছে! ঘটনাটি অবিশ্বাস্য। অধ্যাপক স্মিথ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

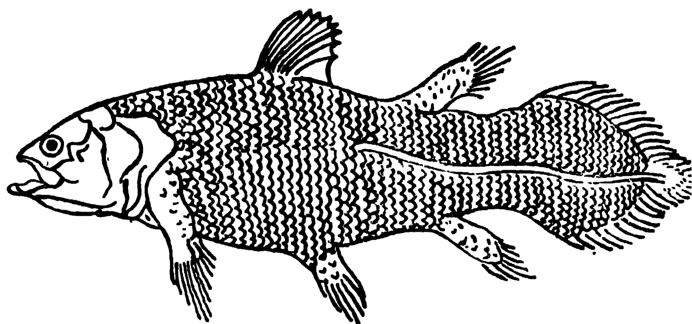
সীলাকন্থের সন্ধানে

১৯৩৯ সালে শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সেই ডামাডোলের মধ্যে সীলাকন্থ সম্পর্কে অধ্যাপক স্মিথের লিখিত প্রবন্ধটি বিশেষ কারও নজরে পড়ল না। কিন্তু অধ্যাপক স্মিথের তখন আর অন্য কোনো দিকে খেয়াল নেই। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা, একটি যখন পাওয়া গিয়েছে তখন চেষ্টা করলে আরো একটি সীলাকন্থ সমুদ্রের তলা থেকে পাওয়া যেতে পারে। তিনি উঠে-পড়ে লাগলেন। মাদাগাস্কার ও আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের মধ্যে ভারত মহাসাগরের যে-অংশটিকে বলা হয় মোজাম্বিক প্রণালী সেটি হল তাঁর অনুসন্ধানের ক্ষেত্র। এই উপকূল বরাবর যেখানে যতো গ্রাম আছে সর্বত্র তিনি ঢুঁড়ে বেড়াতে লাগলেন। জেলে-ডিঙ্গি আর জাল নিয়ে নিজেও বেশ কয়েকবার পাড়ি দিলেন সমুদ্রে। জেলেদের কাছে গিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে জানতে চেষ্টা করলেন, এমনি ধরনের মাছ আগে আর কারও জালে উঠেছে কিনা। আর প্রত্যেককে বারবার সাবধান করে দিলেন, এমনি ধরনের দ্বিতীয় আরেকটি পাওয়া গেলেই তাঁকে যেন খবর দেওয়া হয়।

গ্রামে গ্রামে অদ্ভুত ধরনের একটি বিজ্ঞাপন বিলি হতে লাগল। বিজ্ঞাপনের ঠিক মাঝখানে সীলাকণ্ঠ-এর ছবি আর ওপরে-নিচে তিন ভাষায় লেখা একটি ঘোষণা :

"এই মাছটির দিকে খুব ভালো করে তাকিয়ে দেখুন। এই মাছটির

দৌলতে আপনি হয়তো বড়লোক হয়ে যেতে পারেন। দেখুন মাছটির কেমন অদ্ভুত ধরনের জোড়া লেজ, কেমন অদ্ভুত ধরনের



পাখনা। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে এই মাছ আগে আর মাত্র একটিই পাওয়া গিয়েছে আর সেটি ছিল ৫ফুট (১৬০ সে. মি.) লম্বা। কিন্তু আরো কয়েকটি মাছ আগে দেখা গিয়েছে। কপালগুণে আপনি যদি এমনি একটি মাছ ধরতে পারেন বা এমনি একটি মাছের সন্ধান পান তাহলে মাছটিকে কোনো রকম কাটাকুটি বা মাজাঘষা করবেন না। সঙ্গে সঙ্গে আস্তো মাছটিকে ঠাণ্ডাঘরে সংরক্ষিত করুন বা এমন কারও হাতে দিন যিনি মাছটিকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবেন। আর তাঁকে বলুন নিম্নলিখিত ঠিকানায় সঙ্গে সঙ্গে একটি তারবার্তা পাঠাতে: অধ্যাপক জে. এল. বি. স্মিথ, রোড্‌স্ ।বশ্ববিদ্যালয়, গ্রাহাম্‌স্‌টাউন, দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন। যদি আপনি দুটি মাছ ধরতে পারেন তাহলে প্রত্যেকটির জন্যে আপনাকে হাজার পাউণ্ড হিসেবে পুরস্কার দেওয়া হবে। রোড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয় ও দক্ষিণ আফ্রিকা বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এই পুরস্কারের জন্যে জিম্মাদার থাকছে। যদি আপনি দুটির বেশি মাছ পান তাহলেও প্রত্যেকটিকেই সংরক্ষিত করুন, কারণ বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে প্রত্যেকটি মাছই প্রয়োজন। আর এক্ষেত্রেও আপনাকে প্রচুর পরিমাণে পুরস্কৃত করা হবে।"

তিন ভাষায় লেখা এই বিজ্ঞাপনটি লোকের হাতে হাতে ঘুরতে লাগল।

আরো একটি জীবন্ত ফসিল

দ্বিতীয় সীলাকন্থ যখন ধরা পড়ল ততোদিনে এই বিজ্ঞাপনটি দশ বছরের পুরনো হয়ে গিয়েছে আর সেই ১৯৩৮-এর পরে কেটেছে চোদ্দ বছর। এবারেও খ্রীষ্টমাস শুরু হতে আর কয়েক দিন মাত্র বাকি। ১৯৫২ সালের ২০শে ডিসেম্বর। কোমোরো দ্বীপপুঞ্জের আঞ্জুয়ান দ্বীপের পূর্ব উপকূল এবারকার ঘটনাস্থল। চোদ্দ বছর ধরে গোটা এলাকাটি এজন্যে তৈরি হয়ে ছিল। মাছটি সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হল ডেপুটি অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটরের কাছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার পাঠালেন মাদাগাস্কারে। চারদিকে এমন একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল যেন কোনো মহামান্য অতিথির পদার্পণ হয়েছে।

মাদাগাস্কার থেকে তারবার্তার জবাব আসতে দেরি হচ্ছিল। ইতিমধ্যে একটি ব্রিটিশ জাহাজের ক্যাপটেন খবরটা শুনে মাছটিকে নিজের তদারকে নিয়ে এলেন এবং সরাসরি তার পাঠালেন অধ্যাপক স্মিথের কাছে। অধ্যাপক স্মিথ সেই তার পেয়ে কী করবেন ভেবে ঠিক করতে না পেরে টেলিফোন করলেন ডঃ মালানকে। ডঃ মালান সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক স্মিথের জন্যে একটি বিশেষ বিমানের বন্দোবস্ত করে দিলেন।

কিন্তু এত কাণ্ড করার পরেও অধ্যাপক স্মিথ যখন এসে পৌঁছতে পারলেন ততোদিনে মাছটি দশ দিনের পুরনো হয়ে গিয়েছে। তবে এবারে আর আক্ষেপ করার তেমন কোনো কারণ ছিল না। কারণ মাছটি খুব ভালোভাবে সংরক্ষিত ছিল। প্রায় অবিকৃত অবস্থাতেই অধ্যাপক স্মিথ মাছটি দেখতে পেলেন। চোদ্দ বছরের প্রতীক্ষার পরে ঈপ্সিত বস্তুর এই দর্শনলাভ! মাছটির সামনে দাঁড়িয়ে অধ্যাপক স্মিথ শিশুর মতো কাঁদতে লাগলেন।

আরো কয়েকটি

ইতিমধ্যে এই মাছটিকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের কূটনীতিতে টানাপোড়েন শুরু হয়ে গেল। সে-সময়ে মাদাগাস্কারে প্রকৃতিবিজ্ঞান

সংগ্রহশালা ও বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থার অধ্যক্ষ ছিলেন ডঃ জে. মিলো (Dr. J. Milot)। জরুরি কাজে তিনি গিয়েছিলেন প্যারিসে। ফিরে এসে সমস্ত শুনে তিনি রীতিমতো হৈ-চৈ কাণ্ড বাধিয়ে তুললেন। ফরাসী এলাকার সমুদ্র থেকে পাওয়া সীলাকন্থ কিনা ব্রিটিশ বিজ্ঞানীর হাতে চলে যাবে! এমন ব্যাপার কিছুতেই বরদাস্ত করা চলে না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ডঃ মিলো নিজেই তৎপর হয়ে উঠলেন। আবার নতুন করে বিজ্ঞাপন বিলি হতে লাগল কোমোরো দ্বীপপুঞ্জের জেলেদের কাছে। এবারে ১,০০,০০০ ফ্রাঁ পুরস্কার। এই বিজ্ঞাপন হাতে নিয়ে ডঃ মিলোর সহকারীরা অক্লান্ত-ভাবে জেলেদের সঙ্গেই রাত কাটাতে লাগলেন। জাল ও জেলে-ডিঙ্গি নিয়ে নিজেরাও পাড়ি দিলেন সমুদ্রে। প্রত্যেকটি ঘাঁটিতে দস্তার লাইনিং দেওয়া বাক্স আর ফর্ম্যাল্ডিহাইড জমা করে রাখা হল। প্রত্যেকটি দ্বীপের শাসনকর্তাকে জানিয়ে রাখা হল যে সীলাকন্থ ধরা পড়া মাত্রই জরুরি খবর পাঠাতে যেন বিলম্ব না হয়। আর খবর পাওয়া মাত্রই ডঃ মিলো যাতে যাত্রা করতে পারেন সেজন্যে ফরাসী বিমান বাহিনীর একটি বিমান সর্বক্ষণের জন্যে তৈরি হয়ে রইল।

এবারে কিন্তু পুরো এক বছরও অপেক্ষা করতে হল না। তার আগেই প্রত্যাশিত সুখবরটি পাওয়া গেল।

১৯৫৩ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর। আঞ্জুয়ান দ্বীপের একজন জেলে গিয়েছিল গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে। রাত সাড়ে-এগারোটার সময় তারই হাতে ধরা পড়ল প্রকাণ্ড একটি সীলাকন্থ। লম্বায় ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি। ওজন ৮৭ পাউণ্ড। মাছটি চিনতে তার একটুও বিলম্ব হল না। সঙ্গে সঙ্গে সে তীরে ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটল শাসনকর্তার কাছে খবর দিতে। খবর শুনে শাসনকর্তা বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে এলেন। এলেন তাঁর সহকারীও। সারা রাত ধরে চলল মাছের পরিচর্যা। ভোর হবার আগেই মাছটি যাত্রী-বিমানে তুলে দেওয়া হল। দুপুরের মধ্যেই মাছটি পৌঁছে গেল মাদাগাস্কারের রাজধানীতে। সারা শহরের লোক বিমানঘাঁটিতে ভিড় করে দেখতে এল মাছটিকে।

১৯৫৪ সালের জানুআরি মাসে ধরা পড়ল আরো একটি সীলাকন্থ। ফেব্রুআরি মাসে আরো একটি। সবসুদ্ধ পাঁচটি। শেষ তিনটি সীলাকন্থ প্রায় অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত হয়েছে।

খবরের কাগজে এবং বিজ্ঞানী মহলে সীলাকন্থ নিয়ে প্রচণ্ড হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল।

সীলাকন্থের বৈশিষ্ট্য

সীলাকন্থ নিয়ে কেন এত হৈ-চৈ হয়েছিল তা বুঝতে হলে বিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মাছটিকে চিনে নেওয়া দরকার।

সীলাকন্থের ছবির দিকে ভালো করে তাকালে বোঝা যাবে, সাধারণ মাছের সঙ্গে এই মাছটির অনেক তফাৎ।

সীলাকন্থেরও পাখনা আছে। কিন্তু পিঠের দিকে প্রথম পাখনাটি বাদ দিলে সীলাকন্থের অন্য সমস্ত পাখনা সাধারণ মাছের মতো একেবারেই নয়। সাধারণ মাছের পাখনাতে থাকে পর্দা দিয়ে আটকানো সারি সারি কাঁটা আর এই কাঁটাগুলো সরাসরি মাছের শরীরের ভেতর থেকেই বেরিয়ে এসেছে। ছবির দিকে তাকালে বোঝা যাবে, সাধারণ মাছের মতো পাখনা এই মাছটিতে মাত্র একটিই আছে –তা পিঠের দিকে প্রথম পাখনাটি। অন্য সমস্ত পাখনার বেলায় দেখা যাবে, মাছের শরীর থেকে প্রথমে বেরিয়ে এসেছে এক ঢিবি মাংস আর মাংসের ঢিবি থেকে বেরিয়েছে কতকগুলো কাঁটা। এমনি ধরনের ঢিবি-পাখনাওয়ালা মাছ হাজার চেষ্টা করলেও বাজারের মাছের মধ্যে একটিও পাওয়া যাবে না। বাজারে মাঝে মাঝে অদ্ভুত চেহারার সমুদ্রের মাছ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু চেহারা যতোই অদ্ভুত হোক, এমনি ধরনের ঢিবি-পাখনা কারও নেই।

এ তো গেল বাইরে থেকে দেখা। এই ঢিবি-পাখনাকে কাটাকুটি করেও বড়ো অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা গিয়েছে। মানুষের হাতের মতো এই চিবি-পাখনাতেও তিনটি হাড় (হিউমারাস, রেডিয়াস,

আল্‌না)। তাছাড়াও আছে কতকগুলো ছোট ছোট চ্যাপ্‌টা হাড়, যেগুলোকে মানুষের কব্‌জির সঙ্গে তুলনা করা চলে।

তার মানে, সীলাকন্থের পাখনা সাধারণ মাছের পাখনার মতো পল্‌কা নয়। জলের মধ্যে শুধুমাত্র শরীরের ব্যালান্স রাখার জন্যে এমন শক্তসমর্থ হাড়গোড়ওলা পাখনার দরকার ছিল না। সীলাকন্থের পাখনা পুরোপুরি পাখনা নয়, অনেকখানি পা-ও। এই পাখনা-পায়ের সাহায্যে সীলাকন্থের পক্ষে মাটিতে হামাগুড়ি দেওয়াটা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নয়। সাধারণ মাছের পল্‌কা পাখনা এ-কাজের পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত।

ডাঙ্গায় ফুসফুস—জলে ফুল্‌কো

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সীলাকন্থ চেষ্টা করলে পাখনা-পা দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে ডাঙ্গায় উঠে আসতে পারে। কিন্তু তারপরে? ডাঙ্গায় উঠে এলে কি সীলাকন্থকে অন্যান্য সাধারণ মাছের মতো খাবি খেতে হবে না? এখানেই সীলাকন্থের অপর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা ওঠে।

সীলাকন্থের মুখটা হাঁ করিয়ে মুখের ভেতরটা পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, এই মাছের নাকের ফুটো দুটোর সঙ্গে তার গলার সরাসরি যোগ আছে। বাইরে থেকে দেখলে নাকের ফুটো সাধারণ মাছেরও আছে। কিন্তু সাধারণ মাছের বেলায় নাকের ফুটো গলা পর্যন্ত পৌঁছয়নি। এদিক থেকে সীলাকন্থের সঙ্গে ডাঙ্গার মেরুদণ্ডী জীবের খুবই মিল। ডাঙ্গার মেরুদণ্ডী জীব নাক দিয়ে দুটি কাজ করে—ঘ্রাণ ও নিশ্বাস নেওয়া। নাক দিয়ে নিশ্বাস নেওয়া তখনই সম্ভব যখন নাকের ফুটোর সঙ্গে গলার শ্বাসনালীর সরাসরি যোগ থাকে এবং শ্বাসনালী শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছয় ফুসফুসে। সাধারণ মাছ নাকের ফুটো দিয়ে ঘ্রাণই নিতে পারে, শ্বাস নিতে পারে না। সাধারণ মাছের শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজটা চলে ফুলকোর সাহায্যে। জলের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থায় অক্‌সিজেন থাকে। মাছের ফুলকো

এই অক্‌সিজেনকে টেনে নিতে পারে। কিন্তু সীলাকন্থের বেলায় দেখা যাচ্ছে, এই জীবটির সাধারণ মাছের মতো ফুলকোও আছে, আবার ডাঙ্গার মেরুদণ্ডী জীবের মতো গলা পর্যন্ত প্রসারিত নাকের ফুটোও আছে। তার মানে, সীলাকন্থের পক্ষে মুখ বন্ধ করেও শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া সম্ভব। আর ডাঙ্গায় নিশ্বাস নিতে হলে শুধু নাকের ফুটো থাকাই যথেষ্ট নয়, ফুসফুসও থাকা দরকার। সীলাকন্থের বেলায় আমরা ধরে নিতে পারি যে তার পট্‌কাটুটিই ফুসফুস হয়ে উঠেছে।

এবারে বোধ হয় বোঝা যাচ্ছে কেন সীলাকন্থ নিয়ে এত হৈ-চৈ হয়েছিল। জীবজগতের বিবর্তনে এটি এমন এক সময়ের নিদর্শন যখন জলের জীব ডাঙ্গায় উঠে আসবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। সীলাকন্থ মাছ বটে কিন্তু সাধারণ পাখনাওলা মাছ নয়। সীলাকন্থের ঢিবি-পাখনাকে যদিও ডাঙ্গার মেরুদণ্ডী জীবের পায়ের সঙ্গে তুলনা করা চলে কিন্তু ডাঙ্গার মেরুদণ্ডী জীবের মতো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সীলাকন্থের নেই। আবার সীলাকন্থ মাছের মতো জলেও শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে, ডাঙ্গার মেরুদণ্ডী জীবের মতো ডাঙ্গাতেও শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে। অর্থাৎ সীলাকন্থকে বলা চলে উভচর জীব।

সীলাকন্থ সম্পর্কে আরো একটি লক্ষ্য করবার বিষয় আছে। তা হচ্ছে এর লেজ। ছবির দিকে তাকালে বোঝা যাবে, এই মাছের লেজটি যে ঠিক কোথায় শুরু তা বলা শক্ত। সাধারণ মাছের মতো এই মাছের লেজটি শরীর থেকে পৃথক হয়নি। ফলে মাছের মূল শরীরের তলার দিকের খানিকটা অংশকেই বাধ্য হয়ে আমাদের লেজ বলতে হচ্ছে। এই লেজ থেকেই মাছটির প্রাচীনত্ব টের পাওয়া যায়। এই প্রাথমিক ধরনের লেজবিশিষ্ট জীবটি কখনোই অর্বাচীন হতে পারে না।

জল থেকে ডাঙ্গায়

এবারে আমাদের সময়ের দিক থেকে ৩২ কোটি বছর পিছিয়ে যেতে হবে। পুরাজীবীয় যুগের ডেভোনিয়ান কাল শুরু হয়েছে। পৃথিবীর

ভৌগোলিক চেহারা মোটেই এখনকার মতো নয়। উত্তর আমেরিকা আটলান্টিক ও উত্তর ইওরোপের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে রয়েছে প্রকাণ্ড মহাদেশ। ট্রপিক অঞ্চলের মতো আবহাওয়া। কখনো অনাবৃষ্টি, কখনো অতিবৃষ্টি। আর এই মহাদেশটিকে দক্ষিণ দিকে ঘিরে রয়েছে যে সমুদ্র সেখানে নানা অদ্ভুত ধরনের মাছের বাস। এই মাছের দঙ্গলের মধ্যে একটি মাছ আমাদের চেনা। তা হচ্ছে সীলাকন্থ।

কিন্তু ডাঙ্গার দিকে তাকালে আমরা দেখব, উদ্ভিদ বলতে শুধু রয়েছে ছোটখাটো ঝোপঝাড় আর প্রাণী বলতে কয়েক জাতীয় পোকা-মাকড় ও বিছে-জাতীয় জীব। অর্থাৎ, ডাঙ্গার জীবন সবেমাত্র শুরু হয়েছে বলা চলে। কিন্তু ডাঙ্গার জীবনের এতখানি প্রসার হয়নি যে আমরা বলতে পারি জীবজগৎ ডাঙ্গাকে বা মহাদেশকে জয় করেছে। জীবজগতের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারব, মহাদেশকে সত্যিকারের জয় করতে পেরেছে মেরুদণ্ডী জীবরা। পোকামাকড় বা বিছে-জাতীয় জীবের পক্ষে মহাদেশকে জয় করা একেবারেই অসম্ভব। মেরুদণ্ডী জীবরাই ডাঙ্গায় বাস করতে শুরু করার পরে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিল। গোটা পৃথিবীই হয়ে উঠেছিল তাদের বাসস্থান। মানুষ আসবার অনেক আগেই মেরুদণ্ডী জীবরা মহাদেশ-বিজয় সম্পূর্ণ করেছিল।

কিন্তু ৩২ কোটি বছর আগে ডেভোনিয়ান কালের শুরুতে এসে দেখা যাচ্ছে, মেরুদণ্ডী জীবরা তখনো জলেই বাস করে। সমুদ্রের জলে তো বটেই, এমন কি মহাদেশের অভ্যন্তরের নানা জলাশয়েও। আগেই বলেছি, মহাদেশের আবহাওয়াটা ছিল ট্রপিক। কখনো অনাবৃষ্টি, কখনো অতিবৃষ্টি। সহজেই অনুমান করা চলে, অনাবৃষ্টির সময়ে মহাদেশের অভ্যন্তরের জলাশয়গুলো শুকিয়ে যেত—গোটা মহাদেশটি হয়ে উঠত প্রায় মরুভূমির মতো। এই অবস্থায় শুধু সেইসব জীবই টিকে থাকতে পারত, ডাঙ্গার জীবন যাদের শরীরের গড়নের পক্ষে অনুপযুক্ত ছিল না। আমরা আগেই আলোচনা

করেছি, সীলাকন্থ এমনি ধরনের একটি উভচর জীব।

আর সেই সময়ে সীলাকন্থ-ধরনের আরো একটি মাছ ছিল যার নাম রিপিডিস্‌টিয়া (Rhipidistia)। ঠিক তেমনি ঢিবি-পাখনা, তেমনি নাকের ফুটো, যার সাহায্যে ডাঙ্গাতেও নিশ্বাস নেওয়া চলে। জীববিজ্ঞানীদের মতে, এই রিপিডিস্‌টিয়া জাতের মাছ থেকেই মেরুদণ্ডী জীবের সূত্রপাত।

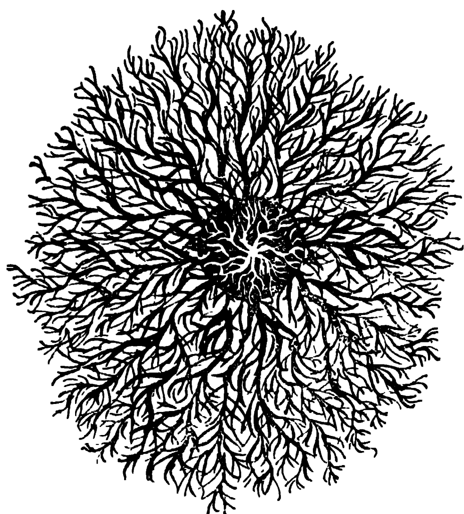
অবশ্যই ব্যাপারটা রাতারাতি ঘটেনি। পুরোপুরি ডাঙ্গার জীবের আবির্ভাব হতে আরো কয়েক কোটি বছর সময় লেগেছিল। আজ থেকে ২৮ কোটি বছর আগে যখন ডেভোনিয়ান কাল শেষ হয়ে কার্বনিফেরাস কাল শুরু হচ্ছিল তখনো উভচর জীবদেরই আধিপত্য চলেছে। তবে এরা নামেই উভচর, অধিকাংশ সময়ে জলেই বাস করে। এদের যদিও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গজিয়েছে কিন্তু তা এতই দুর্বল যে ডাঙ্গায় বাস করার উপযুক্ত নয়। কিন্তু আরো ছয় কোটি বছর পরে পার্মিয়ান কালে এসে দেখা যাচ্ছে, উভচর জীবরা অধিকাংশ সময়ে ডাঙ্গাতেই বাস করে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গও যথেষ্ট সবল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সীলাকন্থ যদিও নিদর্শন হিসেবে খুবই কৌতূহলোদ্দীপক কিন্তু সীলাকন্থ জীবজগতের বিবর্তনের কোনো একটা সরাসরি ধাপ নয়। সীলাকন্থ সম্পর্কে আমরা শুধু এইটুকুই বলতে পারি, জীবজগতের বিবর্তনে কোনো এক সময়ে এমনি ধরনের জীবের আবির্ভাব হয়েছিল। অর্থাৎ সীলাকন্থকে যদি মানুষের পূর্বপুরুষ বলতেই হয় তবে তা নিতান্তই দূর-সম্পর্কে। সীলাকন্থ যদি সত্যিই জীবজগতের বিবর্তনের ইতিহাসে সরাসরি একটি ধাপ হত তাহলে এই ১৯৩৮ সালে এই জীবটিকে কখনোই আফ্রিকার সমুদ্রে জীবন্ত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া যেত না।

যেমন আজকের দিনে হিমালয়ের যে তুষার-মানবের কথা বলা হচ্ছে, তাকে যদি সত্যিই খুঁজে পাওয়া যায় আর সত্যিই দেখা যায় যে সে যতোটা না নর-বানর তার চেয়ে বেশি মানুষ—তাহলেও একথা কিছুতেই বলা চলবে না যে এই তুষার-মানবটি মানুষের

সরাসরি পূর্বপুরুষ। এক্ষেত্রেও খুবই দূর-সম্পর্ক। সরাসরি সম্পর্ক থাকলে আজকের দিনে আর এই তুষার-মানবটির কোনো অস্তিত্ব থাকত না। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, কিছুকাল আগে স্যার এডমণ্ড হিলারী হিমালয় থেকে নেমে এসে ঘোষণা করেছেন যে তুষার-মানবের কোনো অস্তিত্ব নেই। তার মানে, এদিক থেকে বিচার করলে বলা চলে, স্যার হিলারী তুষার-মানবকে জাতে উঠিয়ে দিয়ে গেলেন।

মোট কথাটা তাহলে এই : বিবর্তনের প্রক্রিয়া সীলাকন্থ পর্যন্ত এসে থেমে যায়নি। অথচ কোটি কোটি বছর পরেও সীলাকন্থ সেই সীলাকন্থই রয়ে গেল। তার মানে আমরা বলতে পারি, সীলাকন্থ বিবর্তনের প্রক্রিয়ার একটি অ-সফল প্রচেষ্টা। বা, বিবর্তনের মূল সড়ক থেকে বেরিয়ে আসা একটি অন্ধ গলি। কাজেই সীলাকন্থের বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় সরাসরি একটি ধাপ হিসেবে নয়, বিবর্তনের বিশেষ একটি ধাপের সমকালীন নিদর্শন হিসেবে।



সরীসৃপের যুগ

উছল প্রাণের চঞ্চলতা
আপনারে নিয়ে।
অস্তিত্বের আনন্দ ও ব্যথা
উঠিছে ফেনিয়ে।

প্রাণের উৎসে আমাদের এই অভিযানে উভচর জীবরা একটি বড়ো রকমের দিগ্‌চিহ্ন। জীববিজ্ঞানীদের মতে প্রথম সত্যিকারের উভচর জীবের আবির্ভাব আজ থেকে প্রায় সাড়ে-সাতাশ কোটি বছর আগে—যখন ডেভোনিয়ান সময়কাল শেষ হয়ে কার্বনিফেরাস শুরু হতে যাচ্ছিল।

আমাদের এই অভিযানে 'ডেভোনিয়ান', 'কার্বনিফেরাস' ইত্যাদি শব্দগুলোর সঙ্গে বারবার সাক্ষাৎ ঘটবে। এতক্ষণের আলোচনা থেকে এটুকু নিশ্চয়ই বোঝা গিয়েছে যে এই শব্দগুলোর সাহায্যে বিশেষ এক একটি সময়কালকে বোঝানো হচ্ছে। আলোচনায় আরও অগ্রসর হবার আগে টুকরো টুকরো সময়কালের পুরো চিত্রটিকে একবার চোখের সামনে তুলে ধরা দরকার।*

* 'পৃথিবীর ঠিকানা'য় এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

যুগ ও উপযুগ

জীবনের লক্ষণ দেখে যদি বিচার করতে হয় তাহলে পৃথিবীর ইতিহাসের গত পঞ্চাশ কোটি বছরকে তিনটি যুগে ভাগ করা চলে।

(১) নবজীবীয় (Cainozoic)। এটি স্তন্যপায়ীদের যুগ। শুরু আজ থেকে সাত কোটি বছর আগে এবং এখনো চলছে।

(২) মধ্যজীবীয় (Mesozoic)। সরীসৃপদের যুগ। আজ থেকে উনিশ কোটি বছর আগে শুরু হয়ে সাত কোটি বছর আগে শেষ।

(৩) পুরাজীবীয় (Palaeozoic)। আদিম প্রাণীদের যুগ। পঞ্চাশ কোটি বছর আগে শুরু হয়ে উনিশ কোটি বছর আগে শেষ।

প্রত্যেকটি যুগকে আবার কতকগুলো কালে ও পর্বে ভাগ করা হয়েছে। যেমন, নবজীবীয় যুগের ছুটি কাল, মধ্যজীবীয় যুগের তিনটি, পুরাজীবীয় যুগের ছ-টি। পুরো ছবিটি এই রকম :

যুগ (Era)	কাল (Period)	পর্ব (Epoch)	আজ থেকে কত বছর আগে শুরু
		হোলোসিন	১০ হাজার
	কোটারনারি (Quaternary)	প্লাইস্টোসিন	৫০ লক্ষ
নবজীবীয় (স্তন্যপায়ী)	টারশিয়ারি (Tertiary)	প্লাইওসিন	১½ কোটি
		মাইওসিন	৩ কোটি
		ওলিগোসিন	৪ ”
		ইওসিন	৬ ”
		প্যালিওসিন	৭ ”

যুগ (Era)	কাল (Period)	পর্ব (Epoch)	আজ থেকে কত বছর আগে শুরু
	ক্রিটাশুস (Cretaceous)		১১ কোটি
মধ্যজীবীয় (সরীসৃপ)	জুরাসিক (Jurassic)		১৪ ”
	ট্রিয়াসিক (Triassic)		১৯ ”
	পার্মিয়ান (Permian)		২২ কোটি
	কার্বনিফেরাস (Carboniferous)		২৮ ”
	ডেভোনিয়ান (Devonian)		৩২ ”
পুরাজীবীয় (আদিম প্রাণী)	সিলিউরিয়ান (Silurian)		৩৪ ”
	অর্ডোভিসিয়ান (Ordovician)		৩৯ ”
	ক্যাম্‌ব্রিয়ান (Cambrian)		৫০ ”

এই হচ্ছে গত পঞ্চাশ কোটি বছরের মোটামুটি একটা নামকরণ। তারও আগের সময়কে সাধারণভাবে প্রাক্‌-ক্যামব্রিয়ান নামে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

শিলাস্তর ও ফসিল

ওপরে যে ছকটি দেওয়া হয়েছে তার প্রথম স্তম্ভে পাওয়া যাচ্ছে. কোন্ সময়ে কী ধরনের জীব এই পৃথিবীতে বাস করেছে। অর্থাৎ,

জীবজগতের কতকগুলো বিশেষ বিশেষ লক্ষণ মিলিয়ে এই যুগ-বিভাগ। আর এই লক্ষণগুলোর হদিশ পাওয়া গেছে ফসিল থেকে। কিন্তু দ্বিতীয় স্তম্ভে যে কাল-বিভাগ পাওয়া যাচ্ছে তার সঙ্গে কিন্তু জীবজগতের কোনো সম্পর্ক নেই। এই কাল-বিভাগ নিতান্তই কতকগুলো শিলাস্তরের বিন্যাসের হিসেব থেকে। ভূ-বিজ্ঞানীরা শিলাস্তরের বিন্যাস বিচার করে স্থির করেন একটি স্তর অপর একটি স্তরের চেয়ে বয়সের দিক থেকে কতখানি পুরনো। তারপরে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে স্থির করেন বিশেষ শিলাস্তরের বয়স কত।*

ভূপৃষ্ঠে যেদিন থেকে সমুদ্র তৈরি হয়েছে সেদিন থেকেই নদীর জলের সঙ্গে ও অন্যান্য নানাভাবে ধুলোমাটি এসে পড়েছে সমুদ্রে। এই ধুলোমাটি ক্রমে থিতিয়ে পড়ে, ক্রমে হয়ে ওঠে পাললিক শিলা। এমনিভাবে সমুদ্রের তলদেশে স্তরের পর স্তর পাললিক শিলা (alluvial rock) তৈরি হয়ে চলে। স্তরবিভক্ত এই পাললিক শিলাকে স্তরীভূত শিলাও (stratified rock) বলা হয়। এক-একটি বিশেষ কালে স্তরীভূত শিলার এক-একটি বিশেষ স্তর। কোন্ স্তর কতখানি পুরু তা থেকে কোন্ স্তরের স্থায়িত্ব কতখানি—সে-সম্পর্কেও খানিকটা অনুমান করা চলে। বিভিন্ন শিলাস্তরের প্রাচীনত্ব ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের অনুমান ওপরের ছকের শেষ স্তম্ভে দেওয়া হয়েছে।

জীববিজ্ঞানীরাও ভূ-বিজ্ঞানীদের মতো দু-দিক থেকে সময়ের হিসেব করে থাকেন। একটি হচ্ছে তুলনামূলক, অপরটি সঠিক। তুলনামূলক হিসেবে বলা হয়ে থাকে, জীবজগতের কোন্ ঘটনাটি কোন্ ঘটনার চেয়ে আগে বা পরে ঘটেছে। সঠিক হিসেব হচ্ছে বছরের মাপে সঠিক প্রাচীনত্বের হিসেব।

ফসিল নানাভাবে পাওয়া যেতে পারে, তবে অধিকাংশ ফসিলই

* 'পৃথিবীর ঠিকানা'য় এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

পাওয়া যায় স্তরীভূত শিলায়। আর এই স্তরীভূত শিলায় যে-স্তর যতো প্রাচীন সেই স্তর থাকে ততো নিচে। কাজেই, কোন্ কোন্ বিশেষ শিলাস্তর থেকে কোন্ কোন্ বিশেষ ফসিল পাওয়া গিয়েছে তা থেকে সহজেই বিভিন্ন ফসিলের প্রাচীনত্বের একটি তুলনামূলক হিসেব পাওয়া সম্ভব।

অন্য হিসেবটি কিন্তু এত সহজ নয়। মানুষের লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় মাত্র গত পাঁচ হাজার বছরের। কিন্তু এই পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব হয়েছে অন্তত দু-শো কোটি বছর আগে। কাজেই, বছরের মাপে কোনো একটি ফসিলের সঠিক বয়স হিসেব করতে হলে নানা পরোক্ষ উপায়ের সাহায্য নিতে হয়। একটি উপায় হচ্ছে পদার্থের তেজস্ক্রিয়তাজনিত বিভাজনের পরিমাপ নেওয়া। সম্প্রতি উদ্ভাবিত এই পদ্ধতিটি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, বয়সের হিসেব সবচেয়ে নির্ভুলভাবে পাওয়া যেতে পারে এই পদ্ধতির সাহায্যে।

তবুও এখনো পর্যন্ত অনেকখানিই অনুমান। পুরোপুরি নির্ভুলভাবে সমস্ত ফসিলের বয়স হিসেব করা গিয়েছে এমন কথা কোনো জীববিজ্ঞানীই জোর করে বলবেন না। আবার একথাও ঠিক যে ফসিলের বয়স সম্পর্কে ভুল ধারণা করবার সম্ভাবনা এখন অনেক কম। কিছুকাল আগে জীববিজ্ঞানীরা অনেক সময়ে বাজে জিনিসকেও ফসিল বলে ভুল করেছেন। মারাত্মক ধরনের ভুলও হয়েছে।*

* ইংলণ্ডের সাসেক্স-এ পিল্‌ট্‌ডাউন নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রাম থেকে ১৯০৮ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে কয়েক টুকরো মাথার খুলির হাড় পাওয়া গিয়েছিল। সেই থেকে পিল্‌ট্‌ডাউন মানুষ। বলা হয়েছিল যে মানুষটির বয়স একলক্ষ বছর—মানুষের সত্যিকারের পূর্বপুরুষ। চল্লিশ বছর ধরে বিজ্ঞানীদের এই ধারণা বজায় ছিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৩ সালে প্রমাণ করা হয়েছে যে পিল্‌ট্‌ডাউন মানুষ মস্ত একটা জালিয়াতি। মাথার খুলির হাড়গুলো ছিল নকল।

তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে ফসিল নিয়ে গবেষণা খুব বেশিদিন হল শুরু হয়নি। মাত্র দেড়শো বছর আগে থেকে। তার আগেও মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে অজস্র ফসিল পাওয়া যেত নিশ্চয়ই কিন্তু তা নিয়ে কোনো বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ হয়নি। বরং কোনো কোনো ফসিল সম্পর্কে নানা আজগুবি গল্প প্রচার করা হয়েছে। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিবর্তনবাদকে স্বীকার করে নেবার পরেই বিজ্ঞানীরা ধারণা করতে পেরেছিলেন যে ফসিল হচ্ছে অতীতের জীবন্ত প্রাণীর নিদর্শন। মানুষের পূর্বপুরুষের সন্ধান পেতে হলে বা প্রাণের উৎসে অভিযান করতে হলে এই ফসিলের চিহ্ন ধরেই এগোতে হবে।

তা সত্ত্বেও, গত একশো বছরের চেষ্টার পরেও, ফসিলের এই চিহ্নগুলো এখনো পর্যন্ত পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। অনেক ফাঁক থেকে গিয়েছে, অনেক জটিলতা। এই ফাঁক ও জটিলতা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কারণ ভবিষ্যতেও যে এই ফাঁক ও জটিলতা পূরণ হবে এমন সম্ভাবনা কম। গত দু-শো কোটি বছরের প্রাণী-জীবনের সমস্ত সাক্ষ্য ফসিল হয়ে টিকে থাকবে—তা একেবারেই দুরাশা। আদিম প্রাণীদের মেরুদণ্ডহীন শরীর অনায়াসেই নিশ্চিহ্ন হয়ে পঞ্চভূতে মিলিয়ে গিয়েছিল। একমাত্র মেরুদণ্ডী জীবরাই ফসিল হতে পারত। তাও সব অবস্থায় নয়—বিশেষ কতকগুলো শর্ত পূরণ হবার পরে। কাজেই কোটি কোটি জীবের মধ্যে ফসিল হয়েছিল একটি বা দুটি। কিন্তু পৃথিবীর উপরিতল এত ভঙ্গুর, সেখানে এত বেশি নড়াচড়া ও ওলোটপালোট যে এই একটি-দুটি চিহ্নও অনেক ক্ষেত্রেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিজ্ঞানীরা এখন যদি গোটা ভূপৃষ্ঠকে তোলপাড়ও করেন তাহলেও সমস্ত ফাঁক ও জটিলতা পূরণ করা সম্ভব হবে না।

তাছাড়া ফসিলের সন্ধান পাওয়াটাও বড়ো সহজ ব্যাপার নয়। যেখানে সেখানে মাটি কোপালেই যদি ফসিল পাওয়া যেত তাহলে পৃথিবীর সমস্ত যাদুঘরেও ফসিল রাখবার ঠাঁই হত না।

আমরা যখন যাত্নঘরে গিয়ে কাঁচের আধারে সযত্নে রক্ষিত কোনো একটি প্রাগৈতিহাসিক জীবের কঙ্কাল দেখি, তখন আমাদের পক্ষে ধারণা করাও সম্ভব হয় না যে কী বিপুল পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে এই কঙ্কালটির আবিষ্কার।

ফসিলের সন্ধান সাধারণত পাওয়া যায় পাথুরে পার্বত্য অঞ্চলে, যেখানে গাছপালা না থাকাটাই স্বাভাবিক। এমনি রুক্ষ পাথুরে অঞ্চলেই ফসিল-সন্ধানীকে দিনের পর দিন মাসের পর মাস ঘুরে বেড়াতে হয় আর খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হয় প্রত্যেকটি পাথরকে। তারপরে নানা লক্ষণ মিলিয়ে তাঁর যখন ধারণা হয় যে কোনো একটি জায়গায় মাটি খুঁড়লে ফসিলের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে তখনই শুরু হয় সত্যিকারের খননকার্য। ধারণা অবশ্যই ভুল হতে পারে, হয়েও থাকে, তখন আবার নতুন করে শুরু।

ফসিলের সন্ধানে মাটি-খোঁড়ার ব্যাপারটাও খুবই জটিল। যেমন-তেমন ভাবে কোদাল বা শাবল চালালে সমস্ত প্রচেষ্টাই মাটি হবার সম্ভাবনা। খুব সাবধানে, একটু একটু করে পরতের পর পরত সরিয়ে, ফসিলের গায়ে কোনোক্রমেও যেন কিছুমাত্র চোট না লাগে সেদিকে নজর রেখে ফসিলের টুকরোগুলোকে উদ্ধার করতে হবে। এখানেই শেষ নয়। তারপরে আছে ফসিলের টুকরোগুলোকে ঠিকভাবে প্যাক্ করে গবেষণাগারে হাজির করা, টুকরোগুলোর গা থেকে মাটি ও পাথর পরিষ্কার করা, টুকরোগুলোকে জোড়া লাগিয়ে লাগিয়ে গোটা কঙ্কালটিকে খাড়া করা। প্রতিটি পর্ব সমান দুরূহ ও সমান জটিল। এমনি ভাবে একটি ডায়নোসরের ফসিলকে পুরোপুরি খাড়া করতে কয়েক বছর সময় লেগে যেতে পারে।

তবুও, এতখানি মেহনত করার পরেও, পুরো কঙ্কালটি অনেক সময়েই পাওয়া যায় না। তখন একটুকরো হাড় পর্যবেক্ষণ করেই পুরো কঙ্কালটিকে অনুমান করে নিতে হয়। তারপরে পুরো কঙ্কাল থেকে পুরো অবয়বকে।

এই বইয়ে ডাইনোসরের ছবি দেওয়া হয়েছে। আলোকচিত্র নয়,

আঁকা ছবি। এই ছবিতে ডাইনোসরকে যেমন দেখাচ্ছে, বাস্তবেও জীবটি হুবহু তেমনি ছিল কিনা তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। অনেকখানিই শিল্পীর কল্পনা। নিশ্চয়তার সঙ্গে শুধু একথাই বলা চলে যে হুবহু না হোক, মোটামুটি এই ছিল ডায়নোসরের চেহারা।

গত একশো বছরের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে অতীতের পৃথিবীর জীবজগতের মোটামুটি একটি কাঠামো খাড়া করা হয়েছে। এই কাঠামোটির ওপরে সামান্য একটু কল্পনার মাটি ও রঙ চাপালেই আশ্চর্য একটি রূপ ফুটে উঠতে পারে। প্রাণের উৎসে আমাদের এই অভিযানে আমরাও যতোটুকু পারি এই আশ্চর্য রূপকে দু-চোখ ভরে দেখে নেবার চেষ্টা করব।

সরীসৃপ-জগৎ

আজ থেকে চোদ্দ কোটি বছর পিছিয়ে গিয়ে জুরাসিক কালের একটি ছবির দিকে তাকানো যাক।

আমেরিকার যে-অঞ্চলে এখন রকি পর্বতমালা, যেখানে এখন কোলোরাডো নদীর উৎস, সেখানকার জলহাওয়া চোদ্দ কোটি বছর আগে ছিল ট্রপিক দেশের মতো। পর্বতমালার চিহ্নমাত্র ছিল না। বড়ো জোর দু-একটি টিলা আর সুবিস্তৃত জলাভূমি। মস্ত মস্ত গাছের ডালপালায় আকাশ ঢেকে গিয়েছিল প্রায়। গাছগুলো কোনোটা উঠেছিল জলাভূমি থেকে, কোনোটা শুকনো ডাঙা থেকে। গুমোট ভ্যাপ্‌সা গরম। সূর্যের তাপে জলাভূমি থেকে যে জলীয় বাষ্প উঠে আসছে তা বাইরে বেরোবার পথ পাচ্ছে না।

এই ঘন ট্রপিকাল অরণ্যের মধ্যেই কোথাও কোথাও দেখা যাবে, জলের ধারা তিরতির করে বয়ে চলেছে আর শেষ পর্যন্ত এসে মিশেছে জলাভূমিতে। একটু দূরেই সমুদ্র। ট্রপিকাল সূর্যের তাপে ঈষদুষ্ণ সমুদ্রের জল অনবরত বাষ্প হয়ে হয়ে আকাশে উঠছে।

এমনি পরিবেশের মধ্যেই আচমকা জেগে উঠবে আলোড়ন।

জলাভূমির জল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে একটা চ্যাপ্‌টা ধরনের মাথা, যার চোখছুটো ক্ষুদে ক্ষুদে আর চামড়া থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা, ঘাড়টা সাত-আট গজ লম্বা। একটু পরেই জলের ওপরে জেগে উঠবে আঁশওলা মস্ত একটা পিঠ। সব মিলিয়ে যে জন্তুটির আভাস পাওয়া যাবে তা প্রায় জলাভূমির দৈত্যের মতো।

চোদ্দ কোটি বছর আগেকার এই জন্তুটিরই নাম দেওয়া হয়েছে ব্রণ্টোসরাস (Brontosaurus)। একটু পরেই দেখা যাবে, সেই জলাভূমিতে ব্রণ্টোসরাসের সংখ্যা একটি বা দুটি নয়—অনেকগুলো। ক্রমে ক্রমে জলাভূমির অনেকটা অংশ জুড়ে দূরে-কাছে অনেকগুলো ব্রণ্টোসরাসের শরীরের আভাস জেগে উঠবে। ব্রণ্টোসরাসকে যদি একালের কোনো জীবের সঙ্গে তুলনা করতে হয় তাহলে হিপো-পটেমাসের কথা মনে পড়তে পারে। কিন্তু একালের হিপো-পটেমাসের ওজন বড়ো জোর দু-টন। সে-জায়গায় ব্রণ্টোসরাস ওজনে ৪০ টন, লম্বায় ২৫ গজ। একটির সঙ্গে অপরটির কোনো তুলনাই চলতে পারে না।

হঠাৎ দেখা যাবে, প্রথম ব্রণ্টোসরাসটি যেন খানিকটা সচকিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। তার কারণও একটু পরেই বোঝা যাবে। ফার্নের জঙ্গল তোলপাড় করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে অতিকায় মুরগির মতো চেহারার একটি জীব যার নাম আল্লোসরাস (Allosaurus)। এক্ষেত্রে মুরগির সঙ্গে তুলনাটা নিতান্তই হাস্যকর। শুধু চেহারার আদলটুকু ছাড়া আর কোনো দিকেই মুরগির সঙ্গে আল্লোসরাসের মিল নেই। আল্লোসরাসের সারা গা বড়ো বড়ো আঁশে ঢাকা, মুখের মস্ত হাঁ চোখের সীমানা ছাড়িয়েছে, সারি সারি ধারালো দাঁত। আর এই জীবটি যখন পেছনের দু-পায়ে ভর রেখে উঠে দাঁড়ায় তখন মাটি থেকে তার মাথার উচ্চতা হয় দশ-বারো ফুট। মস্ত শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আর মস্ত লেজটা নাড়াচাড়া করে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখে। এই চতুষ্পদ জীবের পেছনের পা-দুটো লম্বা ও নখরযুক্ত। এই দুটি পায়ের

জোরও যে খুব বেশি তা দেখেই বোঝা যায়। সে-তুলনায় সামনের পা-দুটি অবিশ্বাস্য রকমের ছোট আর শরীরের সঙ্গে প্রায় যেন সেঁটে থাকা।

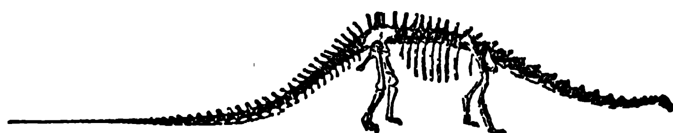
আল্লোসরাস প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁপিয়ে পড়ল ব্রণ্টোসরাসের ওপরে। দেখা গেল আল্লোসরাসের সঙ্গে পাল্লা দেবার ক্ষমতা ব্রণ্টোসরাসের নেই, যতোই অতিকায় হোক তার শরীর, যতোই ক্ষমতা থাক সেই শরীরের পেশীতে। তার কারণও আছে। ব্রণ্টোসরাস আত্মরক্ষার জন্যে বড়ো জোর জলের নিচে ডুব দিতে পারে। কিন্তু তার গলা ও লেজ এমন অস্বাভাবিক রকমের লম্বা যে ও-দুটিকে নিয়ে সব সময়েই অসুবিধেয় পড়তে হয়। তার ওপরে চল্লিশ টন ওজনের শরীরটিও নাড়াচাড়া করা বড়ো সহজ ব্যাপার নয়। তাছাড়া, এই জীবটির শরীর যতোই বড়ো হোক, মগজ খুবই ছোট ; ফলে অনুভূতি তেমন তীব্র নয়। তার ওপরে এই গুমোট ভ্যাপ্‌সা গরম। সব মিলিয়ে জীবটিকে কিছুটা জরদ্গবের মতো করে তোলে। ফলে আল্লোসরাসের আক্রমণ অনায়াসেই ব্রণ্টোসরাসের পক্ষে প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে।

চোদ্দ কোটি বছর আগে সেই জুরাসিক সময়কালে এমনি হানাহানির দৃশ্য আরো নানা জায়গায় দেখা যেতে পারত। সে ছিল এক আশ্চর্য পৃথিবী। মস্ত মস্ত গাছ, মস্ত মস্ত সরীসৃপ, নিছক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে প্রাণান্তকর সংগ্রাম—এমনটি ঠিক এমনিভাবে পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনো দেখা যায়নি। প্রাণের এমন অফুরন্ত সঞ্চয় ও অপচয়েরও কোনো তুলনা নেই। মধ্যজীবীয় যুগের সরীসৃপ-জগতটি জীববিজ্ঞানীদের কাছে রীতিমতো একটি বিস্ময় হয়ে রয়েছে। আজ যদি কোনো উপায়ে মানুষের পক্ষে সময়ের দিক থেকে পিছিয়ে যাবার কোনো উপায় থাকত তাহলে জীববিজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই সবার আগে গিয়ে হাজির হতেন এই সরীসৃপ-জগতে। কারণ, জীব-বিজ্ঞানীদের ধারণা, সামান্য কয়েকটি নিদর্শন দেখে এই জগতটিকে তাঁরা যতোটুকু কল্পনা করতে পেরেছেন, বাস্তব জগতটি ছিল তার

চেয়েও অনেক বেশি ভয়ংকর ও সুন্দর। জীবজগতের গত দু-শো কোটি বছরের ইতিহাসে এটি এমন একটি ঘটনা যে-সম্পর্কে ধারণা করতে হলে ঘটনাটিকে চোখের সামনে ঘটতে দেখা চাই। অনুমান ও কল্পনা অনেক সময়েই হার মানে। তবুও যতোটুকু অনুমান ও কল্পনা করা গিয়েছে তাই নিয়েই শিল্পীরা আশ্চর্য সব ছবি এঁকেছেন, সাহিত্যিকরা আশ্চর্য সব বই লিখেছেন। বিশেষ করে একটি বইয়ের নাম উল্লেখ করতে চাই। কোনান ডয়েলের 'দি লস্ট ওয়ার্ল্ড'— কুলদারঞ্জন রায়ের বাংলা অনুবাদে 'অজ্ঞাত জগৎ'। এমন কি এখনো, এই মহাকাশ-অভিযানের যুগেও চোদ্দ কোটি বছর আগেকার সরীসৃপ-জগৎ নিয়ে বৈজ্ঞানিক গল্প লেখা বন্ধ হয়নি।

ব্রন্টোসরাস ও অন্যান্য

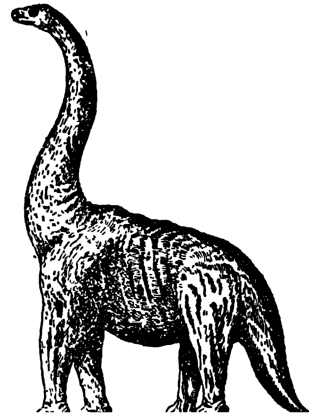
ব্রন্টোসরাসের চেহারাটি চোখের সামনে রাখা দরকার। মস্ত একটা শরীর কিন্তু পা-চারটি ছোট ছোট। পেছনের দুটি পায়ের তুলনায় সামনের দুটি পা আরো ছোট। মস্ত লেজ, মস্ত গলা, কিন্তু ছোট্ট একটুখানি মাথা। চেহারাটি অবশ্য মনোরম নয়। কিন্তু শুনলে অবাক হতে হবে যে এই দৈত্যসদৃশ জলচর জীবটি তৃণভোজী। এ-জাতীয় জীব সেই চোদ্দ কোটি বছর আগেকার পৃথিবীতে এই একটিই নয়। দোসর অবশ্যই আছে। কয়েকটির নাম করা যাক। ডিপ্লোডোকাস (Diplodocus)। এই সরীসৃপটির একটি কঙ্কাল



ডিপ্লোডোকাসের কঙ্কাল—৮৭½ ফুট লম্বা

পাওয়া গিয়েছে হল্যাণ্ড থেকে যা ৮৭½ ফুট লম্বা। এটি একটি রেকর্ড। তবে ডিপ্লোডোকাস মাত্রেই ৮৭½ ফুটের কাছাকাছি লম্বা হবে, এমন ভাববার কোনো কারণ নেই। গড় লম্বা ধরে নেওয়া

যেতে পারে ৬০ ফুট। তাও নিতান্ত কম নয়। কিন্তু এতখানি লম্বা হওয়া সত্ত্বেও জীবটি কিন্তু ওজনের দিক থেকে তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। অন্যান্য সরীসৃপের তুলনায় হাল্‌কাই বলতে হবে—বড়ো জোর ২৫ থেকে ৩৫ টন। চেহারা মোটামুটি ব্রণ্টোসরাসের মতোই। মুণ্ডুটা ধড়ের তুলনায় অস্বাভাবিক রকমের ছোট। ব্রণ্টোসরাসেরও তাই। তবে ডিপ্লোডোকাসের মুণ্ডুতে একটু বিশেষত্ব আছে। চোখদুটি দুই ধারে বটে কিন্তু অনেকখানি ওপরের দিকে ওঠানো। আর নাকের ফুটো মাথার খুলির ওপরের দিকে ঠিক মাঝখানটিতে। অনেকটা তিমিমাছের 'ব্লো-হোল'-এর মতো। এ থেকে ধারণা করা হয়েছে যে খুব সম্ভবত ডিপ্লোডোকাস উভচর জীব, তবে অধিকাংশ সময়ই কাটাত জলের মধ্যে। মাথার ওপরের দিকটা জল থেকে তুলে এই জীবটি দেখত ও নিশ্বাস নিত। চোয়াল দুটো ছিল ছোট ও দুর্বল। দাঁত পল্‌কা ও সংখ্যায় খুবই কম। এমন মস্ত একটি জীবের শরীরে খাদ্যগ্রহণের আয়োজনে এতখানি অভাব থাকতে পারে তা ভাবা যায় না। তবে তৃণভোজী এই জীবটি জলজ উদ্ভিদ খেয়ে প্রাণধারণ করত। আর জলজ উদ্ভিদ গলাধঃকরণ করবার জন্যে চোয়ালের ও দাঁতের খুব বেশি কসরৎ দেখাবার প্রয়োজন ছিল না।



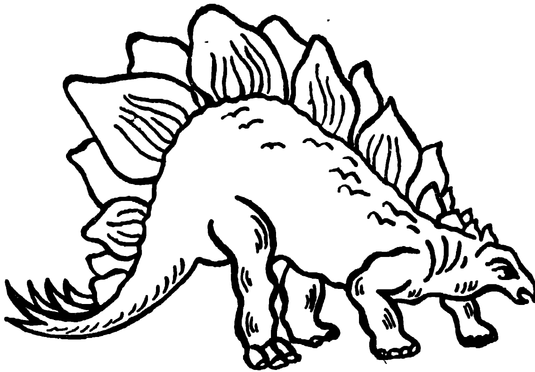
ব্রাকিওসরাস—ওজন প্রায় ৫০ টন, গলা খুবই লম্বা, লেজ খুবই ছোট

এমনি আরেকটি সরীসৃপের নাম কামারাসরাস (Camarasaurus), আরেকটির নাম সিটিওসরাস (Cetiosaurus)। আরেকটির নাম আট্‌লাণ্টোসরাস (Atlantosaurus)। শেষোক্তটি লম্বায় (১২০ ফুট) সম্ভবত সকল সরীসৃপকেই টেক্কা দেয়। এই সবকটি -সরাসের মধ্যেই মোটামুটি চেহারার একটা

সাদৃশ্য আছে। তবে ব্রাকিওসরাস (Brachiosaurus) নামে অপর একটি সরীসৃপের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে যার সামনের পা-দুটি পেছনের পায়ের চেয়ে লম্বা। ফলে সরীসৃপটির পিঠ একালের জিরাফের মতো ঢালু।

যতগুলো সরীসৃপের নাম করা হল সকলেই জলচর ও তৃণজীবী। স্থলচর ও মাংসাশী একটি মাত্র সরীসৃপেরই নাম করা হয়েছে: আল্লোসরাস। স্থলচর ও মাংসাশী সরীসৃপের দৃষ্টান্ত অবশ্যই আরো আছে। যেমন, মেগালোসরাস (Megalosaurus) ও ওর্নিথো-লেস্‌টিস্‌ (Ornitholestes)। শেষোক্ত জীবটির আকার বেশ ছোট (পাঁচ থেকে ছ-ফুট)।

মাংসাশী সরীসৃপরা স্বভাবতই খুব হিংস্র হত। তবে একথা মনে করবার কোনো কারণ নেই যে মাংসাশী সরীসৃপদের কাছে তৃণভোজী সরীসৃপরা হত অসহায় শিকার। স্টেগোসরাস (Stegosaurus) নামে একটি স্থলচর তৃণভোজী সরীসৃপের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে যার শরীরের অস্ত্রসজ্জা ছিল খুবই জমকালো ধরনের। জীবটি অবশ্যই চতুষ্পদ, লম্বায় প্রায় চব্বিশ ফুট, সামনের পা পেছনের পায়ের চেয়ে অর্ধেক লম্বা।

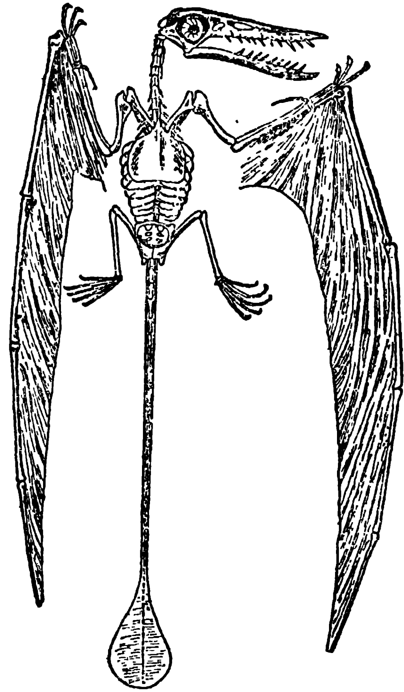

স্টেগোসরাস

চলাফেরার সময়ে জীবটির পিঠ ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে যেত। লেজটি ছিল লম্বা আর চ্যাপ্‌টা। এই স্টেগোসরাসের শিরদাঁড়া বরাবর ছিল অদ্ভুত এক বর্মসাজ: দু-সারি ত্রিভুজ আকারের শক্ত হাড়। স্টেগোসরাসের আত্মরক্ষার উপায় একালের শজারুর মতো। আক্রান্ত হলে স্টেগোসরাস নিজের শরীরটাকে

বলের মতো গুট্‌লি পাকিয়ে পিঠের বর্মসাজ উঁচিয়ে নিঃসাড়ে পড়ে থাকত। আক্রমণকারী যতো জবরদস্তই হোক না কেন, এই বর্মসাজ দুর্ভেদ্য হয়ে উঠত তার কাছে। আবার প্রয়োজন হলে স্টেগোসরাস তার চারটি কাঁটাওয়ালা লেজ দিয়ে এমন প্রচণ্ড বাড়ি মারতে পারত যা সহ্য করা কোনো মাংসাশীর পক্ষেই সম্ভব হত না। কাজেই, হাতির চেয়েও বড়ো এই জীবটিকে কাবু করা বড়ো সহজ ব্যাপার ছিল না।

সামুদ্রিক জীব

জলাভূমি আর ডাঙ্গা থেকে সরে এসে এবারে সমুদ্রের দিকে তাকানো যেতে পারে। দেখা যাবে, সমুদ্রের এলাকাতেও অদ্ভুত সব জীবের আধিপত্য শুরু হয়েছে। দু-একটির নাম আমাদের জানতে হবে। একটি হচ্ছে র‍্যামফোরিং-কাস (Rhamphorhy-nchus)। নামটি যতো জবরদস্ত, জীবটি ততো নয়। পায়রায় চেয়েও ছোট একটি জীব, অনেকটা একালের বাদুড়ের মতো দেখতে। একটা পাহাড়ের চূড়োয় ডানা মেলে এই জীবটি বসে থাকত। ছবি দেখলে বোঝা যাবে, এই উড়ন্ত সরীসৃপের ডানাদুটি ঠিক পাখির ডানার মতো নয় (বিষয়টি নিয়ে আমরা পরে আলোচনা তুলব)। পেছনের পা-দুটি সরু ও পল্‌কা, সামনের পা-দুটি (যার



র‍্যাম্‌ফোরিংকাস

সঙ্গে ডানা রয়েছে) শক্ত ও মজবুত। ছবিতে আরো দেখা যাবে, র‍্যামফোরিংকাসের ডানা লাগানো রয়েছে সামনের পায়ের চতুর্থ আঙুলের সঙ্গে। সামনের পায়ের অন্য তিন আঙুল ও পেছনের পায়ের ব্যবহার সম্ভবত কোনো কিছু আঁকড়ে ধরার জন্যে। এই ডানাওলা জীবটির দাঁতগুলোও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার মতো।

তারপরে আছে সামুদ্রিক কুমির। একটি-দুটি কুমিরকে প্রায় সব সময়েই সমুদ্রের ধারে রোদ পোয়াতে দেখা যাবে। কোনোটার নাম দেওয়া হয়েছে জিওসরাস (Geosaurus), কোনোটার মেট্রিও-রিঙ্কাস (Metriorhyncus)। এদের শরীর লম্বা, মুখও লম্বা, পা প্যাডেলযুক্ত। এদের শরীরের আয়োজন জলের নিচে শিকার করার পক্ষে খুবই উপযোগী।

সমুদ্রের জলের দিকে তাকিয়ে থাকলে দেখা যাবে, মাঝে মাঝে হাঙ্গরের মতো একটি জলাশ্রয়ী জীব জল থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। এই জীবটির নাম ইক্‌থিওসরাস (Ichthyosarus)। মাছ নয়, জুরাসিক কালের একটি জলাশ্রয়ী সরীসৃপ। তবে সরীসৃপ হওয়া সত্ত্বেও এই জীবটির শরীরে রয়েছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বদলে মাছের মতোই সত্যিকারের পাখনা ও দুইভাগে ভাগ করা লেজ। ঠিক মাছের মতোই এই সরীসৃপটি জলের মধ্যে দ্রুত চলাফেরা করতে পারত। মুখটা ছিল লম্বাটে ও ধারালো দাঁতে ভর্তি।

অপর একটি জলাশ্রয়ী সরীসৃপের নাম প্লেসিওসরাস (Plesiosaurus)। এই জীবটিকে দেখলে মনে হবে যেন মস্ত একটা কচ্ছপের মুখ থেকে মস্ত একটা সাপ বেরিয়ে এসেছে। কচ্ছপ বলা হল বটে কিন্তু কোনো কোনো প্লেসিওসরাস লম্বায় চল্লিশ ফুট পর্যন্ত হতে পারত। অস্ট্রেলিয়ায় একটি প্লেসিওসরাসের মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছে যেটি লম্বায় প্রায় দশ ফুট। সরীসৃপ-জগতে এটি একটি রেকর্ড। এমন মস্ত মাথাওলা সরীসৃপের নিদর্শন দ্বিতীয় নেই। জুরাসিক কালের সমুদ্রে এই প্লেসিওসরাসের রীতিমতো

আধিপত্য ছিল এবং ক্রিটাশুস কালের শেষ পর্যন্ত এই আধিপত্য বজায় ছিল।

ক্রিটাশুস কালের সরীসৃপ

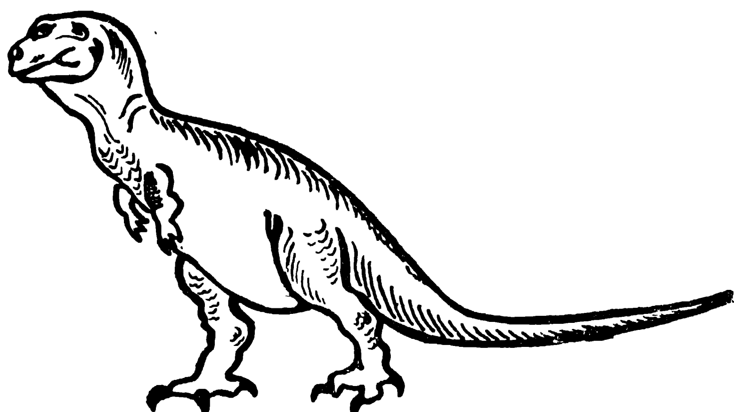
এতক্ষণ আমাদের সামনে ছিল জুরাসিক কালের দৃশ্যপট। এবারে আরো কয়েক কোটি বছর এগিয়ে এসে আমরা তাকাব ক্রিটাশুস কালের দিকে। দেখা যাবে, দৃশ্যপটের কিছুটা পরিবর্তন অবশ্যই হয়েছে।

পরিবর্তন হয়েছে আবহাওয়ারও। আরো মৃদু, আরো সহনীয়। তবে সর্বত্র এক ধরনের নয়। তিনটি সুস্পষ্ট মণ্ডলের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। বিষুব অঞ্চলের উষ্ণ মণ্ডল এবং উত্তরের ও দক্ষিণের নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল। অনেকটা আমাদের কালের মতোই।

জীবজগতের দিকে তাকালে দেখা যাবে, মোটামুটি একই ধরনের সরীসৃপদের আধিপত্য চলেছে। তবে, সরীসৃপ বটে, হুবহু সেই জুরাসিক কালের সরীসৃপ নয়। এদের নতুন নাম, নতুন চেহারা। জুরাসিক কালের সেই দৈত্যসদৃশ তৃণভোজী সরীসৃপ ডিপ্লোডোকাস ও ব্রণ্টোসরাসকে এখন আর চেষ্টা করলেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কয়েক কোটি বছরের মধ্যেই তারা একেবারে অদৃশ্য হয়েছে। এখন যারা আছে তাদের নতুন চেহারা, নতুন নাম।

প্রথমেই যার নাম করা দরকার সেটি টাইরানোসরাস (Tyrannosaurus)। মাংসাশী জীবদের মধ্যে চেহারার প্রকাণ্ডতায় এই জীবটিরই এখনো পর্যন্ত রেকর্ড। লম্বায় ৫০ ফুটেরও বেশি, উচ্চতায় ২০ ফুট, ওজন প্রায় ১০ টন। হিংস্রতায় ও ক্রূরতায় এই সরীসৃপটি ছিল মধ্যজীবীয় যুগের আতঙ্ক। সরীসৃপটির নামকরণও তার এই স্বভাব থেকে। অন্য কোনো জীবের সঙ্গে যদি চেহারার মিল খুঁজতে হয় তবে জুরাসিক কালের আল্লোসরাসের নাম করতে হবে। টাইরানোসরাস অনেকটা যেন বৃহৎ সংস্করণের আল্লোসরাস। এই সরীসৃপটিরও চারটি পা, কিন্তু যা-কিছু লম্ফঝম্ফ হম্বিতম্বি সবই

পেছনের দুটি পায়ের সাহায্যে। এই পা-দুটি খুবই শক্তিশালী। কিন্তু সে-তুলনায় সামনের পা-দুটিকে নিতান্ত ঠাট্টা বলে মনে হবে। এই পা-দুটি এত ছোট যে মুখ পর্যন্তও পৌছয় না। মাত্র দুটি করে আঙুল। হাঁটাচলার ব্যাপারে যে এই দুটি পা থেকে কোনো রকম



টাইরানোসরাস

সাহায্যই পাওয়া যায় না তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। বনবাঁদাড় ভেঙে জীবটি ছোটে মস্ত লেজের সাহায্যে শরীরের ভারসাম্য বজায় রেখে দু-পায়ে। সামনের দুটি পা অনেকাংশেই শরীরের শোভা। বোঝা বললেও খুব বেশি ভুল হয় না। মাথার খুলিটা মস্ত। বাঁকাছুরির মতো সারি সারি ধারালো দাঁত দেখে বোঝা যায়, এই দাঁতগুলো কি খাদ্যগ্রহণে কি প্রাণহননে কখনোই ব্যর্থ হবার নয়।

বলা বাহুল্য, ক্রিটাশুস সময়কালের সরীসৃপের নিদর্শন একমাত্র টাইরানোসরাস নয়। আরো অনেক। অনেকটা টাইরানোসরাসের মতোই দেখতে কিন্তু আকারে অনেকটা ছোট আরো দুটি জীবের নাম উল্লেখ করা চলে। গোর্গোসরাস (Gorgosaurus) ও সেরাটোসরাস (Ceratosaurus)। শেষোক্ত জীবটির ঠিক নাকের ওপরে একটি শিঙ আছে।

আগেই বলেছি, ডিপ্লোডোকাস বা ব্রণ্টোসরাসের মতো সরীসৃপরা একালে লোপ পেয়েছে। তাই বলে তৃণভোজী সরীসৃপের অভাব

ঘটেনি। ক্রিটাশুস কালে পাওয়া যাবে তৃণভোজী সরীসৃপের অন্যতর নিদর্শন। এরা আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট। কিন্তু এদের শরীরে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যও কিছু কম নয়। ইগুয়ানোডোন (Iguanodon) ও হাঁস-ঠোঁট ডাইনোসরদের দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যেতে পারে। এই জীবগুলোর চেহারা মোটামুটি একই ধরনের। স্বভাবেও মিল আছে। চারটি করে পা থাকা সত্ত্বেও দু-পায়ে চলাফেরা করাটাই বেশি পছন্দ। আধা-জলচর জীব। জলে বা জলের ধারেই বাস। তার কারণ বোধ হয় এই যে জলের ধারে বিনা আয়াসেই প্রচুর গাছগাছড়া পাওয়া সম্ভব। এই হাঁস-ঠোঁট ডাইনোসরদের ঠোঁট খুবই শক্ত আর নিচের দিকে বাঁকানো। এ-ধরনের ঠোঁটের সাহায্যে গাছের পাতা কামড়ে ছিঁড়ে নিতে খুবই সুবিধে। মুখের পেছনের দিকে আছে পেষণ দাঁত, যার সাহায্যে চর্বণের কাজটি সুসম্পন্ন হয়।

ক্রিটাশুস কালে দাঁড়িয়ে যদি জুরাসিক কালের স্টেগোসরাসকে অনুসন্ধান করতে হয় তাহলে তা হবে নিতান্তই পণ্ডশ্রম। কিন্তু স্টেগোসরাসের সাদৃশ্য অন্য একটি জীবের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে, যার নাম অ্যান্‌কাইলোসরাস (Ankylosaurus)। এই সরীসৃপটির শরীরের বর্মসাজ অনেকটা স্টেগোসরাসের মতোই।

শরীরের অস্ত্রসজ্জার দিকেই যদি তাকাতে হয় তাহলে অবশ্যই আরো কয়েকটি সরীসৃপ স্টেগোসরাসের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। যেমন, ট্রাইসেরাটপ্‌স্ (Triceratops)। ত্রিশ ফুট লম্বা এই সরীসৃপটির মাথাটা মস্ত, গোটা শরীরের প্রায় এক তৃতীয়াংশ। আর যা-কিছু অস্ত্রসজ্জা সবই এই মাথার অংশে। ছবিতে দেখা যাবে, মাথার যেখানে শেষ সেখানে মস্ত একটি হাড়ের টুকরো বর্মের মতো ঘাড়ের অংশকে ঢেকে রেখেছে। ঘাড় হচ্ছে জীবের শরীরের দুর্বলতম অংশ যা শত্রুর আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হয়ে ওঠে। এদিক থেকে হাড়ের বর্ম ট্রাইসেরাটপ্‌স্-এর আত্মরক্ষার আয়োজনকে অনেকখানি দুর্ভেদ্য করে তুলেছে। এই জীবটির ঠোঁট টিয়াপাখির মতো। নাকের ফুটোর

ঠিক ওপরেই রয়েছে ছোট্ট একটি শিঙ। আর ঠিক চোখের ওপরেই রয়েছে মস্ত লম্বা আরো দুটি শিঙ। সব মিলিয়ে অনেকটা একালের গণ্ডারের মতো।

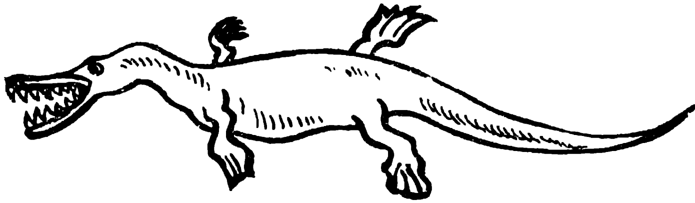


ট্রাইসেরাটপ্‌স্‌

এ-কালের উড়ন্ত সরীসৃপদের নাম দেওয়া হয়েছে টেরানোডোন (Pteranodon)। এরা সাধারণত মস্ত ডানা মেলে দিয়ে হাওয়ায় গা ভাসিয়ে বেড়াত। এই উড়ন্ত সরীসৃপদের যে-সব ফসিল-নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তা থেকে দেখা যায়, এমন বৃহৎ আকারের উড়ন্ত জীব জীবজগতের ইতিহাসে নেই। প্রায় সিন্ধবাদ নাবিকের গল্পের সেই রক্‌পাখির মতো। ডানা মেলে দিলে এক ডানার প্রান্ত থেকে অন্য ডানার প্রান্ত পর্যন্ত মাপ হত সাতাশ ফুট। তবে সরীসৃপ হওয়া সত্ত্বেও টেরানোডোনের ঠোঁট ছিল দাঁতহীন। তাই বলে টেরানোডোন পাখি নয়। পাখিরা তখনো ছিল এবং তারপরেও শেষ হয়নি। উড়ন্ত সরীসৃপদের ধারাটি কিন্তু টেরানোডোনেই এসে শেষ হয়েছে।

নদীর ধারে তাকিয়ে দেখলে একালের অন্য একটি জীবের পূর্ব-পুরুষকেও ক্রিটাশুস কালে দেখা যেতে পারত। সেটি হচ্ছে কুমির। চেহারায় এখনকার মতোই, কিন্তু কোনো কোনো কুমির লম্বায় হত পঞ্চাশ ফুট পর্যন্ত। মধ্যজীবীয় যুগের লক্ষণটাই এই যেন আচমকা জীবজগতে একটা বাড়াবাড়ির ব্যাপার ঘটে গিয়েছে। এই অবস্থায়

কুমির যদি পঞ্চাশ ফুট লম্বা না হত তাহলেই বরং অবাক হওয়া যেত। সে-সময়ে সমুদ্রের জলে একধরনের গিরগিটি জাতীয় জীবের আধিপত্য চলছিল যারা লম্বায় হত কুড়ি ফুট বা তারও বেশি। এদের নাম দেওয়া হয়েছে মেসোসরাস ও টাইলোসরাস। গিরগিটি



মেসোসরাস

বলতে আমাদের চোখের সামনে হাতখানেক লম্বা যে নিরীহ চেহারার জীবটির ছবি ফুটে ওঠে তার সঙ্গে মধ্যজীবীয় যুগের গিরগিটিদের কোনো তুলনাই চলে না।

সরীসৃপের সূত্র

১৭৮০ সালে হল্যাণ্ডের পীটার্সবার্গ নামে একটা জায়গায় গর্ত খোঁড়া হচ্ছিল। উদ্দেশ্য ছিল ফসিল আবিষ্কার নয়, নিতান্তই পাথর সংগ্রহ। অতি সাধারণ কয়েকজন শ্রমিক নিযুক্ত ছিলেন এই কাজে। কিন্তু আচমকা সকলকে হকচকিয়ে দিয়ে এই গর্ত থেকেই পাওয়া গেল স্পষ্ট একটি ফসিল। একজন ফরাসী ফসিল-সন্ধানী ইতিপূর্বে বার কয়েক ফসিলের সন্ধানে এই অঞ্চলে ঘুরে গিয়েছিলেন—তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হল। এই ফসিল-সন্ধানী ভদ্রলোকের নাম ডঃ হফ্‌ম্যান, ফরাসী সামরিক বিভাগের সার্জন। ফসিল-সন্ধান করাটা ছিল তাঁর শখ। এই শৌখিন ফসিল-সন্ধানীটির কৃতিত্বেই শেষ পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছিল ষোল ফুট লম্বা একটি মেসোসরাসের ফসিল। একশো বিরাশি বছর আগে আবিষ্কৃত এই ফসিলটিকেই প্রথম স্পষ্টভাবে বিশেষ একটি সরীসৃপের ফসিল বলে চিনতে পারা গিয়েছিল। মেসোসরাসের এই বিশেষ ফসিলটির সঙ্গে

একটি যুদ্ধের ইতিহাসও জড়িত আছে। হল্যাণ্ডের জমি থেকে পাওয়া বলে ফসিলটিকে হল্যাণ্ডেই রেখে আসতে হয়েছিল। চার বছর পরে ফরাসী বাহিনী হল্যাণ্ড আক্রমণ করে এই ফসিলটি উদ্ধার করে আনে। ফসিলটি এখনো পর্যন্ত ফ্রান্সেই আছে।

একেবারে গোড়ার দিকে যে-সমস্ত ফসিল থেকে মধ্যজীবীয় যুগের সরীসৃপের সূত্রগুলো প্রথম সংগ্রহ করা হয়েছিল তা আবিষ্কার করার ব্যাপারে একজন ইংরেজ মহিলার কিছুটা কৃতিত্ব আছে। তাঁর নাম ম্যারি অ্যানিং। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ইংলণ্ডের দক্ষিণ উপকূলে স্বাস্থ্যান্বেষীদের খুব ভিড় হত। সেই সুযোগে সেখানে দোকান খুলে বসেছিলেন রিচার্ড অ্যানিং নামে এক ভদ্রলোক। দোকানে বিক্রি হত ঝিনুক, শামুক, নানা অদ্ভুত জীবের হাড়গোড় ও খোলস। সমুদ্রতীরে কিছুদিন কাটিয়ে আসার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে লোকে এসব জিনিস কিনে নিয়ে যেত। সেই রিচার্ড অ্যানিং-এরই মেয়ে ছিল ম্যারি। ১৮১১ সালে ম্যারির বয়স যখন মাত্র বারো, তখন তিনি আবিষ্কার করেছিলেন ইক্‌থিওসরাসের কঙ্কাল। দশ বছর পরে প্লেসিওসরাসের। আরো সাত বছর পরে উড়ন্ত সরীসৃপের।

এ-প্রসঙ্গে আরো একজন ইংরেজ মহিলার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি জীবাশ্মবিদ ডঃ গিডিয়ন ম্যাণ্টেলের স্ত্রী। ১৮২২ সালে ইংলণ্ডের সাসেক্স অঞ্চলে তিনি একটি অদ্ভুত আকারের দাঁত আবিষ্কার করেছিলেন। দাঁতটি বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠানো হল এবং তাঁরা মতপ্রকাশ করলেন যে দাঁতটি হচ্ছে একটি গণ্ডারের। এই মত ডঃ গিডিয়নের মনঃপূত হল না। তিনি আবার একই জায়গার মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার করলেন কয়েকটি হাড়। এবারে বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করলেন যে হাড়গুলো হচ্ছে হিপোপটেমাসের। এই মত এবারেও ডঃ গিডিয়নের মনঃপূত হল না। তখন তিনি নিজেই বিষয়টি নিয়ে পড়াশুনো করলেন এবং শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করলেন যে এই দাঁত ও হাড় বিরাট আকারের একটি সরীসৃপের। সরীসৃপটির নাম তিনি দিলেন ইগুয়ানোডন, কারণ ইগুয়ানা বা গোসাপের সঙ্গে

সরীসৃপটি চেহারার মিল ছিল। প্রথমে অনুমান করা হয়েছিল, সরীসৃপটি পুরোপুরি চতুষ্পদী। কিন্তু তারপরে উনিশ শতকের শেষদিকে বেলজিয়ামের একটি কয়লার খনিতে আবিষ্কৃত হয় একটি নয়, ছুটি নয়, সতেরোটি ইগুয়ানোডনের কঙ্কাল। তখন বোঝা যায় যে সরীসৃপটি চলাফেরা করে ছু-পায়েই। কালক্রমে ডাইনোসরের দৃষ্টান্ত হিসেবে এই সতেরোটি কঙ্কালই সবচেয়ে বেশি পরিচিতি লাভ করে। এই সতেরোটি কঙ্কালকে পেছনের ছু-পায়ে খাড়া করে ব্রাসেল্‌স্-এর যাছুঘরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এই দৃশ্য যে-কোনো দর্শককে হকচকিয়ে দিতে পারে।

আমেরিকাতেও উনিশ শতকে ছুজন জীবাশ্মবিদ পরস্পরের সঙ্গে রেষারেষি করে অনেকগুলো ডাইনোসরের ফসিল আবিষ্কার করেছিলেন। সম্প্রতি রাশিয়া, মঙ্গোলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকেও ডাইনোসরের ফসিল পাওয়া গিয়েছে। আমাদের দেশ ভারতেও সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউটের একদল জীবাশ্মবিদ ডাইনোসরের ফসিল আবিষ্কার করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

সরীসৃপের উদ্ভব

আলাদা আলাদা নাম ধরে ফিরিস্তি নিতে গেলে পুরো একটি বই লিখেও সরীসৃপের কথা শেষ করা যাবে না। বরং আমরা অন্য একদিক থেকে বিষয়টিকে বিচার করে দেখব। আমরা জানতে চেষ্টা করব, ক্রমবিবর্তনের ধারায় কোন্ পর্বে সরীসৃপের উদ্ভব আর এই পর্বটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য কতটুকু।

পুরাজীবীয় যুগ যখন শেষ হয়ে আসছে—আজ থেকে প্রায় পঁচিশ কোটি বছর আগে—সে-সময়ে জীবজগতে একটা নতুন লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল। তা হচ্ছে মেরুদণ্ডী জীবের জল ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠে আসা। এমন কি ডিম পাড়বার জন্যেও তাদের জলে ফিরে যেতে হত না। ঘটনাটি এখনকার চোখে তুচ্ছ মনে হতে পারে, কিন্তু সমুদ্রের জীবের মহাদেশ বিজয় এই তুচ্ছ ঘটনাটির জন্যেই সম্ভব

হয়েছিল। আর এই বিজয়ী দলের প্রথম সারিতে ছিল সরীসৃপরা। সরীসৃপের ডিম হত শক্ত খোলার মধ্যে। এই ডিম থেকে খোলা ভেঙে ছানা বেরিয়ে আসত। ছানা জন্মাবার এই নতুন পদ্ধতির জন্যেই সরীসৃপরা হতে পেরেছিল পুরোপুরি ডাঙ্গার জীব। এই কৃতিত্বের তুলনা নেই। পরবর্তী কালের পাখি ও স্তন্যপায়ী সমেত এই বিচিত্র জীবজগতটি তার অস্তিত্বের জন্যে এই কৃতিত্বের কাছে ঋণী।

কথা উঠতে পারে, উভচর জীবরাও তো ডাঙ্গায় উঠে আসতে পারত। ডাঙ্গায় চলাফেরা করাটাও তাদের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। আসলে উভচর জীব ও সরীসৃপদের মধ্যে তফাৎ ছিল অন্য একটা মৌলিক ব্যাপারে। তা হচ্ছে, যে-কথা আগেই বলেছি, ছানা জন্মাবার পদ্ধতিতে। বিষয়টিকে আরেকটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতে হবে।

জীবের একটি লক্ষণই হচ্ছে বংশরক্ষা। জীববিজ্ঞানীরা বিষয়টির ওপরে এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন যে জীবের জন্ম ও বংশগতি ইত্যাদি অধ্যয়ন করবার জন্যে পৃথক একটি শাখা সৃষ্টি হয়েছে, যার নাম প্রজননবিদ্যা (Genctics)। কোন্ জীব কি-ভাবে বংশরক্ষা করছে এবং কত সংখ্যায়, তা দেখেই বোঝা যেতে পারে জীবটির অস্তিত্ব লোপ পাবার দিকে না সমৃদ্ধির দিকে। মধ্যজীবীয় যুগে সরীসৃপদের আধিপত্য কেন বজায় ছিল তাও এই বংশরক্ষার দিকটিকে বিচার করেই বুঝতে হবে।

উভচর জীবদের বংশরক্ষার ব্যাপারে খানিকটা জটিলতা আছে। ডিম পাড়বার জন্যে তাদের জলে ফিরে যেতেই হয়। এখনো, আগেও। এই জটিলতার জন্যেই উভচর জীবদের সব সময়ে থাকতে হয় জলের আশেপাশে। নদী, হ্রদ, পুকুর, ডোবা ইত্যাদি না থাকলে উভচর জীবদের অস্তিত্বই লোপ পাবার সম্ভাবনা।

কিন্তু মধ্যজীবীয় যুগের সরীসৃপদের দিকে তাকালে দেখা যাবে, তারা উভচর জীবের বংশরক্ষার এই জটিলতাকে কাটিয়ে উঠেছে। যে-ডিম

থেকে তাদের ছানা, তার ওপরে থাকে একটি শক্ত খোলার আবরণ। এই খোলাসমেত ডিমটি জলের ধারে নিয়ে যাবার কোনো প্রয়োজনই নেই, যেখানে খুশি রাখা যেতে পারত। অর্থাৎ, সরীসৃপদের পক্ষে শুকনো ডাঙ্গাতেও যেখানে খুশি ডিম পাড়তে ও বংশরক্ষা করতে কোনো বাধা থাকল না। এই ঘটনাটি জীবজগতের ইতিহাসে একটি বিপ্লব বিশেষ। সরীসৃপদের আগে কোনো জীব এই কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। সরীসৃপদের আগে কোটি কোটি বছর ধরে জীবরা বাস করেছিল জলের মধ্যে বা বড়ো জোর জলের আশেপাশে। এই প্রথম একদল জীব জলের কোনো তোয়াক্কা না রেখে ছড়িয়ে পড়েছিল শুকনো মহাদেশের দূর দূর অঞ্চলে। এমন কি মরুভূমির উত্তাপ ও জলহীনতাকেও তাদের ভয় করবার কোনো কারণ ছিল না। যেখানে খুশি তারা ডিম পাড়তে পারত, যেখানে খুশি বংশরক্ষা করতে পারত। পৃথিবীর মহাদেশকে প্রথম জয় করেছিল সরীসৃপরাই।

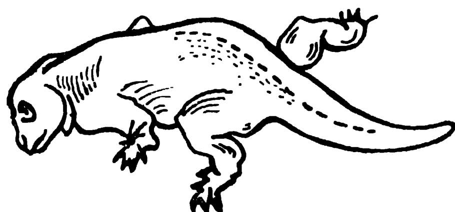
সরীসৃপদের এই বিজয়-অভিযান শুরু হয়েছিল পুরাজীবীয় যুগের শেষদিকে। আর এই অভিযানের চূড়ান্ত পর্বটি রূপায়িত হয়েছিল মধ্যজীবীয় যুগে, যার ব্যাপ্তি ট্রিয়াসিক থেকে ক্রিটাশুস কাল পর্যন্ত প্রায় পনেরো কোটি বছর। এই পনেরো কোটি বছর ‹.. পৃথিবীতে সরীসৃপদের আধিপত্য বজায় ছিল।

আজ থেকে সাত কোটি বছর আগে সরীসৃপদের এই আধিপত্য শেষ হয়েছে। এখন স্তন্যপায়ীদের যুগ—সারা পৃথিবীতে স্তন্যপায়ীদের আধিপত্য। তবুও, একথা স্বীকার করতেই হবে যে জীবজগতের বিবর্তনে সরীসৃপরাই রয়েছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে। কারণ এই সরীসৃপরাই সর্বপ্রথম জল ছেড়ে পুরোপুরি ডাঙ্গার জীবনে অভ্যস্ত হতে পেরেছিল। আজকের দিনে জীবজগতের সবচেয়ে অগ্রসর যে-রূপটি আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, যাদের আমরা নাম দিয়েছি হোমো স্যাপিয়েন্স্ বা জ্ঞানী মানুষ, তাদেরও বিকাশ-লাভ এই সরীসৃপ-পর্বটি পার হয়েই। আজকের দিনের সমস্ত পাখি ও স্তন্যপায়ীর পূর্বপুরুষের গৌরবময় ভূমিকা এই সরীসৃপদের।

সরীসৃপের আদি ও পরিণতি

প্রাণের উৎসে অভিযানে সরীসৃপদের দিকে আমাদের আরো একটু মনোযোগ দিতে হবে। প্রথমে আমরা দেখব সরীসৃপের আদি রূপটিকে, তারপরে বিভিন্ন ধারায় বংশবিস্তারকে।

শক্ত খোলার আবরণযুক্ত ডিম পাড়তে শুরু করেছিল প্রথম যে প্রাণীটি তার নাম দেওয়া হয়েছে সেমূরিয়া (Seymouria)। এই বিশেষ নাম এই কারণে যে এই বিশেষ প্রাণীর নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে টেক্‌সাস্-এর সেমূর নামে একটি শহরে।

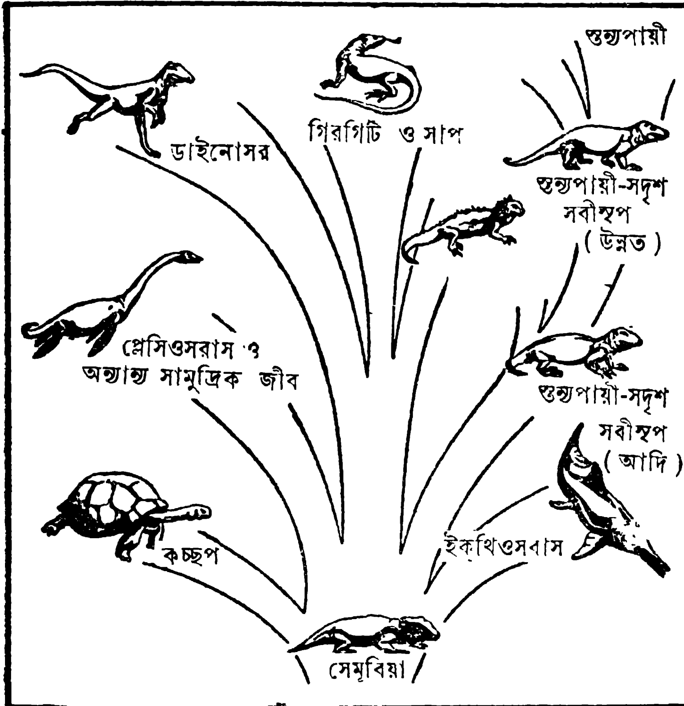


সেমূরিযা

ছবির দিকে তাকালে বোঝা যাবে, সেমূরিয়ার চেহারা ছিল অনেকটা এ কালের গিরগিটির মতো। শক্তসমর্থ শরীর, মস্ত একটা মাথা, শরীরের পাশ থেকে বেরিয়ে আসা চারটি পা। এই প্রাণীটির শরীরে পরবর্তী কালের সরীসৃপদের সমস্ত লক্ষণই খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। অন্যদিকে, উভচর জীবের লক্ষণও সেমূরিয়ার শরীরে বেশ স্পষ্টভাবেই আছে। এই কারণে জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে তর্ক থেকে গিয়েছে—এই প্রাণীটি কতখানি উভচর আর কতখানি সরীসৃপ। যদি উভচর বলতে হয় তাহলে এই উভচরটি সরীসৃপের মতো। যদি সরীসৃপ বলতে হয় তাহলে এই সরীসৃপটি উভচরের মতো। যাই বলা হোক না কেন, একথা স্বীকার করতেই হবে যে এই প্রাণীটি রয়েছে উভচর থেকে সরীসৃপের দিকে বিবর্তনের একেবারে মূলে। আজকের দিনের স্তন্যপায়ী ও পাখি এবং মধ্যজীবীয় যুগের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সরীসৃপদের পূর্বপুরুষ হিসেবে যদি কোনো একটি প্রাণীকে চিহ্নিত করতে হয়—তবে এই সেমূরিয়া হচ্ছে সেই প্রাণী।

অর্থাৎ, জীবজগতের বিবর্তনে কোটি কোটি বছর পার হবার পরে এই প্রথম দেখা যাচ্ছে, বিশেষ একটি প্রাণী জলের জীবন থেকে পুরোপুরি

ডাঙ্গার জীবনে উত্তীর্ণ। ডাঙ্গার মেরুদণ্ডী জীবের উদ্ভব ও বিবর্তন এখান থেকেই শুরু। তারপরে কয়েক লক্ষ বছরের মধ্যেই ডাঙ্গার মেরুদণ্ডী জীবরা শাখাপ্রশাখায় বিচিত্র রূপ ধারণ করেছিল। প্রাণের এমন বিপুল প্রকাশ ইতিপূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি। শুরু হয়েছিল জলে-স্থলে-আকাশে প্রাণের বিজয়মণ্ডিত অভিযান।



সরীসৃপের বংশধারা

এইসঙ্গে সরীসৃপের বংশধারার একটি ছবি দেওয়া হল। একেবারে মূলে সেমুরিয়া। তা থেকে অনেকগুলো শাখা। এক-একটি শাখায় এক-এক ধরনের সরীসৃপ। ট্রিয়াসিক থেকে ক্রিটাশুস পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে বিস্তৃতি। এই হচ্ছে পুরো ছবিটি।

প্রত্যেকটি শাখা সম্পর্কে আমাদের আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা তুলতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা দরকার,

সবকটি শাখা মিলিয়ে এই যে সরীসৃপ জগৎ, তার মধ্যে কতকগুলো সাধারণ লক্ষণ সব সময়েই থেকে যাচ্ছে। যেমন :

(১) শক্ত খোলার আবরণযুক্ত ডিম থেকে ছানা হওয়া,

(২) ফুসফুসের সাহায্য শ্বাসপ্রশ্বাস,

(৩) আঁশে ঢাকা চামড়া,

(৪) অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশেষ বিন্যাস।

সাধারণ লক্ষণ অবশ্য আরো কিছু কিছু আছে। কিন্তু এই চারটিই বিশেষ করে লক্ষ্য করার মতো।

ডাইনোসর

প্রথমে তাকানো যাক ডাইনোসরের শাখাটির দিকে। জীবজগতে এই ডাইনোসরদের একটি বিশেষ কৃতিত্ব আছে— তা হচ্ছে পেছনের দু-পায়ে চলাফেরা করা। ডাইনোসরের যদিও চারটি পা কিন্তু সামনের দু-পায়ের ব্যবহার শুধু কোনো কিছু আঁকড়ে ধরার জন্যে বা আত্মরক্ষার জন্যে। চলাফেরা সবসময়েই পেছনের দু-পায়ে। এই কৃতিত্বের খুবই দাম দিতে হবে, কেননা দেখা যাচ্ছে পরবর্তী কালের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের প্রধানতম লক্ষণ হচ্ছে দু-পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারা। ডাইনোসর অবশ্যই ঠিক মানুষের মতো দু-পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারত না—কিন্তু ডাইনোসররাই জীবজগতের ইতিহাসে প্রথম দ্বিপদী জীব।

তবে সব ডাইনোসরই দ্বিপদী ছিল না। আসলে ডাইনোসর শব্দটির সাহায্যে মধ্যজীবীয় যুগের কয়েক শ্রেণীর সরীসৃপকে বোঝানো হয়ে থাকে। জুরাসিক কলের যে ব্রন্টোসরাসের কথা বলা হয়েছে সেটিও একটি ডাইনোসর। এদেরও সামনের পা দুটি ছিল পেছনের পায়ের তুলনায় বেশ ছোট। আবার ট্রিয়াসিক কালের এমন ডাইনোসরের নিদর্শনও আছে যারা লম্বায় আট ইঞ্চির বেশি ছিল না। তাছাড়া ডাইনোসররা সবাই যে মাংসাশী তাও নয়, অনেকেরই খাদ্য ছিল শাক-পাতা। কিন্তু কোনান ডয়েলের 'দি লস্ট ওয়ার্ল্ড' বইটি যাঁরা

পড়েছেন তাঁদের ধারণা হবে, ডাইনোসর মাত্রই অতিকায় ও হিংস্র। আরো ধারণা হতে পারে, রক্তমাংসের ডাইনোসরের সঙ্গে মানুষের সাক্ষাৎ হয়ে যাওয়াটাও একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নয়। এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌-এর গল্পেও এ-ধরনের ঘটনার অবতারণা আছে। এ-প্রসঙ্গে খুব স্পষ্টভাবে জেনে রাখা দরকার যে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হবার অন্তত সাত কোটি বছর আগে ডাইনোসররা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এখন আর কোনো অবস্থাতেই কোনো মানুষের সঙ্গে কোনো ডাইনোসরের সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব নয়।

'ডাইনোসর' শব্দটি সৃষ্টি করেছিলেন একজন ইংরেজ জীবাশ্মবিদ, ১৮৪২ সালে। তখনো পর্যন্ত প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপের নিদর্শন খুব বেশি সংখ্যায় পাওয়া যায়নি। কাজেই সরীসৃপ জগতের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা সম্পর্কে কোনো ধারণা করাও সম্ভব ছিল না। সহজেই মনে হতে পারত, প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপরা বুঝি সকলেই অতিকায় ও হিংস্র। 'ডাইনোসর' শব্দটির অর্থও তাই—হিংস্র সরীসৃপ। দুটি গ্রীক শব্দ জুড়ে এই শব্দটি তৈরি। শব্দটি সাহিত্যে চলে গিয়েছে বলে এখনো টিকে আছে। নইলে জীববিজ্ঞানীদের কাছে এখন আর এই শব্দটির সুস্পষ্ট কোনো অর্থ নেই।

জীববিজ্ঞানীরা ডাইনোসরদের যে সরীসৃপ দলটির মধ্যে ফেলেছেন তার নাম আর্কোসরিয়া (Archosauria) বা আধিপত্য-বিস্তারী সরীসৃপ (The ruling reptiles)। এই নামটির ব্যবহারও খুব ব্যাপক অর্থে। এমন কি কুমির ও উড়ন্ত সরীসৃপরাও এই দলের বাইরে নয়। এই বিশেষ দলের সরীসৃপের একটি বিশেষ লক্ষণ, এদের মাথার খুলিতে চোখের ওপরের দিকে একটি বা দুটি ফুটো পাওয়া গেছে। জীববিজ্ঞানীরা নামকরণের সময় লক্ষ্য রেখেছেন এই বিশেষ লক্ষণটির দিকে—বাইরের চেহারার দিকে নয় বা স্বভাবের দিকে নয়।

যাই হোক, আমরা ডাইনোসর শব্দটিই ব্যবহার করছি। ডাইনোসরদের শরীরের ভর পেছনের দুটি পায়ের ওপরে থাকত বলে

তাদের কোমরের ও উরুর হাড়ের গড়নে বড়ো রকমের পরিবর্তন এসে গিয়েছিল। হাড়গুলো হয়ে উঠেছিল আরো মোটা মোটা ও আরো লম্বাচওড়া। ফলে এই হাড়গুলো সহজেই ডাইনোসরদের বিপুল শরীরের ভার বহন করতে পারত।

আবার এই কোমরের হাড়ের গড়নও সব ডাইনোসরের একরকম নয়। এক্ষেত্রেও স্পষ্ট দুটি ভাগ আছে।

কোমরের হাড় বা শ্রোণীচক্রের (pelvis) গড়নের দিক থেকে কোনো কোনো ডাইনোসর ছিল একালের পাখির মতো। কোনো কোনো ডাইনোসর একালের সরীসৃপের মতো। চোয়ালের ও দাঁতের গড়নেও এই দু-দলের মধ্যে বিভিন্নতা ছিল। প্রথমোক্তদের দাঁতগুলো হত চ্যাপ্টা ধরনের ; ফলে খাদ্যবস্তুর ওপরে প্রচণ্ড চাপ দিয়ে গুঁড়িয়ে বা থেঁতলে ফেলা এদের পক্ষে সহজ হত। দ্বিপদী ইগুয়ানোডোন ও চতুষ্পদী স্টেগোসরাস এই বিশেষ দলের দৃষ্টান্ত। শেষোক্তদের দাঁতগুলো হত ছুরির মতো ধারালো ও চোখা চোখা ; ফলে এরা সহজেই খাদ্যবস্তুকে টুকরো টুকরো করতে পারত। আল্লোসরাস ও টাইরানোসরাস এই বিশেষ দলের দৃষ্টান্ত। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, প্রথমোক্তরা তৃণভোজী, শেষোক্তরা মাংসাশী।

আজ থেকে চোদ্দ কোটি বছর আগে জুরাসিক কালে এই দুটি পৃথক লক্ষণকে ধারণ করে দু-দল ডাইনোসর বিবর্তনের পথে অগ্রসর হয়েছিল। প্রথমে তারা ছিল দ্বিপদী, পরে চতুষ্পদী। প্রথমে তারা ছিল আকারে ছোটখাটো, পরে অতিকায়। প্রায় সাত কোটি বছর ধরে আধিপত্য বজায় ছিল তাদের। বিবর্তনের ধাপে ধাপে যেমন পরিবর্তন এসেছিল তাদের শারীরিক গড়নে ও অস্ত্রসজ্জায়, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্বভাবে ও চালচলনে। সব মিলিয়ে সরীসৃপ-জগতের বিবর্তনটি এতই কৌতূহলোদ্দীপক যে জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে এই মধ্যজীবীয় যুগটি মস্ত একটি প্রশ্নচিহ্নের মতো উদ্যত হয়ে আছে। শুধু প্রশ্ন নয়, অনেকখানি বিস্ময়ও। প্রাণের এমন বিপুল ও উচ্ছল প্রকাশ অন্তত এই পৃথিবীতে আর কখনো দেখা যায়নি।

ডাইনোসরদের সম্পর্কে আলোচনা শেষ করবার আগে তাদের আত্মরক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে চাই। মনে রাখা দরকার যে জগতটি ছিল সরীসৃপের। সেখানে প্রাণহননের পালা অবিরাম চলতে থাকত। সুতরাং প্রাণরক্ষার জন্যেও সবসময়ে প্রস্তুত থাকতে হত।

আত্মরক্ষার পদ্ধতি ছিল তিন ধরনের। জুরাসিক ও ক্রিটাশুস কালের মস্ত মস্ত চেহারার মাংসাশী ডাইনোসররা আক্রমণের জন্যে অপেক্ষা করে থাকত না—আগু বাড়িয়ে নিজেরাই আক্রমণ করে বসত। এই ছিল তাদের আত্মরক্ষার পদ্ধতি। শত্রুকে আগে থেকেই শেষ করে দেওয়া। আরেক দল ছিল যারা ছুটে পালাত বা গভীর জলের মধ্যে ডুব দিয়ে আত্মগোপন করত। যেমন ইগুয়ানোডোন বা হাঁস-ঠোঁট ডাইনোসর। স্টেগোসরাসদের আত্মরক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। আরেক দল ডাইনোসর ছিল যারা সুবিধে বুঝলে আক্রমণ করত, বেগতিক দেখলে পালাত। শিঙওলা ডাইনোসররা এই দলে পড়ে।

যাই হোক, বিবর্তনের ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে ডাইনোসররা যখন চূড়ান্ত রূপ নিয়ে ক্রিটাশুস কালে উপস্থিত হল তখন বি'শেষ একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা যেতে পারত। ডাইনোসররা যেন দু-দলে ভাগ হয়ে গিয়েছে! একদলে রয়েছে মাংসাশীরা, যাদের মস্ত মস্ত ধারালো দাঁত। আরেক দলে তৃণভোজীরা, যাদের মস্ত মস্ত ছুঁচলো শিঙ। আরো সহজভাবে বলতে গেলে, একদিকে টাইরানোসরাস, আরেক দিকে ট্রাইসেরাটপ্‌স্। এই ব্যাপারটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, কারণ পরবর্তী কালে স্তন্যপায়ীদের মধ্যেও একই ব্যাপার প্রকাশ পেতে দেখা গিয়েছে। যাদের ধারালো দাঁত আছে তাদের শিঙ নেই, যাদের শিঙ আছে তাদের ধারালো দাঁত নেই। মধ্যজীবীয় যুগের সরীসৃপদের সঙ্গে নবজীবীয় যুগের স্তন্যপায়ীদের আরো একটি বিষয়ে মিল আছে—যদিও এই দুই যুগের জীবের মধ্যে সময়ের তফাৎ অন্তত পনেরো কোটি বছর। এই মিল জলে-স্থলে-আকাশে আধিপত্য

বিস্তারের পদ্ধতির দিক থেকে।

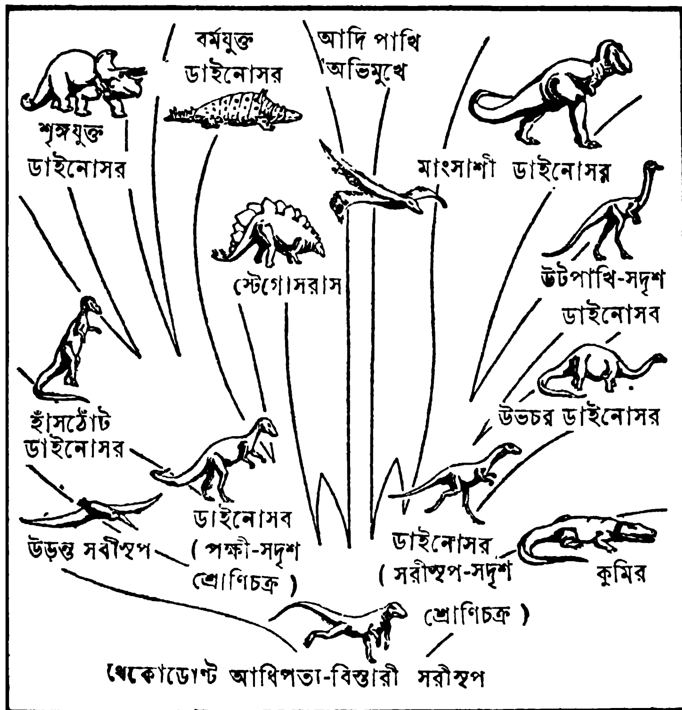
মধ্যজীবীয় যুগের সরীসৃপদের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল তাদের বিপুল আয়তনের শরীর। কেন এমনটি হল তার একটি ব্যাখ্যা অবশ্যই থাকা দরকার। জীববিজ্ঞানীদের মতে, পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ডের অস্বাভাবিক সক্রিয়তাই সরীসৃপদের শরীরের অস্বাভাবিক আয়তন বৃদ্ধির কারণ। শারীরবিদরা জানেন, জীবের শরীরের অনেকগুলো ব্যাপার এই বিশেষ গ্ল্যাণ্ডটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বাড়বৃদ্ধি। পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ডের অস্বাভাবিক সক্রিয়তার দরুন মাথা বা হাত বা পা অস্বাভাবিক রকমের প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছে—এমন দৃষ্টান্ত আজকের দিনেও পাওয়া যেতে পারে। মধ্যজীবীয় সরীসৃপের গোটা শরীরটাই প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছিল। পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ডের সক্রিয়তা মাত্রা ছাড়ালে যে কী অঘটন ঘটতে পারে—মধ্যজীবীয় সরীসৃপরাই তার দৃষ্টান্ত।

অঘটন বলছি এই কারণে যে মধ্যজীবীয় সরীসৃপদের শরীরটাই শুধু প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছিল—সে-তুলনায় স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্ক ছিল অপরিণত ও অকিঞ্চিৎকর। স্টেগোসরাসকেই দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যাক। হাতির মতো বৃহৎ ছ-টন ওজনের এই জীবটির মস্তিষ্ক ছিল এ-কালের দু-মাস বয়সের একটি বেড়ালছানার মতো। অন্যান্য ডাইনোসরেরও একই অবস্থা। মস্তিষ্কের বিচারে সকলেই প্রায় নিরেট। ফলে এই জীবগুলোর চালচলনে কিছুমাত্র বুদ্ধির ছাপ ছিল না, আক্রমণে ছিল না কিছুমাত্র ক্ষিপ্রতা। একালের একটি বাঘ বা একটি সিংহ যেমন ভাবে বিদ্যুৎঝলকের মতো শিকারের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে—তেমনভাবে ঝাঁপ দেওয়া মধ্যজীবীয় সরীসৃপদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার ছিল। মধ্যজীবীয় যুগের একটি লক্ষণ যেমন বিপুলকায় শরীর, অন্য একটি লক্ষণ তেমনি ক্ষিপ্রতার অভাব। অকিঞ্চিৎকর মস্তিষ্ক এই জীবগুলোকে প্রায় জরদগবের মতো করে তুলেছিল। খুব সম্ভবত এই কারণেই প্রকাণ্ড শরীর ও অমিত বিক্রম থাকা সত্ত্বেও এই জীবগুলো স্তন্যপায়ীদের সঙ্গে এঁটে উঠতে

পারেনি। স্তন্যপায়ীদের শরীর এদের তুলনায় ছিল খুবই ছোট, বিক্রম নগণ্য, কিন্তু ক্ষিপ্রতা অনেক অনেক বেশি। মস্তিষ্কের জোরই যে সবচেয়ে বড়ো জোর তা স্তন্যপায়ীদের যুগে মানুষের আবির্ভাবের পর চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে।

উড়ন্ত সরীসৃপ

ডাইনোসরদের সম্পর্কে এতক্ষণ যতোটুকু আলোচনা করা হয়েছে তা একটা ছবির মধ্যে তুলে ধরলে এই রকমটি দেখাবে :



ছবিতে দেখা যাবে, ডাইনোসরদের বিবর্তনের একেবারে মূলে রয়েছে যে দ্বিপদী সরীসৃপটি তার নাম দেওয়া হয়েছে থেকোডোণ্ট (Thecodont)। একটি শাখায় রয়েছে কুমির। এই কুমিররাই এখনো পর্যন্ত অত্যন্ত ম্রিয়মাণ অবস্থায় টিকে আছে। আরেকটি শাখায় রয়েছে উড়ন্ত সরীসৃপ। এই উড়ন্ত সরীসৃপরা কিন্তু পাখি

নয়। এদের সম্পর্কেই এবারে আমরা আলোচনা তুলব। ছবিতে অন্যান্য যে-সব শাখা দেখানো হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। পাখির আলোচনায় আমাদের পরে যেতে হবে। ছবিতে লক্ষ্য করা যাবে, সত্যিকারের পাখির উদ্ভবও এই ডাইনোসর বংশ থেকেই।

উড়ন্ত সরীসৃপরা যদিও পাখি নয়, কিন্তু এরাই প্রথম মেরুদণ্ডী জীব যারা আকাশে উড়তে পেরেছিল। জীবজগতের ইতিহাসে এ-ঘটনাটির গুরুত্ব খুবই বেশি।

মেরুদণ্ডী জীবকে যদি আকাশে উড়তে হয় তাহলে কতকগুলো শর্ত অবশ্যই পূরণ হওয়া দরকার। তা হচ্ছে :

(১) সামনের দুটি পায়ের জায়গায় দুটি ডানা হওয়া,

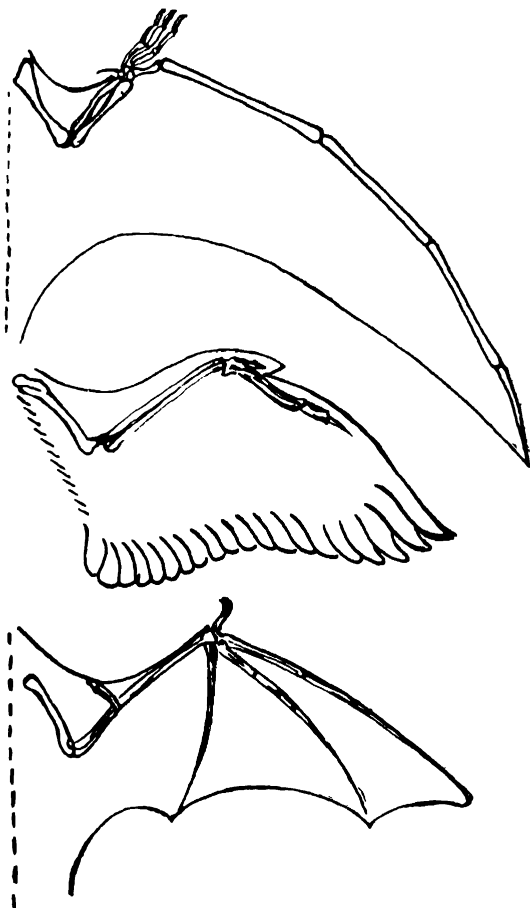
(২) শরীরের কঙ্কাল ও মাংসপেশী যথেষ্ট মজবুত হওয়া যাতে ডানার সাহায্যে হাওয়ায় ঝাপ্‌টা দেওয়া যেতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীরটি যতোটা সম্ভব হালকা হওয়া,

(৩) জীবটির স্নায়ুতন্ত্র যথেষ্ট উন্নত হওয়া যাতে উড়ন্ত অবস্থায় শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে পরিবেশ সম্পর্কে সজাগ থাকা চলে।

এই তিনটি শর্তের মধ্যে প্রথম শর্তটিই সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক। সামনের দুটি পায়ের জায়গায় দুটি ডানা হওয়া। কিন্তু শুনলে অবাক হতে হবে যে সকল উড়ন্ত মেরুদণ্ডী জীবের ডানা একরকমের নয়। উড়ন্ত সরীসৃপ, পাখি ও উড়ন্ত স্তন্যপায়ী জীবের ডানায় তফাৎ আছে। পরের পৃষ্ঠার ছবি দেখলে তিন ধরনের ডানার মধ্যে তফাতটা কোথায় বোঝা যাবে।

একেবারে ওপরে উড়ন্ত সরীসৃপের ডানা, মধ্যে পাখির, নিচে উড়ন্ত স্তন্যপায়ীর। সরীসৃপের বেলায় দেখা যাবে, কড়ে আঙুলটি মস্ত লম্বা হয়ে গিয়েছে আর এই কড়ে আঙুলের সঙ্গেই ডানার পর্দাটি লাগানো। অন্য আঙুলগুলোর অস্তিত্ব লোপ পায়নি। সবকটিই আছে, তবে তাদের চেহারা হয়েছে অনেকটা বঁড়শির মতো। পাখির

ডানায় কিন্তু আঙুল নেই। সবকটি আঙুল মিলে গিয়ে হয়ে উঠেছে একটি হাড় আর পর্দাটি লাগানো আছে এই হাড়ের সঙ্গে। পাখির ডানার পর্দা অপেক্ষাকৃত ছোট বটে কিন্তু পালকযুক্ত। স্তন্যপায়ীর বেলায় দেখা যাবে, চারটি আঙুল খুবই লম্বা হয়ে গিয়েছে আর



পর্দাটি লাগানো আছে এই চারটি আঙুলের সঙ্গে। আর পঞ্চম বা বুড়ো আঙুলটি উচিয়ে আছে বঁড়শির মতো। এই বঁড়শির সাহায্যেই উড়ন্ত স্তন্যপায়ীরা গাছের ডালে বাদুড়ের মতো মাথা নিচু করে ঝোলে।

যাই হোক, পাখি ও স্তন্যপায়ীদের আলোচনায় আমাদের পরে

আসতে হবে। আপাতত উড়ন্ত সরীসৃপদের সম্পর্কে কিছু খবর নেওয়া যাক।

উড়ন্ত সরীসৃপদের বলা হয়ে থাকে টেরোসরিয়া (Pterosauria)। ইউরোপে, আফ্রিকায়, ও উত্তর আমেরিকায় এই উড়ন্ত সরীসৃপদের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এদের শরীরের অধিকাংশ হাড়ই হত ফাঁপা, বুকের হাড়খানা হত মস্ত, মাথার হাড়গুলো এমনভাবে একটার সঙ্গে আরেকটা জোড়া লাগানো থাকত যে আলাদা করে চেনা যেত না।

কিন্তু এতসব আয়োজন সত্ত্বেও এই উড়ন্ত সরীসৃপদের সত্যিকারের উড়ন্ত জীবের মর্যাদা দিতে বিজ্ঞানীরা ইতস্তত করেছেন। এদের ডানা এতই পল্‌কা যে পাখি বা বাদুড়ের মতো হাওয়ায় ডানা ঝাপ্‌টে উড়বার ক্ষমতা সম্ভবত এদের ছিল না। এরা হাওয়ায় ডানা মেলে দিয়ে গ্লাইডারের মতো ভেসে বেড়াতে পারত আর হাওয়ার গতি বুঝে ওঠানামা করত। তাই বলে উড়ন্ত সরীসৃপদের কৃতিত্ব কিছুমাত্র ম্লান হচ্ছে না। আকাশ-জয়ের গৌরব তাদেরই প্রাপ্য। তাছাড়া গ্লাইডারের মতো হাওয়ায় গা ভাসাতে হলেও কিছু শারীরিক দক্ষতা অর্জন করা দরকার। প্রথমত চাই সজাগ স্নায়ুতন্ত্র। দ্বিতীয়ত চাই তীক্ষ্ণতর দৃষ্টিশক্তি। সরীসৃপ হওয়া সত্ত্বেও এই দুটি সম্পদের অধিকারী হতে পারা বড়ো কম কথা নয়।

জুরাসিক কালের উড়ন্ত সরীসৃপদের মুখে থাকত সারি সারি ধারালো দাঁত। একদল পালকহীন দন্তুর জীব আকাশকে আশ্রয় করেছে— দৃশ্যটি মোটেই মনোরম ছিল না।

জুরাসিক কালের উড়ন্ত সরীসৃপ র‍্যাম্‌ফোরিংকাস সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এই কালের অন্য একটি উড়ন্ত সরীসৃপের নাম দেওয়া হয়েছে টেরোডাক্‌টিল (Pterodactyl)। ক্রিটাশুস কালের উড়ন্ত সরীসৃপ টেরানোডোন সম্পর্কেও আমরা আগেই জেনেছি।

পাখি

৯৩ পৃষ্ঠায় যে ছবিটি দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যাবে, ডাইনোসর-বংশের একটি ধারা পাখির দিকে অগ্রসর হয়েছে। কাজেই পাখির সম্পর্কে আলোচনাও এখানেই তুলতে হবে।

পাখির সঙ্গে সরীসৃপের কোনো সম্পর্ক আছে, একথা মেনে নেওয়া আমাদের পক্ষে একটু শক্ত। যে-পাখি এমন সুন্দর গান গায় ও নাচে, যে-পাখি আমাদের এমন আনন্দ দিতে পারে, সে যেন একেবারেই অন্য ধরনের জীব। কিন্তু কথাটা আমাদের পছন্দ না হলেও মেনে নিতে হবে যে এমন কি শরীরের গড়নের দিক থেকেও পাখির সঙ্গে সরীসৃপের খুবই মিল।

এই কারণে পুরনো দিনের একজন লেখক পাখিকে বলেছেন, 'মহিমান্বিত সরীসৃপ'। আলাদা আলাদা করে বিচার করলে দেখা যাবে, পাখির মহিমা বলতে আছে শুধু তার পালক—ডানায়, লেজে ও সারা শরীরে। এই পালকের অংশটুকু বাদ দিলে পাখির সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে সরীসৃপের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মিল পাওয়া যাবে।

তবে অন্য একটি বিষয়ে সরীসৃপের সঙ্গে পাখির মস্ত অমিল। পাখির রক্ত উষ্ণ—সরীসৃপের মতো নয়। এমন কি মানুষের শরীরের রক্তের চেয়েও বেশি উষ্ণ। এই উষ্ণতা বজায় রাখতে হলে পাখির শরীরে প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেনের যোগান থাকা প্রয়োজন আর প্রয়োজন উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ফুসফুস ও নিখুঁত রক্তচলাচল-ব্যবস্থা। পাখির শরীরের আয়োজনটি এমনি যে সবকটি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে।

পাখিদের আরেকটি বিশেষত্ব বাসা তৈরি করা। সরীসৃপদের এই গুণটি ছিল না। সরীসৃপরাও ডিম পাড়ত বটে কিন্তু তারপরে সেই ডিম সম্পর্কে বা ডিম ফুটে ছানা বেরোবার পরে সেই ছানাদের সম্পর্কে তাদের কোনো মমতা ছিল না। কিন্তু পাখির ডিমের বেলায় মমতার অভাব ঘটলে সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। কারণ পাখির ডিমকে ফোটাতে হলে ডিমকে উষ্ণ অবস্থায় রাখা চাই—

অর্থাৎ তা দেওয়া চাই। তারপরে ডিম ফুটে ছানা বেরোবার পরেও সেই ছানা নিজের থেকে উড়তে শেখে না—তাকে শেখাতে হয়। এই সমস্ত কারণে পাখিকে ডিম পাড়বার সময়ে বাসা বাধতেই হয়, ডিমে তা দিতেই হয়, ডিম ফুটে ছানা বেরোবার পরে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেই হয়।

পাখির মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয় খুবই উন্নত। কিন্তু এই উন্নতি সর্বাঙ্গীণ নয়, উড়ে বেড়াবার জন্যে যতোটুকু প্রয়োজন তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ। মানুষের মতো পাখিও বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করে প্রধানত দৃষ্টিশক্তির ওপরে নির্ভর করে। পাখির চোখ হয়ে থাকে বড়ো বড়ো আর চোখের কাঠামোটিই এমনি যে উড়বার সময়ে হাওয়ার ঝাপ্‌টা লেগে চোখের ক্ষতি হতে পারে না।

পাখির মস্তিষ্ক খুবই উন্নত—একথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু এই উন্নতিও বিশেষ করে উড়বার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ, উড়ন্ত অবস্থায় শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখা, শরীরের মাংসপেশীকে ঠিকভাবে সঞ্চালিত করা, ইত্যাদি জটিল ও সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো এই মস্তিষ্কের সাহায্যে নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।



আধুনিক পাখির কঙ্কাল। মস্ত স্টারনাম বা উরঃফলকটি লক্ষণীয়।

পাখির শরীরের কাঠামোয় সবচেয়ে লক্ষণীয় অংশ হচ্ছে বুকের হাড়, যার নাম স্টারনাম (Sternum) বা উরঃফলক। এই হাড়টি মস্ত এবং বুকের নিচের দিকে সবখানি অংশ জুড়ে এর অবস্থান। বুকের যে মাংসপেশীর সাহায্যে পাখি ডানা নাড়ে তা লাগানো থাকে এই উরঃফলকে। পাখির হাতে (অর্থাৎ ডানায়) পাঁচটির মধ্যে তিনটি আঙুলের চিহ্ন পাওয়া

যায় (কোনো কোনো ডাইনোসরের বেলাতেও একই ব্যাপার ঘটেছিল)। এই তিনটি আঙুলও আবার একসঙ্গে জুড়ে গিয়েছে। আমরা আগেই জেনেছি, এই তিনটি জুড়ে যাওয়া আঙুলের সঙ্গেই ডানার পর্দাটি লাগানো।

পাখির কোমরের হাড় বা শ্রোণীচক্র এবং একদল ডাইনোসরের শ্রোণীচক্র একই ধরনের—এ কথাটি আগেই বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, দ্বিপদী ডাইনোসরের পেছনের পায়ের সঙ্গে পাখির পায়ের খুবই মিল। একালের পাখিদের দাঁত নেই, অনেক উড়ন্ত সরীসৃপ ও ডাইনোসরেরও ছিল না।

সব মিলিয়ে শরীরের গড়নের দিক থেকে পাখি ও ডাইনোসর অভিন্ন। এমন কি পাখির পালক থাকাটাও একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নাও হতে পারে, কারণ ডাইনোসরদের ছিল আঁশ। রাসায়নিক উপাদান পালকেরও যা, আঁশেরও তাই। আঁশ পরিবর্তিত হতে হতে পালকে রূপান্তরিত হওয়াও একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নয়।

পাখির প্রাচীনতম নিদর্শন এখনো পর্যন্ত যা পাওয়া গিয়েছে তা জুরাসিক কালের। এরা ছিল দাঁতওলা পাখি। এদের নাম দেওয়া হয়েছে আর্কিওপ্‌টেরিক্‌স্ (Archaeopteryx)।

১৮৬১ সালের জুনমাসে ব্যাভেরিয়ার কাছে আবিষ্কৃত হয় একটি পাখির পালকের ফসিল, তারপরে আগস্ট মাসে আবিষ্কৃত হয় আরো কয়েকটি পালক ও একটি মুণ্ডহীন পাখির কঙ্কালের ফসিল। ১৮৭৭ সালে আবিষ্কৃত হয় মুণ্ডু ও ধড় সমেত পুরো একটি পাখির কঙ্কালের ফসিল। এই সমস্ত নিদর্শন থেকেই আর্কিওপ্‌টেরিক্‌স্‌কে খাড়া করা হয়েছে। কঙ্কালের সঙ্গে সঙ্গে পালকগুলোকেও যদি না পাওয়া যেত তাহলে আর্কিওপ্‌টেরিক্‌স্‌কে কিছুতেই সরীসৃপ ছাড়া অন্য কিছু ভাবা হত না। পালকগুলো পাওয়া গেছে বলেই আর্কিওপ্‌টেরিক্‌স্ পাখির মর্যাদা পেয়েছে।

এই দাঁতওলা পাখিটি আকারে ছিল একালের একটি পায়রার মতো। হাড়ওলা লেজটি মস্ত, দু-সারি পালক থাকা সত্ত্বেও সেটিকে সরীসৃপের

লেজ বলেই মনে হবে। ডানা খুবই পল্‌কা, ডানার আঙুল তিনটিতে নখর থেকে গিয়েছে। উরঃফলক পাখিদের মতো বিস্তৃত নয়। একটি হাড়ও ফাঁপা নয়। লক্ষণ মিলিয়ে বিচার করলে জীবটিকে পাখি না বলে সরীসৃপ বলাই সঙ্গত ছিল। নিতান্তই পালক থাকার জন্যে পাখি বলতে হচ্ছে।



আর্কিওপ্‌টেরিক্‌স

আর্কিওপ্‌টেরিক্‌স্‌ যে-ভাবে আকাশে উড়ত তাকে ঠিক ওড়া বলে না। মস্ত হাড়ওলা লেজ, নখওলা ডানা ও পায়ের সাহায্যে গাছের গা বেয়ে সে উঠে আসত গাছের খুব উঁচু একটা ডালে, সেখান থেকে বাদুড়ের মতো মাথা নিচু করে ঝুলত, ঝুপ্‌ করে পড়তে দিত নিজেকে। পড়তে পড়তে যথেষ্ট বেগ হবার পরে ডানা মেলে দিয়ে হাওয়ায় ভাসত। এই ধরনের ওড়াকে প্যারাস্যুটের সাহায্যে লাফ দেওয়ার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

ক্রিটাশুস কালের পাখিরা কিন্তু সত্যিকারের পাখির অনেক কাছাকাছি, যদিও তখনো পর্যন্ত তাদের ঠোঁটে দাঁত থেকে গিয়েছে। একটির নাম হেস্‌পেরোর্নিস (Hesperornis)। শরীরের গড়নের দিক থেকে এই পাখিটির সঙ্গে সত্যিকারের পাখির তফাৎ খুব সামান্যই। কিন্তু এই পাখিটি উড়তে পারত না। জলে সাঁতার কাটতে ও ডুব দিতে ছিল খুবই পটু। তিন ফুট পর্যন্ত লম্বা হত। একালের পেঙ্গুইনের সঙ্গে এই পাখিটিকে তুলনা করা চলে।

আরেকটির নাম ইক্‌থিওর্নিস (Ichthyornis)। এই পাখিটিরও দাঁত ছিল। বাস করত জলে। এই কারণে অনেক সময়ে বলা হয়ে থাকে 'মাছ-পাখি'। তা সত্ত্বেও মাছ কিন্তু কোনো দিক থেকেই

নয়, প্রায় সর্বাংশেই পাখি, দুটি ডানাও ছিল খুবই শক্তিশালী। মধ্যজীবীয় যুগের শেষদিকে পাখিরা দাঁতহীন হতে শুরু করে। নবজীবীয় যুগ শুরু হবার পরে পুরোপুরি আধুনিক অর্থেই পাখির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

কুমির

ডাইনোসর-বংশের আরো একটি শাখা থেকে গিয়েছে যে-সম্পর্কে কিছু আলোচনা দরকার। এই শাখাটি কুমিরের। এমনিতে চোখের দেখায় মনে হতে পারে, বংশের লক্ষণ এই জীবটির মধ্যে আর বিশেষ কিছু নেই। তবুও লক্ষণীয় বিষয় এই যে ডাইনোসর বংশের ধারা বহন করে এই কুমিররা গত পনেরো কোটি বছর ধরে প্রায় একই রকমের জীবন কাটিয়ে আসছে। এদের প্রবল-প্রতাপান্বিত জ্ঞাতিগোষ্ঠীরা অভ্যুদয় ও পতনের পালা শেষ করে পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত—কিন্তু এরা পনেরো কোটি বছর আগেও যা এখনো তাই।

কুমিরের প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল জুরাসিক কালে। থেকোডোণ্ট থেকে বিবর্তনের একটি ধাপেই সরাসরি কুমির—মাঝখানে কোনো পর্ব নেই। সে-সময়ে এরা ছিল সামুদ্রিক জীব। আকারেও ছিল অনেক বড়ো। পরে ক্রিটাশুস কালে ছোট ছোট কুমিরের আবির্ভাব হয়, যেগুলো সবদিক থেকেই ছিল আজকালকার কুমিরের মতো।

ডাইনোসর-বংশের আলোচনা এখানেই শেষ করা যেতে পারে। দ্বিপদী থেকোডোণ্ট থেকে উদ্ভূত হয়ে যে বিচিত্র জীবজগতটি কয়েক কোটি বছর ধরে এই পৃথিবীর জলে-স্থলে-আকাশে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, যাদের নাম দেওয়া হয়েছে আধিপত্য-বিস্তারী সরীসৃপ, তাদের সম্পর্কে অবশ্যই বলার কথা এত সহজে ফুরিয়ে যাবার নয়। জীববিজ্ঞানীরা মধ্যজীবীয় যুগের জীবনের এই আশ্চর্য প্রকাশকে নানা ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছেন ও তাই নিয়ে মোটা মোটা বই লিখেছেন। এই মধ্যজীবীয় যুগ নিয়েই প্রযোজকরা তুলেছেন

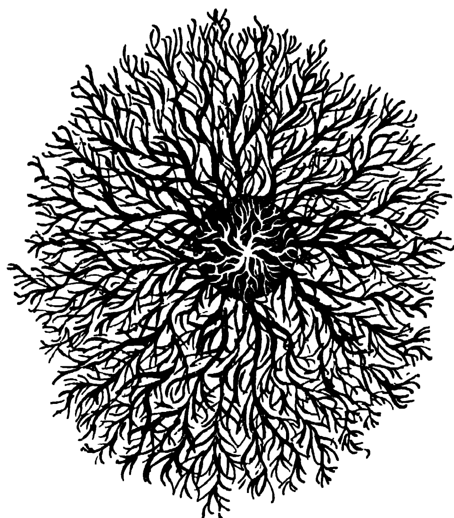
চলচ্চিত্র, লেখকরা সৃষ্টি করেছেন স্মরণীয় কাহিনী। তবুও মনে হয়, মাত্র কয়েকটি ফসিলের অক্ষরে এই বিস্ফারিত সরীসৃপ-জগৎ সম্পর্কে যতোটুকু আমরা জানতে পেরেছি, তা হয়তো বাস্তবের অতি অকিঞ্চিৎকর অংশ মাত্র। যতোটুকু জেনে আমরা বিস্মিত হচ্ছি, বাস্তব হয়তো তার চেয়েও অনেক বেশি বিস্ময়কর। তবুও প্রাণের উৎসে অভিযানে সরীসৃপ-জগৎ থেকে আমাদের এখানেই বিদায় নিতে হবে।

তবে সরীসৃপ-জগতের একেবারে আদিতে যে-জীবটির অধিষ্ঠান তাকে আরেক বার স্মরণ করব। ৮৭ পৃষ্ঠার ছবিতে দেখা যাবে, সেমূরিয়া থেকে একটি শাখা অগ্রসর হয়েছে স্তন্যপায়ীদের দিকে। আমাদেরও এবার এই বিশেষ দিকে অগ্রসর হতে হবে।

তার আগে একটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাওয়া দরকার। সরীসৃপ-জগতের অবলুপ্তির কারণ কী? মাত্র কয়েক লক্ষ বছরের মধ্যে (ভৌগোলিক পরিবর্তনের পক্ষে কয়েক লক্ষ বছর একটি নিমেষ মাত্র) জীবজগতে এত বড়ো একটা বিপর্যয় কি করে ঘটতে পারল?

জীববিজ্ঞানীরা নানা রকমের অনুমান করেছেন। কিন্তু খুব সম্ভবত ব্যাপারটি ঘটেছে ভূ-পরিবর্তনের জন্যে।

টারশিয়ারি কালটি শুরু হবার সময়ে বড়ো রকমের একটা ভূ-বিপ্লব চলছিল। সেটা ছিল আল্প্‌স, হিমালয় ও রকি পর্বতমালার সৃষ্টিকাল। আবহাওয়া ও ভূ-সংস্থানে এসে গিয়েছিল বড়ো রকমের পরিবর্তন। এই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সরীসৃপরা খাপ খাইয়ে চলতে পারেনি, স্তন্যপায়ীরা পেরেছিল। ফলে সরীসৃপদের অবলুপ্তি, স্তন্যপায়ীদের আধিপত্য। এই যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে গেল ঘূর্ণ্যমান মঞ্চের পট-পরিবর্তনের মতো। পুরনো সাজসজ্জা, পুরনো সমাবেশ নেপথ্যে অপসারিত—এখন নতুন মঞ্চ, নতুন আয়োজন।



স্তন্যপায়ীর যুগ

সে বিস্ময় পুষ্পে পর্ণে গন্ধে বর্ণে ফেটে ফেটে পড়ে ;
প্রাণের দুরন্ত ঝড়ে,
রূপের উন্মত্ত নৃত্যে, বিশ্বময়
ছড়ায় দক্ষিণে বামে সৃজন প্রলয় ;
সে বিস্ময় সুখে দুঃখে গর্জি উঠি কয়,—
জয়, জয়, জয় ॥

আজ থেকে সাত কোটি বছর আগে পৃথিবী থেকে সরীসৃপরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। অথচ তার আগে পনেরো কোটি বছর ধরে এই সরীসৃপদেরই আধিপত্য ছিল এই পৃথিবীতে। জীবজগতের ইতিহাসে এমন বিপর্যয়ের দৃষ্টান্ত দুটি নেই। আজকের দিনে অতীতের সেই পৃথিবীজয়ী সরীসৃপদের নগণ্য সাক্ষ্য বহন করে বেঁচে আছে কয়েক জাতের গিরগিটি, কচ্ছপ, সাপ ও কুমির। এই বেঁচে থাকাও কোনো রকমে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা মাত্র। সরীসৃপদের যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে।

জীবজগতে এখন স্তন্যপায়ীদের আধিপত্য। আজকের পৃথিবীর জলহাওয়া-পরিবেশ বিশেষ করে যেন এই স্তন্যপায়ীদের জন্যেই

তৈরি। সরীসৃপদের তুলনায় স্তন্যপায়ীরা আকারে তেমন বিপুল নয়, বিক্রমে তেমন প্রবল নয়; কিন্তু বৈচিত্র্যে, ব্যাপকতায় ও পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতায় স্তন্যপায়ীদের স্থান সরীসৃপদের চেয়ে অনেক উঁচুতে। মানুষের কথা বাদ দিয়ে এই মন্তব্য করছি, কারণ মানুষ জীব হিসেবে এতই শ্রেষ্ঠ যে মানুষের তুলনা একমাত্র মানুষই।

কিন্তু তাই বলে এমন কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই যে নবজীবীয় যুগ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে আচমকা মাটি ফুঁড়ে এই স্তন্যপায়ীদের আবির্ভাব হয়েছে। স্তন্যপায়ীদের ইতিহাস তার আগে অন্তত আরো তেরো কোটি বছরের। জীববিজ্ঞানীদের মতে, আজ থেকে কুড়ি কোটি বছর আগে পার্মিয়ান সময়কালেই এই পৃথিবীতে এমন জীবের অস্তিত্ব পাওয়া যেতে পারত যাদের বিবর্তনের ঝোঁক ছিল স্তন্যপায়ী হবার দিকে, যারা ছিল সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ীর মাঝামাঝি অবস্থায়। এমন কি আজকের দিনেও কোনো কোনো স্তন্যপায়ী অতীতের সরীসৃপ-জন্মের সমস্ত লক্ষণ একেবারে মুছে ফেলতে পারেনি। ভাবলে অবাক হতে হয়, কুড়ি কোটি বছর আগে যাদের আবির্ভাব, যারা ছিল না-পুরোপুরি-সরীসৃপ না-পুরোপুরি-স্তন্যপায়ী, আকারে ও ক্ষমতায় যারা ছিল সরীসৃপদের তুলনায় নিতান্তই তুচ্ছ—গোটা মধ্যজীবীয় যুগে প্রবলপরাক্রান্ত সরীসৃপদের পায়ে পায়ে থেকেও তারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল! আজকের দিনে স্তন্যপায়ীদের কৃতিত্ব চোখ মেললেই দেখা চলে, সেজন্য কোনো প্রমাণ উপস্থিত করতে হয় না। কিন্তু মধ্যজীবীয় যুগে নিজেদের সামান্য অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারার মধ্যেও স্তন্যপায়ীদের কম কৃতিত্বের পরিচয় ছিল না।

প্রাণের উৎসে অভিযানে আমাদের বিশেষ করে এই কৃতিত্বের নিদর্শনগুলির দিকেই চোখ রাখতে হবে।

কিন্তু তার আগে একজন মানুষের গল্প বলে নিতে চাই, যিনি প্রথম অতীতের কৃতিত্বের নিদর্শনগুলিকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করবার

পথনির্দেশ করেছিলেন। এই মানুষটির নাম জ্যাঁ-লেয়োপোল্ড-নিকোল্‌স্‌-ফ্রেডেরিক কুভিএর। বা, যে নামে তিনি পরিচিত, জর্জ কুভিএর। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে, জাতিতে ফরাসী।

জর্জ কুভিএর

১৭৮৯ সালে যখন ফরাসী বিপ্লবের ঢেউ ফ্রান্সের সিংহাসনকে কাঁপিয়ে তুলেছিল, তখন কুভিএর-এর বয়স ছিল কুড়ি, অর্থাৎ তখন তিনি পূর্ণ যুবক। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। সে-সময়ে তাঁর জীবন কাটছিল নর্ম্যাণ্ডির উপকূলে। সারাদিন ধরে তিনি সংগ্রহ করতেন নানা অদ্ভুতদর্শন সামুদ্রিক জীব এবং অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করতেন। শান্ত অনুত্তেজিত দিনগুলি নতুন নতুন অভিজ্ঞতার পুঁজি সঞ্চয় করে একটি একটি করে খসে পড়ত।

তখনো পর্যন্ত এই ধারণা স্পষ্ট হয়নি যে পৃথিবীর এই জীবজগতকে আশ্রয় করে একই প্রাণ নানা রূপে প্রকাশ পেয়েছে এবং রূপ থেকে রূপান্তর গ্রহণের মধ্যেও একটা নিয়ম আছে, সম্পর্কের সূত্র আছে। প্রাণের প্রকাশকে যদি এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে লক্ষ্য করা যাবে, প্রাণের প্রকাশ সরল থেকে জটিল হয়েছে নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট এক-একটি ধাপ পার হয়ে হয়ে। কুভিএর-এর সময়ে এই দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা বড়ো সহজ ছিল না, কুভিএর-এর আগের কালে তো আরো নয়। তবুও এই প্রসঙ্গে কুভিএর-এর আগের কালের একজন বিজ্ঞানীর নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। তিনি সুইডেনের বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনীয়াস (Carolus Linnaeus, 1707-78)। প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের ধারণায় তিনি একটা শৃঙ্খলা আনতে পেরেছিলেন এবং প্রাণী ও উদ্ভিদকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করার একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত পদ্ধতিটিই এখনো পর্যন্ত অনুসৃত হচ্ছে। লিনীয়াসের গবেষণা থেকে এই স্বীকৃতি পাওয়া গেল যে জীবজগতের বিভিন্ন

প্রজাতির মধ্যে সাদৃশ্য আছে এবং সাদৃশ্যের মাত্রা অনুসারে শ্রেণীকরণ সম্ভব। লিনীয়াসের বিখ্যাত গ্রন্থটি (Systema Naturae) প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৩৫ সালে। ডারউইনের 'অরিজিন অফ স্পিসিস' আরো প্রায় সোয়া-শো বছর পরের ঘটনা। প্রথম ঘটনাটি দ্বিতীয় ঘটনার পথ রচনা করেছিল। লিনীয়াসের গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পরেই তুলনামূলক শারীরবিদ্যা ও জীবাশ্ম-বিদ্যার অনুশীলনে আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

কুভিএর যে-সময়ে নরম্যাণ্ডির উপকূলে সামুদ্রিক জীবের উপকরণ সংগ্রহ করছিলেন তখনো এই গ্রন্থটিই তাঁকে সঠিক পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছিল। তাঁর গবেষণার ফলে সামুদ্রিক জীব সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা দূর হয়েছিল ও অনেক নতুন আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল।

এই সময়ে কয়েকটি ব্যক্তিগত যোগাযোগের সূত্র কুভিএরকে সাহায্য করেছিল এবং তারই ফলে ১৭৯৫ সালে ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি প্যারিসে আসতে পেরেছিলেন ও প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক হয়েছিলেন। অধ্যাপনা ও গবেষণা উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর কৃতিত্ব ছিল অনন্যসাধারণ। ১৭৯৮ সালে তাঁর প্রথম মৌলিক গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়, যার বিষয়বস্তু ছিল প্রাণীজগতের শ্রেণীকরণ সম্পর্কিত প্রস্তাব।

১৮০২ সালে তিনি প্যারিসের বিখ্যাত ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়মের শারীরবিদ্যার অধ্যাপক হয়েছিলেন।

এই সময়ে ঘটনাক্রমে তিনি প্যারিসের জিপ্‌সাম খনি-অঞ্চল থেকে অনেকগুলো ফসিল সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। এই ফসিলগুলো ছিল হাড় ও দাঁত—সংখ্যায় কয়েক-শো। কিন্তু সবই টুকরো-টুকরো, ভাঙা-ভাঙা। কোন্‌টির সঙ্গে কোন্‌টিকে জোড়া লাগাতে হবে—তা স্থির করতে গিয়ে কুভিএর একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। তারপরে শুরু হল এক আশ্চর্য গবেষণা। কয়েক-শো হাড় ও দাঁতের টুকরো নিয়ে এক নতুন ধরনের খেলাঘরের পত্তন। এই খেলাঘরের সমস্যাটি বড়ো সহজ নয়—লক্ষণ মিলিয়ে এমনভাবে

টুকরোগুলোকে সাজানো যাতে নির্ভুলভাবে বোঝা যায়, সম্পূর্ণ একটি জীব খাড়া করতে হলে কোন্ হাড়টির সঙ্গে অন্য কোন্ হাড় জোড় লাগাতে হবে, কোন্ দাঁতটির সঙ্গে অন্য কোন্ দাঁত, কোন্ মুণ্ডুটির সঙ্গে কোন্ প্রত্যঙ্গ, ইত্যাদি। গোলকধাঁধার খেলার চেয়েও এ খেলাটি জটিল। কারণ, কোথায় শুরু কোথায় শেষ তার কোনো হদিশ এ-খেলায় নেই। সবটাই যুক্তি দিয়ে তৈরি করে নিতে হবে।

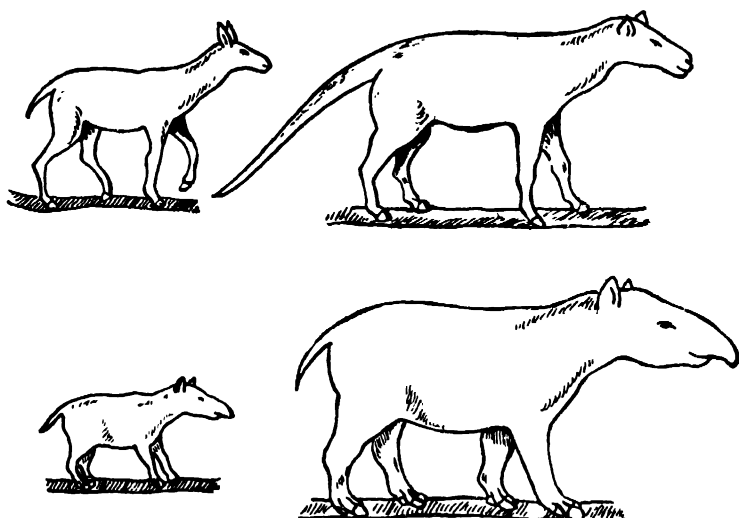
প্রথমে তিনি নজর দিলেন দাঁতগুলোর দিকে। দু-ধরনের দাঁত পাওয়া যাচ্ছে—পেষণ ও শ্ব। পেষণ দাঁতগুলোর মধ্যে মোটামুটি কোনো অমিল নেই। কিন্তু শ্ব-দাঁতে আছে। কোনোটা লম্বা, কোনোটা ছোট। লম্বা শ্ব-দাঁতগুলো নিশ্চয়ই পেষণ দাঁতের বাইরে এসে পড়ত।

তারপরে মাথার খুলির হাড়। এক্ষেত্রেও দেখা গেল সব হাড় এক রকমের নয়। লক্ষণ মিলিয়ে জোড় মেলাতে গিয়ে দুটি পৃথক মুণ্ডুর আভাস পাওয়া গেল।

তারপরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের হাড়। এক্ষেত্রেও একই পদ্ধতিতে বিচার-বিশ্লেষণ।

শেষ পর্যন্ত কুভিএর-এর সিদ্ধান্ত হল: পেষণ-দাঁতগুলো আধুনিক গণ্ডারের সঙ্গে তুলনীয় কোনো জীবের। জীবগুলো তৃণভোজী এবং তাদের গায়ের চামড়া খুবই পুরু। কিন্তু শ্ব-দাঁত রয়েছে দু-ধরনের। তখন সিদ্ধান্ত হল: পাশাপাশি দু-ধরনের পুরু চামড়াওলা তৃণভোজী জীবের অস্তিত্ব ছিল। একটির নাম তিনি দিলেন অ্যানোপ্লোথেরিয়াম (Anoplotherium), অপরটির প্যালিওথেরিয়াম (Palaeotherium)। এই নামের অর্থ—প্রথমটির 'অস্ত্রহীন বন্য জন্তু', দ্বিতীয়টির প্রাচীন বন্য জন্তু'। প্রথমটি ছিল ছোট শ্ব-দাঁতওলা, দ্বিতীয়টি লম্বা শ্ব-দাঁতওলা। পরের সমস্যা ছিল দাঁতের সঙ্গে মাথার খুলির জোড় লাগানো, তারপরে মুণ্ডুর সঙ্গে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের। যুক্তির পরে যুক্তি বিস্তার করে তিনি প্রত্যেকটি সমস্যার মীমাংসা

করলেন। এই ভাবে শেষ পর্যন্ত পাঁচ কোটি বছর আগে লুপ্ত হয়ে যাওয়া দুটি বন্য জন্তুর পুরো আকৃতির আভাস ফুটে উঠল। কুভিএর সত্যি সত্যিই কাগজে কলমে ছবি এঁকে জন্তুদুটিকে জনসমক্ষে হাজির করলেন



(ওপরের সারি) অ্যানোপ্লোথেরিয়াম, (নিচের সারি) প্যালিওথেরিয়াম জিপ্‌সাম খনি-অঞ্চল থেকে পাওয়া কয়েক টুকরো ফসিল বিচার করে কুভিএর এই দুটি স্তন্যপায়ীর সম্পূর্ণ আকৃতি গড়ে তুলতে পেরেছিলেন।

শুধু কয়েকটি হাড়ের টুকরো ও ভাঙা দাঁত থেকে পুরো জন্তুটিকে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা এই প্রথম। প্রচেষ্টাটি দুঃসাহসিক নিশ্চয়ই, আশ্চর্যও বটে। কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য, অল্প কিছুদিনের মধ্যে জিপ্‌সাম খনি-অঞ্চল থেকে প্যালিওথেরিয়ামের আস্তো একটি কঙ্কাল আবিষ্কৃত হল এবং দেখা গেল যে সামান্য দু-একটি খুঁটিনাটির ব্যাপার বাদ দিলে কুভিএর-এর আঁকা ছবির সঙ্গে কঙ্কালের হুবহু মিল। প্যারিসের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের প্রদর্শনী কক্ষে আজও কুভিএর-এর আঁকা ছবি ও কঙ্কালটি পাশাপাশি রাখা আছে। আসল ঘটনা যাঁর জানা নেই তিনি নিশ্চয়ই মনে করবেন, কঙ্কালটি দেখেই ছবিটি আঁকা

হয়েছে। এই আশ্চর্য কাণ্ডটি ঘটিয়ে কুভিএর দুটি নতুন বিজ্ঞানের পত্তন করলেন : জীবাশ্মবিদ্যা ও তুলনামূলক শারীরবিদ্যা। কুভিএর-এর প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুসরণ করেই তারপর থেকে ফসিলের নিদর্শন থেকে মেরুদণ্ডী জীবের পূর্ণ অবয়বকে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে।

১৮১১ ও ১৮১৩ সালে কুভিএর-এর পাঁচ খণ্ড রচনাবলী প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে চারটি খণ্ডেই ছিল স্তন্যপায়ীদের সম্পর্কে আলোচনা। তারপরে ১৮২৮ সালে প্রকাশিত হয় মাছের জীবন-কথা, ১৮৩০ সালে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ইতিহাস। ১৮৩২ সালের ১৩ই মে কলেরা রোগে তাঁর মৃত্যু।

কুভিএর নিজে কিন্তু বিশ্বাস করতেন না যে প্রজাতির ক্রম-পরিবর্তন হতে পারে। অথচ তিনি নিজেই এমন সমস্ত প্রজাতির নিদর্শন আবিষ্কার করেছিলেন যারা বহু আগেই পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে। এ-সম্পর্কে তাঁর একটা ব্যাখ্যাও ছিল। সর্বগ্রাসী এক বিপর্যয়ে একসময়ে পৃথিবীব সমস্ত প্রজাতি ধ্বংস হয়েছিল। তারপরে নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে প্রাণী ও উদ্ভিদ। খ্যাতি ও প্রতিপত্তির আসনে দাঁড়িয়ে তিনি কিছুকালের জন্যে এই মতবাদকে প্রতিষ্ঠাও দিতে পেরেছিলেন।

কিন্তু তুলনামূলক শারীরবিদ্যার যে নতুন টেকনিক তিনি প্রবর্তন করে গেলেন তার চর্চা অব্যাহত থাকল এবং তারই ফলে শেষ পর্যন্ত নিঃসংশয়ে স্বীকার করে নিতে হল যে, প্রজাতিরও ক্রম-পরিবর্তন ঘটেছে। এই ক্রম-পরিবর্তনের ধারাকে অনুসরণ করা হল মাছ থেকে উভচর জীব পর্যন্ত, উভচর জীব থেকে সরীসৃপ পর্যন্ত। এ থেকে জানা গেল জীবজগৎ কি-ভাবে মহাদেশ জয় করেছিল। আরো জানা গেল স্তন্যপায়ীরা কি-ভাবে বিশ্বজয়ের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল।

সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ী

কুভিএর-এর পরবর্তী কালের স্বনামখ্যাত জীবাশ্মবিদ ছিলেন স্যার

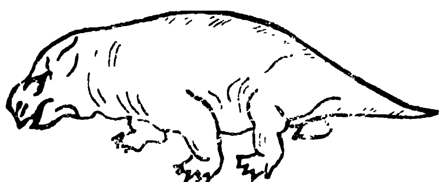
রিচার্ড আওয়েন। তিনিই প্রথম ঘোষণা করেছিলেন যে স্তন্যপায়ীদের সঙ্গে সরীসৃপদের অদ্ভুত একটা যোগসূত্র থেকে গিয়েছে। এ-সিদ্ধান্তে তিনি পোঁছেছিলেন বিশেষ একটি ফসিল পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার পরে। প্রমাণ এমনই অকাট্য ছিল যে সিদ্ধান্তকে কিছুতেই এড়িয়ে যাওয়া চলত না।

রিচার্ড আওয়েনের নাম এই বইয়ে আগেও একবার উল্লিখিত হয়েছে। তিনিই ছিলেন 'ডাইনোসর' শব্দটির উদ্ভাবক। সেটা ছিল ইংরেজি ১৮৪১ সাল, তাঁর বয়স তখন আটত্রিশ বছর। তিনি প্রথমে সাধারণ ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে সাধারণভাবে অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। তারপরে তিনি চিকিৎসা-বিদ্যায় ডিপ্লোমা অর্জন করেছিলেন ও লণ্ডনের রয়েল কলেজ অফ সার্জন্স্-এ অধ্যাপক হয়েছিলেন। এই সময়ে জীবাশ্মবিদ্যা সম্পর্কে তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বিষয়টিকে আশ্রয় করে তাঁর অসাধারণত্ব প্রকাশ পেতে থাকে। মেরুদণ্ডী জীবের, বিশেষ করে সরীসৃপের ফসিল পর্যবেক্ষণে ও বিশ্লেষণে তিনি হয়ে উঠেন বিশেষ পারদর্শী। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মের প্রাণিবৃত্তান্ত বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এই পদটি বিশেষ করে তাঁরই জন্যে তৈরী এবং তিনি নিজের যোগ্যতার প্রমাণও দিয়েছিলেন। প্রাণি-বৃত্তান্ত বিভাগের সুন্দর প্রদর্শনী-কক্ষটি তাঁরই উদ্যোগে রূপায়িত।

১৮৫০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে পাওয়া একটি ফসিল-সরীসৃপ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের জন্যে তাঁর কাছে পাঠানো হয়। এই ফসিলটিকে খুঁটিয়ে বিচার করতে গিয়ে কতকগুলো আশ্চর্য লক্ষণ তাঁর চোখে পড়ে যায়। জীবটির চেহারা সরীসৃপের কিন্তু বৈশিষ্ট্য স্তন্যপায়ীর।

প্রথমেই তিনি লক্ষ্য করলেন যে জীবটির দাঁত অন্য ধরনের। দাঁতের সারিতে ছুঁচলো মুখওলা শ্ব-দাঁত রয়েছে, সঙ্গে অন্যান্য দাঁত যেগুলাকে বলা চলে পেষণ; ছেদন দাঁত বলে কিছু নেই। দাঁতের

সারিতে এই রকমফের, এটা বিশেষ করে স্তন্যপায়ীদেরই বৈশিষ্ট্য—সরীসৃপদের মুখে দাঁত হয়ে থাকে সবই এক রকমের। অন্যদিকে দেখা গেল জীবটির ঠোঁটের গড়ন কোনো কোনো তৃণভোজী সরীসৃপের মতো। তারপরে মাথার খুলির অন্যান্য হাড়ের গড়নে ও বিন্যাসেও তিনি এমন সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পেলেন যা স্তন্যপায়ীদের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। এই বিচিত্র লক্ষণযুক্ত জীবটির নাম তিনি দিলেন ডিসিনোডোন (Dicynodon)। জীবটি আধা-সরীসৃপ, আধা-স্তন্যপায়ী।


ডিসিনোডোন

তারপরে এই একটি মাত্র সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই তিনি সে-সময়ের পক্ষে অত্যন্ত দুঃসাহসিক একটি ঘোষণা করে বসলেন। তিনি বললেন যে স্তন্যপায়ীদের উৎপত্তি অনুসন্ধান করতে হবে সরীসৃপদের মধ্যে।

গত ত্রিশ বছরে উত্তর আমেরিকা, সাইবেরিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় এমন অজস্র ফসিল পাওয়া গিয়েছে যা স্যার আওয়েনের এই উক্তির সপক্ষে নিঃসন্দেহ প্রমাণ। একটি বা দুটি নয়, অজস্র ফসিল, যার মধ্যে সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ীর বিবর্তনের প্রত্যেকটি ধাপ পাঠ করা যেতে পারে। লক্ষণগুলো এমনই যে কিছুতেই জোর করে বলা সম্ভব নয় যে লক্ষণগুলো সরীসৃপের না স্তন্যপায়ীর। বলতে হবে, সরীসৃপও বটে, স্তন্যপায়ীও বটে। অর্থাৎ, দুই-ই। কিন্তু ক্রমেই সরীসৃপ-লক্ষণ অস্পষ্ট হচ্ছে, স্তন্যপায়ী লক্ষণ প্রকট। স্তন্যপায়ীর লক্ষণযুক্ত সরীসৃপ হয়ে উঠেছে সরীসৃপের লক্ষণযুক্ত স্তন্যপায়ী।

প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল আজ থেকে কুড়ি কোটি বছর আগে পার্মিয়ান কালে। সেই সময়েই এই পৃথিবীতে এমন কয়েকটি জীব চলাফেরা করত যারা চেহারায়, স্বভাবে ও অন্য সমস্ত দিকে ছিল সরীসৃপ কিন্তু যাদের শারীরিক গড়নে স্তন্যপায়ীর কিছু কিছু লক্ষণ

প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল। এমনি একটি জীবের নাম দেওয়া হয়েছে ডাইমেট্রোডোন (Dimetrodon)। এই জীবটির পিঠে ছিল একসার কাঁটা আর কাঁটাগুলো একটি পর্দার দ্বারা যুক্ত। মনে হতে পারত জীবটির চলাফেরা যেন পিঠের ওপরে নৌকোর মতো পাল খাটিয়ে। এই মাংসাশী জীবটি অন্য সমস্ত দিক থেকেই সরীসৃপ, শুধু মাথার খুলির কয়েকটি হাড়ের গড়নে নয়। হাড়ের বিশেষ গড়নের মধ্যে স্তন্যপায়ী হবার ঝোঁক দেখা দিয়েছে।

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, ব্যাপারটি এমন এক সময়ে ঘটছিল যখন এমন কি ডাইনোসরদেরও উদ্ভব হয়নি, সেমূরিয়া থেকে সবে সরীসৃপদের বংশবিস্তার ডালপালা মেলতে শুরু করেছিল। তার মানে কথাটা দাঁড়ায় এই যে, প্রকৃতি-রাজ্যে যখন সরীসৃপরাই প্রাণের সফলতম নিদর্শন বলে চিহ্নিত হচ্ছিল, তখনো, যতো অগোচরেই হোক, স্তন্যপায়ী হবার দিকেও একটি পরীক্ষাকার্য পাশাপাশি চলছিল। একথাটা মনে রাখা দরকার যে প্রকৃতি-রাজ্যে অনবরত বিবিধায়ন ঘটছে এবং তার মধ্যে দিয়ে সব সময়েই অজস্র পরীক্ষাকার্য অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। কোনোটি সফল হয়, কোনোটি ব্যর্থ। যেমন, সীলাকন্থ প্রকৃতিরাজ্যের একটি ব্যর্থ পরীক্ষা। আর সফল পরীক্ষার অজস্র নিদর্শন তো চোখের ওপরেই দেখা যাচ্ছে—আমরা নিজেরা তো সফলতম।

যাই হোক, স্তন্যপায়ী হবার দিকে পরীক্ষাকার্যের আরো কয়েকটি নিদর্শনের দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। এমনি আরেকটি জীবের নাম দেওয়া হয়েছে ডাইনোসেফালাস (Dinocephalus)। এই জীবটির মধ্যে এমন দুটি বিশেষ লক্ষণ ফুটে উঠেছিল যা পুরো-পুরি অর্থেই স্তন্যপায়ী-সুলভ। প্রথম লক্ষণটি পায়ে, দ্বিতীয়টি দাঁতে। আমরা জানি, সরীসৃপদের হাঁটার ধরন আর স্তন্যপায়ীদের হাঁটার ধরন এক রকমের নয়। ডাইনোসেফালাসের পায়ের বিন্যাসে এমন পরিবর্তন এসেছিল যে তার হাঁটাটি হয়ে উঠেছিল স্তন্যপায়ী-ধরনের। তেমনি এসেছিল দাঁতের সারিতে বিভিন্নতা।

ছেদন, শ্ব ও পেষণ—এই তিন ধরনের দাঁত স্পষ্টতই ডাইনো-সেফালাসের মুখের মাড়িতে স্থান করে নিতে পেরেছিল। দাঁতের বিভিন্নতা স্তন্যপায়ী জীবেরই বিশেষ লক্ষণ। এমনি দাঁতের বিভিন্নতা একই সময়ের আরো কয়েকটি সরীসৃপের মধ্যে লক্ষ্য করা গিয়েছে।

আরেকটি নিদর্শন আজ থেকে সাড়ে-সতেরো কোটি বছর আগের একটি জীব যার নাম দেওয়া হয়েছে এরিকোলাসের্টা (Ericolacerta)। এই জীবটির দু-বার দাঁত গজাত—একবার দুধে, আরেকবার বয়সের।

আলোচনায় আরো অগ্রসর হবার আগে, দেখা যাক কী কী লক্ষণে স্তন্যপায়ীরা সরীসৃপদের থেকে পৃথক।

সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ীর পার্থক্য

একটি পার্থক্য তো সহজেই চোখে পড়ে। স্তন্যপায়ীদের গায়ে থাকে লোম, সরীসৃপদের গায়ে আঁশ। অপর একটি পার্থক্য সম্পর্কেও হয়তো আমাদের অনেকেরই অভিজ্ঞতা আছে। সরীসৃপ-দের শরীরের তাপমাত্রা পরিবর্তনশীল (এই কারণে সরীসৃপদের বলা হয় ঠাণ্ডা রক্তের জীব), আর স্তন্যপায়ীদের শরীরের তাপমাত্রা স্থির (উষ্ণ রক্তের জীব)। তারপরে দাঁতের কথা। স্তন্যপায়ীদের মুখের মাড়িতে তিন ধরনের দাঁত আছে—কাটবার জন্যে ছেদন, কামড়াবার জন্যে শ্ব, গুঁড়োবার জন্যে পেষণ। তাছাড়া স্তন্যপায়ী-দের দু-বার দাঁত ওঠে—একবার দুধে, আরেকবার বয়সের। সরীসৃপদের মুখে দাঁতের সংখ্যা যদিও অনেক বেশি কিন্তু তা সবই এক ধরনের। তাছাড়া সরীসৃপদের একটি দাঁত নষ্ট হয়ে গেলে সে-জায়গায় আরেকটি দাঁত গজাতে পারে।

এসব ছাড়াও কয়েকটি সূক্ষ্ম ব্যাপারে লক্ষণীয় পার্থক্য অবশ্যই আছে। যেমন, নিচের চোয়ালের গড়নে (স্তন্যপায়ীদের নিচের চোয়ালের গড়ন অনেক বেশি সরল এবং এই কারণে নিচের চোয়াল

নাড়াবার ভঙ্গিও ভিন্নতর)। যেমন, শিরদাঁড়ার ওপরে মুণ্ডুটি খাড়া হয়ে থাকবার কায়দায় (স্তন্যপায়ীরা সবদিকেই স্বচ্ছন্দ ভাবে মুণ্ডু ঘোরাতে পারে)। যেমন, শিরদাঁড়ার বিভক্তিতে (স্তন্য-পায়ীদের শিরদাঁড়া কয়েকটি এলাকায় বিভক্ত), ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো পার্থক্য বাচ্চা হবার পদ্ধতিতে। সরীসৃপ ডিম পেড়েই খালাস। স্তন্য-পায়ীর বাচ্চা বড়ো হয় মায়ের পেটে ভ্রূণ অবস্থায়। এই ভ্রূণটি মায়ের শরীর থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে একটি ফুলের (Placenta) সাহায্যে। এইভাবে মায়ের পেটে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত অবস্থায় থেকে ভ্রূণটি দিনে দিনে পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে এবং পূর্ণাঙ্গ হবার পরেই ভূমিষ্ঠ হয়। স্তন্যপায়ীদের বংশরক্ষা-পদ্ধতি জীবজগতে সবচেয়ে উন্নত ও ত্রুটিহীন। আমরা আগে আলোচনা করেছি, সরীসৃপরা শক্ত খোলাওলা ডিম পাড়ত বলে জলের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছিল। কিন্তু স্তন্যপায়ীরা গর্ভধারণ করে বলে সকল বন্ধন থেকেই মুক্ত। এই কারণে সারা পৃথিবীতেই তাদের আধিপত্য।

তবে স্তন্যপায়ীরা একেবারে সরাসরি বংশরক্ষার এই পদ্ধতিতে উত্তীর্ণ হয়নি। মাঝখানে একটি ধাপ থেকে গিয়েছে। এই ধাপটিকে বলা হয় অঙ্কগর্ভ (Marsupial)। এক্ষেত্রে ভ্রূণ মায়ের পেটে বড়ো হয় না, গর্ভসঞ্চারের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ভ্রূণটি মায়ের পেট থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং মায়ের পেটের নিচের দিকের একটি থলিতে আশ্রয় প্রায়। ভ্রূণটি তখনো পর্যন্ত নিরবয়ব, না আছে চোখ, না হাত-পা, আর হয়তো ইঞ্চিখানেক লম্বা। কিন্তু এই থলিটির ভেতরের দিকে আছে মাতৃরস নিঃসরণের বোঁটা। ভ্রূণ এই বোঁটার গায়ে লেগে থাকে। কয়েক সপ্তাহ বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কয়েক মাস এমনি ভাবে কেটে যায়—ভ্রূণটি হয়ে ওঠে পূর্ণাবয়ব একটি ছানা, তার চোখ ফোটে, থলি থেকে মুখ বাড়িয়ে পিট পিট করে তাকায় ও বাইরের পৃথিবীটা সম্পর্কে একটা ধারণা করে নিতে চেষ্টা করে। আরো কিছুদিন কাটে এই থলির আশ্রয়েই,

তারপরে এই পৃথিবীর শক্ত মাটিতে পা দিয়ে দাঁড়ায়। এমন কি আজকের দিনেও অস্ট্রেলিয়ার কোনো কোনো জীব অঙ্কগর্ভ। স্তন্যপায়ীদের বিবর্তনে একেবারে গোড়ার দিকে স্তন্যপায়ীরা নিশ্চয়ই এই অঙ্কগর্ভ পর্যায়টি পার হয়ে এসেছিল।

আজ থেকে সাত কোটি বছর আগে, টারশিয়ারি কালটির যখন শুরু, স্তন্যপায়ীদের যুগের সূত্রপাত। অঙ্কগর্ভ পর্যায়টি ততোদিনে স্তন্যপায়ীরা পার হয়ে এসেছে। তখন থেকেই স্তন্যপায়ীদের বাচ্চা হবার সময়ে ভ্রূণ বড়ো হয় মায়ের পেটের আশ্রয়ে আর প্ল্যাসেণ্টা বা ফুলের সাহায্যে মায়ের শরীর থেকে পুষ্টিগ্রহণ করে। তখন থেকেই শুরু হয় পৃথিবীতে স্তন্যপায়ীদের আধিপত্য। সরীসৃপরা প্রায় রাতারাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে থাকে। কোনো রকমে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে শুধু কয়েক জাতের গিরগিটি, কচ্ছপ, সাপ ও কুমির। তারপরে একসময়ে যেমন সরীসৃপদের সংখ্যা হু-হু করে বেড়ে গিয়েছিল, তেমনি বাড়তে থাকে স্তন্যপায়ীদের সংখ্যা। পৃথিবীর প্রতিটি আনাচে-কানাচে তারা স্থান করে নেয়, আয়ত্ত করে পৃথিবীর প্রতিটি অংশ। শুধু স্থলভাগ নয়, সমুদ্র ও আকাশও। যে পৃথিবী একসময়ে ছিল সরীসৃপের তাই হয়ে ওঠে স্তন্যপায়ীর। পৃথিবীতে শুরু হয় পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে আশ্চর্য সম্ভবনাপূর্ণ যুগটি।

স্তন্যপায়ীরাও কেউ ছিল মাংসাশী, কেউ তৃণভোজী। আত্মরক্ষার পদ্ধতিও ছিল নানা ধরনের। মাংসাশীদের ছিল লম্বা ও ধারালো শ্ব-দাঁত, তীক্ষ্ণ পেষণ দাঁত, পাঁচটি আঙুলযুক্ত থাবা ও শক্ত শক্ত নখর। তৃণভোজীদের ছিল তীক্ষ্ণ ছেদন দাঁত ও চর্বণ করবার জন্যে পেষণ দাঁত। আর ছিল লিকলিকে লম্বা পা যার সাহায্যে আক্রমণকারীকে ফাঁকি দিয়ে নিরাপদ জায়গায় পালিয়ে যাওয়া চলত। অর্থাৎ, আত্মরক্ষার জন্যে আক্রমণ করা বা পলায়ন করা—শরীরের অস্ত্রসজ্জা বুঝে হয় প্রথমটি, নয় দ্বিতীয়টি। কিন্তু স্তন্যপায়ীদের মধ্যে আরো একটি তৃতীয় দলের উদ্ভব হয়েছিল

যাদের শরীরে আক্রমণ বা পলায়নের উপযোগী স্বাভাবিক কোনো অস্ত্রসজ্জা ছিল না। না ধারালো দাঁত, না থাবা, না নখর, না লিকলিকে লম্বা পা। কিন্তু এই তৃতীয় দলটিই স্তন্যপায়ীদের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল। তার কারণ, এই তৃতীয় দলটি লাভ করেছিল উন্নততর মস্তিষ্ক। এই দলটির নাম দেওয়া হয়েছে প্রাইমেট। বইয়ের শুরুতেই আমরা এদের সম্পর্কে আলোচনা করেছি।* জীবজগতের ইতিহাসে এই প্রথম একদল জীব পাওয়া যাচ্ছে, যাদের শরীর এমনিতে টিকে থাকার সংগ্রামে জয়লাভ করার পক্ষে সমস্ত দিক থেকেই অনুপযোগী, যাদের শরীর না আক্রমণের উপযুক্ত না পলায়নের--কিন্তু যাদের মস্তিষ্ক ছিল খুবই উন্নত। দেখা গেল, এই মস্তিষ্কের জোরেই প্রাইমেটরা কৃত্রিম হাতিয়ার তৈরি করতে পেরেছে ও টিকে থাকার সংগ্রামে বড়ো রকমের জয়লাভ করেছে। প্রাইমেটদের যা কিছু শ্রী ও সমৃদ্ধি সবই এই মস্তিষ্কের জোরে। আর এই মস্তিষ্কের জোর যে কত বড়ো জোর তার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত প্রাইমেটদের মধ্যে শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত জীব মানুষ।

স্তন্যপায়ীদের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

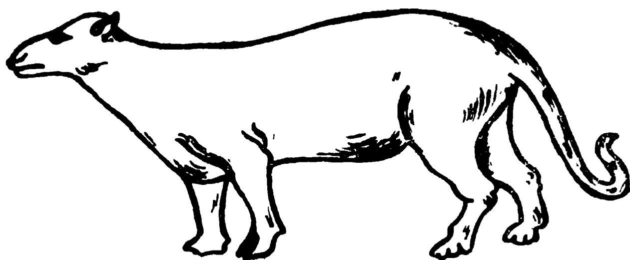
স্তন্যপায়ীদের বৈশিষ্ট্য

প্রথমে আমরা তাকাব ঘোড়ার দিকে। স্তন্যপায়ীদের বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় ঘোড়া একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত।

বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে যদি সময়ের দিক থেকে ক্রমেই পিছিয়ে যাওয়া যায় তাহলে একালের ঘোড়ার একেবারে আদিতে দেখতে পাওয়া যাবে শেয়ালের মতো আকারের ছোট্ট একটি জীব, যার

*বিস্তৃততর আলোচনার জন্যে কৌতূহলী পাঠকরা 'মানুষের ঠিকানা' বইটি পড়তে পারেন।

নাম দেওয়া হয়েছে ফেনাকোডাস (Phenacodus)। আজ থেকে সাত কোটি বছর আগে এই জীবটিকে পৃথিবীতে বিচরণ করতে

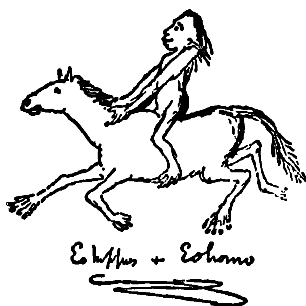


ফেনাকোডাস

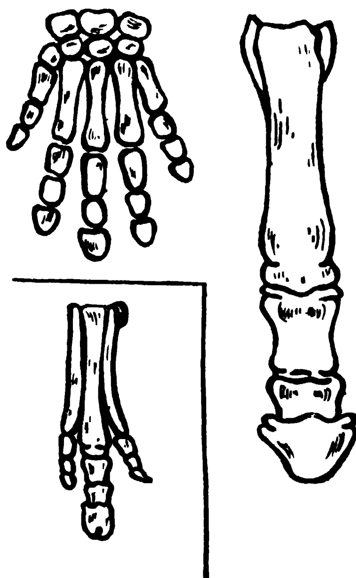
দেখা যেতে পারত। ছুঁচলো মুখ, লম্বা লেজ ও বেঁটে বেঁটে পা। প্রত্যেক পায়ে খুরওলা পাঁচটি আঙুল। দাঁতের বিন্যাস অতি সরল। এই অতি নিরীহ ও সরল চেহারার জীবটি অতি বিচিত্র বংশবিস্তার করেছে। ঘোড়া, গণ্ডার, হাতি, শুয়োর ও বরাহ এই জীবটি থেকেই উদ্ভূত। গো, জিরাফ, উট, মৃগ ও ভেড়া জাতীয় প্রাণীরাও এই জীবটি থেকেই জন্মেছে। স্তন্যপায়ীদের বিবর্তনের ইতিহাসে ফেনাকোডাস একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নাম। সাত কোটি বছর আগে এই জীবটিকে আশ্রয় করেই স্তন্যপায়ী জগতের বিপুল বিস্তার মূর্ত হয়ে উঠতে চাইছিল।

সত্যিকারের ঘোড়ার আদি রূপটির সাক্ষাৎ পাবার জন্যে আমাদের এসে দাঁড়াতে হবে আরো এক কোটি বছর পরে ইওসিন কালের শুরুতে। এই আদি ঘোড়াটির নাম দেওয়া হয়েছে ইওহিপ্পাস (Eohippus)। জীবটি অবশ্যই তৃণজীবী, তার পায়ের পাঁচটির জায়গায় আঙুল রয়েছে চারটি আর ছুটতেও খুব পটু। আরও কিছুকাল পরে ওলিগোসিন কালের শুরুতে এসে দেখা যাবে, ইওহিপ্পাস হয়ে উঠেছে মেসোহিপ্পাস (Mesohippus), যার পায়ে মাত্র তিনটি করে আঙুল আর এই তিনটি

আঙুলেরও মাত্র মাঝখানেরটি ব্যবহার করে জীবটি প্রচণ্ড বেগে ছুট দিতে পারে। একালের ঘোড়ার পায়ে সারা অংশ জুড়ে আছে এই মাঝখানের আঙুলটিই। অন্য দুটি আঙুলের অস্তিত্বই লোপ পেয়েছে বলা চলে। একেবারে কব্জির ওপরের দিকে দু-টুকরো হাড়ের উদ্বৃত্ত অংশে এই দুটি আঙুলের আভাস মাত্র পাওয়া যেতে পারে। ইতিমধ্যে যে সময়ে ঘোড়ার পায়ের আঙুলের সংখ্যা কমছিল। তখন অন্যদিকে পরিবর্তন হচ্ছিল ঘোড়ার দাঁতের গড়নেও। পেষণ দাঁতগুলো হয়ে উঠছিল আরো লম্বা, আরো মোটা ও আরো সক্ষম। এইভাবেই একটু একটু করে পরিবর্তন হতে হতে



ইওহিপ্পাস ও ইওহোমো। টি. এইচ. হাক্সলে অঙ্কিত একটি কাল্পনিক ছবি। বলা বাহুল্য, ইওহোমো বা আদি মানুষ ইওহিপ্পাস বা আদি ঘোড়ার পাঁচ কোটি বছর পরে পৃথিবীতে এসেছে।



ঘোড়ার ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পায়ের আঙুলের সংখ্যাও কমেছে। (বাঁদিকে ওপরে) ফেনাকোডাস, (বাঁদিকে নিচে) মেসোহিপ্পাস, (ডান দিকে) আধুনিক কালের ঘোড়ার পায়ের আঙুল।

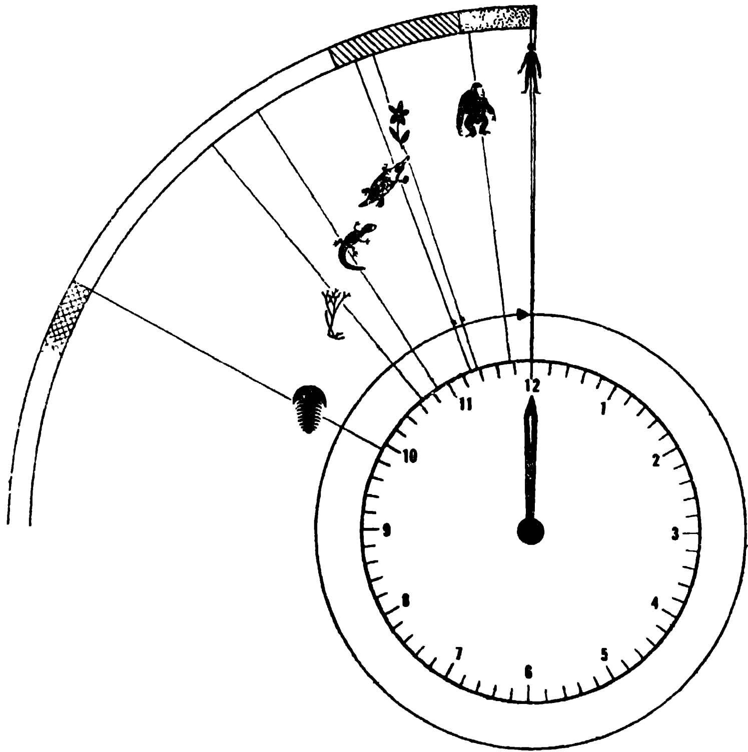
আধুনিক ঘোড়ার আবির্ভাব। পায়ের ও দাঁতের পরিবর্তন লক্ষ্য করতে করতে এমনি ভাবে একে একে পাওয়া যাবে গাধা, জেব্রা, গণ্ডার, হাতি, শুয়োর, গোরু-মহিষ, জিরাফ, উট, হরিণ ও ছাগল-ভেড়া। ফেনাডোকাসের বিবিধায়ন ঘটতে ঘটতে কত বিচিত্র জীবই না সৃষ্টি হয়েছে!

মাংসাশী স্তন্যপায়ীদের আদিতেও নিশ্চয়ই ফেনাডোকাস ধরনের কোনো একটি জীবের অস্তিত্ব রয়েছে। তারপরে বিবর্তনের ধারাটি অনুসরণ করলে দেখা যাবে, পায়ের খুর রূপান্তরিত হচ্ছে নখরে, দাঁতের গড়ন হয়ে উঠেছে মাংসাশী জীবদের মতো। তারপরে একে একে সামনে এসে দাঁড়াবে আমাদের পরিচিত কয়েকটি জন্তু—বেড়াল, বাঘ, সিংহ, প্যান্থার, জাগুয়ার ইত্যাদি।

এমনি ভাবেই কতকগুলো আদি স্তন্যপায়ীর বিবিধায়ন ঘটতে ঘটতে পাওয়া গিয়েছে উড়ন্ত স্তন্যপায়ী বাদুড় ও সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী তিমি জাতীয় জীব। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই জীববিজ্ঞানীরা অবশ্য এখনো পর্যন্ত আদি রূপটি আবিষ্কার করতে পারেননি। কিন্তু এটুকু আমরা ধরে নিতে পারি, অন্যান্য ক্ষেত্রে জীবজগতের যে বিবর্তনকে আবিষ্কার ও প্রমাণ করা গিয়েছে, অনাবিষ্কৃত ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবার কোনো কারণ নেই।

আজকের দিনে স্তন্যপায়ীদের জগতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রয়েছে প্রাইমেটরা। শ্রেষ্ঠতম স্থানে মানুষ। কিন্তু জীবজগতের সামগ্রিক বিবর্তনকে চোখের সামনে ধরলে দেখা যাবে, মানুষ নিতান্তই এ-মুহূর্তের জীব। মানুষের পেছনে রয়েছে প্রায় দু-শো কোটি বছরের বিবর্তনের ধারা—সরল থেকে জটিল, এক থেকে বহুর দিকে জীবের বিবিধায়ন এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের অমোঘ নিয়মে বিশেষ বিশেষ জীবের টিকে থাকা ও বংশবিস্তার করা। মানুষ জীবজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়—দুশো কোটি বছরের সরলতম থেকে জটিলতম পর্যন্ত প্রত্যেকটি জীবের সঙ্গে তার আত্মীয়তা। এই জীবজগৎ একই প্রাণের অতি বিচিত্র এক প্রকাশ।

চার্লস ডারউইন ১৮৭১ সালে প্রকাশিত তাঁর 'মানুষের উদ্ভব' (The Descent of Man) গ্রন্থে বলেছেন, "মানুষের মধ্যে মহৎ গুণাবলী প্রকাশ পেয়েছে। তার সহানুভূতি হীনতমেরও প্রতি, তার সহৃদয়তা



ঘড়ির বারো ঘণ্টার হিসেবে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রাণীর আবির্ভাবের সময় দেখানো হয়েছে। আমরা ধরে নিচ্ছি পৃথিবীতে আদি প্রাণের উদ্ভব হয়েছিল বারোটা বেজে এক সেকেণ্ডে। ঘড়িতে দেখা যাবে, প্রায় দশটা পর্যন্ত প্রাণের বিবর্তনে ফসিলের কোনো চিহ্ন নেই। ঘড়ির বাইরের দিকে যে স্কেলটি আঁকা হয়েছে তার সাহায্যে বোঝানো হয়েছে বিভিন্ন যুগ। আড়াআড়ি কাটা-চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়েছে পুরাজীবীয় যুগের আগের যুগকে (Proterozoic)। সাদা অংশে পুরাজীবীয় যুগ। একসারি লাইন টানা অংশে মধ্যজীবীয় যুগ। ফুট্‌কি দেওয়া অংশে টারশিয়ারী কাল। আর বারোটা বাজার ঠিক আগের কালো অংশে কোয়াটারনারি কাল, যখন এই পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব।

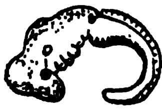
শুধু অন্য মানুষের প্রতিই নয় দীনতম জীবেরও প্রতি, তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি ঈশ্বরের মতো যার সাহায্যে এই সৌরজগতের গতিপ্রকৃতিকেও সে অনুধাবন করেছে—সব মিলিয়ে উচ্চতম ক্ষমতার শীর্ষে সে অধিষ্ঠিত। তবুও, আমি যতোটুকু বুঝতে পেরেছি, একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে মানুষের শরীরের কাঠামোর মধ্যেই থেকে গিয়েছে হীনাবস্থা থেকে তার উদ্ভবের দুরপনেয় চিহ্ন।"

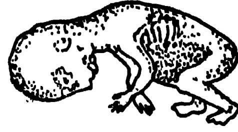
বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী সার জুলিয়ান হাক্সলে বলেছেন, "দু-বছরের একটি শিশুর পক্ষেও বলা সম্ভব একটি শুয়োর ও একটি মানুষের মধ্যে কোন্‌টি শুয়োর কোন্‌টি মানুষ, একটি মুরগি ও একটি বানরের মধ্যে কোন্‌টি মুরগি কোন্‌টি বানর, একটি হাতি ও একটি সাপের মধ্যে কোন্‌টি হাতি কোন্‌টি সাপ···কিন্তু এই জীবগুলো যখন ভ্রূণ অবস্থায় থাকে তখন তাদের আকৃতির মধ্যে এমনই সাদৃশ্য যে, সাধারণ মানুষের কথা বাদ দেওয়া থাক, সাধারণ একজন জীব-বিজ্ঞানীও বলতে পারবেন না কোন্‌টি কোন্ জীব।"

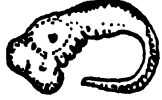
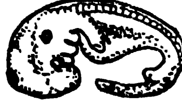
এই আকৃতিগত সাদৃশ্যের একটি ছবিও এখানে উপস্থিত করা যেতে পারে (পরের পৃষ্ঠায়)।

আটটি জীবের ভ্রূণাবস্থার তিনটি পর্ব দেখানো হয়েছে। প্রথম পর্বে মাছ থেকে মানুষ পর্যন্ত সকলেরই প্রায় একই আকৃতি—কোন্‌টি কোন্ জীব বলা শক্ত। দ্বিতীয় পর্বে দেখা যাচ্ছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আভাস ও পার্থক্যের সূচনা। তৃতীয় পর্বে প্রত্যেকে আপন আপন বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে এবং একটি থেকে অপরটির পার্থক্য খুবই স্পষ্ট।

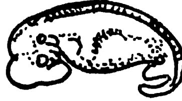
এইভাবে, হীনাবস্থা থেকে তার উদ্ভবের দুরপনেয় চিহ্ন ধারণ করেই মানুষের জন্ম। তার মানে কিন্তু এই নয় যে মানুষের এই জন্ম-লক্ষণের মধ্যে গত দুশো কোটি বছরের প্রাণের বিবর্তনের সম্পূর্ণ রূপটি ধাপে ধাপে প্রকাশ পায়। তা কিছুতেই নয়। যেটুকু প্রকাশ পায় তা পেছনে ফেলে আসা ইতিহাসের কয়েকটি চিহ্ন মাত্র, বিবর্তনের কয়েকটি ধাপের নিসংশয় আভাস।





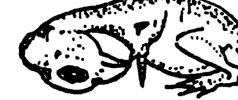










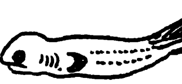







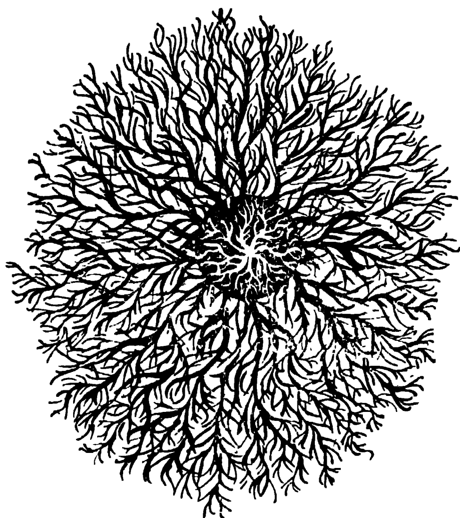





১ ২ ৩

চিত্রে আটটি মেরুদণ্ডী প্রাণীর জন্মকালীন তিনটি পর্যায় দেখানো হয়েছে। 1 চিহ্নিত সারিতে দেখা যাবে প্রাণী বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও ভ্রূণের আকৃতিতে বিশেষ বৈসাদৃশ্য নেই। 2 চিহ্নিত সারিতে দেখা যাবে ভ্রূণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সৃষ্টি হচ্ছে। এই পর্যায়ে মাছ ও গিরগিটির আকৃতি অন্যান্য ভ্রূণ থেকে স্পষ্টতই পৃথক। 3 চিহ্নিত সারিতে প্রত্যেকটি প্রাণীকেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে চেনা যাচ্ছে।



যুগে-যুগে কালে-কালে

অণুপরমাণু অসীম দেশে কালে
বানিয়েছে আপন আপন নাচের চক্র,
নাচছে সেই সীমায় সীমায়,
গড়ে তুলছে অসংখ্য রূপ।

'অরিজিন অফ স্পিসিস' গ্রন্থের শেষ অনুচ্ছেদে ডারউইন প্রায় কবিতার মতো করে তাঁর বৃহৎ গ্রন্থের মূল বক্তব্যটিকে তুলে ধরেছেন। তিনি একটি নদীতীরের দৃশ্য কল্পনা করেছেন যেখানে রয়েছে ঘন গাছপালা, ঝোপঝাড়, শ্যাওলা ও তৃণভূমি। ঝোপে বসে পাখিরা গান গাইছে, কীটপতঙ্গ ফুরফুর করে উড়ে বেড়াচ্ছে, পোকামাকড় ভিজে মাটির ওপরে চলাফেরা করছে। যে নিয়মের জগতে আমাদের বাস, তারই অবশ্যম্ভাবী ক্রিয়ায় এই বিচিত্র প্রকাশ। যা কিছু দেখা যাচ্ছে তার প্রত্যেকটির রূপায়ণে বিপুল এক আয়োজন। এমনিতে মনে হয় কারও সঙ্গে কারও কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ জটিল এক সূত্রবন্ধনে প্রত্যেকের ওপরে প্রত্যেকের নির্ভরশীলতা। এইভাবে পটভূমিটিকে স্পষ্ট করার পরে ডারউইন নিয়মের জগতের নিয়মগুলোকে খুব মোটা মোটা দাগে তুলে ধরেছেন। জীবের

জন্ম ও বৃদ্ধি, সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কিছু গুণাবলী। যে অবস্থার মধ্যে জীবন, তারই প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ক্রিয়ায় জীবের বিবিধায়ন। জীবের সংখ্যাবৃদ্ধি ও অস্তিত্ব বজায় রাখার সংগ্রাম, যার অনিবার্য ফল প্রাকৃতিক নির্বাচন। পরিণামে নানা লক্ষণের সমাবেশ ও অপেক্ষাকৃত অনুপযুক্তের অবলুপ্তি। এই জীবন-যুদ্ধ, এই দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু, এ থেকেই সাধিত হয় মহৎ এক উদ্দেশ্য—উচ্চতর জীবের সৃষ্টি। এ থেকে উপলব্ধি করা যায়—কী মহিমান্বিত এই জীবন, কী সম্ভবনাপূর্ণ। পৃথিবী নামক গ্রহটি মাধ্যাকর্ষণের অমোঘ নিয়মে আবর্তিত হয়ে চলেছে আর সেই সঙ্গে চলেছে প্রাণের অপরিশেষ রূপায়ণ, যে-প্রাণ আদিতে ছিল একটি বা দুটি সরলতম রূপ মাত্র। প্রাণের এই উৎসবটিই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর ও সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা।

এই হচ্ছে ডারউইনের বিখ্যাত গ্রন্থের ততোধিক বিখ্যাত শেষতম অনুচ্ছেদ। এই অনুচ্ছেদে এ-কথাটি স্পষ্ট হয়েছে যে পৃথিবীর এই সবচেয়ে সুন্দর ও সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনার ব্যাপ্তি একটি বিশেষ যুগে নয়, একটি বিশেষ কালে নয়। তার ব্যাপ্তি যুগে-যুগে, কালে-কালে। আমরা এতক্ষণ কিছুটা এলোমেলো ভাবে দুটি যুগের ও কয়েকটি কালের পরিচয় নিতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু এই সামান্য পরিচয় থেকেই কয়েকটি সূত্র এবং অন্য যুগের ও কালের কিছুটা আভাস আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে।

আলোচনায় আরো অগ্রসর হবার আগে যুগের ও কালের পরিসরে প্রাণের রূপায়ণের পর্বগুলোকে একবার চোখের সামনে তুলে ধরা দরকার।

ক্যাম্ব্রিয়ান

এই কালটির নামকরণ ওয়েল্‌স্‌ থেকে, বা আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে ওয়েল্‌স্‌-এর রোমান নাম ক্যাম্ব্রিয়া থেকে। কালটির শুরু আজ থেকে পঞ্চাশ কোটি বছর আগে।

ক্যামব্রিয়ান কালে এসে দাঁড়ালে দেখতে পাওয়া যাবে, আজকের দিনের মোটামুটি সকল দলের অমেরুদণ্ডী জীবের অস্তিত্ব তখনো রয়েছে। বলা বাহুল্য, সেই সঙ্গে এমন কিছু অমেরুদণ্ডী জীবও রয়েছে যাদের অস্তিত্ব পরবর্তী কালে লোপ পেয়েছিল এবং আজকের দিনে যাদের আর দেখতে পাওয়া যায় না।

উদ্ভিদরাজ্যের দিকে তাকালে ক্যামব্রিয়াম কালে দেখতে পাওয়া যাবে শুধু সামুদ্রিক শ্যাওলা।

ক্যামব্রিয়ান কালের যে-সমস্ত ফসিল পাওয়া গিয়েছে তার প্রায় অর্ধেকই ট্রাইলোবাইট্-এর (Trilobite)। বোঝা যাচ্ছে, ক্যামব্রিয়ান কালের জীবদের মধ্যে ট্রাইলোবাইটদের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশি। এখন আর এদের কোনো অস্তিত্ব নেই। ফসিল থেকে ট্রাইলোবাইটের চেহারা সম্পর্কে খানিকটা অনুমান করতে পারা গিয়েছে। চওড়া ও কিছুটা গোল মাথা, যার দু-দিকে পাতের মতো দুটি অংশ। শরীরটি অংশে অংশে ভাগ করা, প্রতিটি অংশে একজোড়া করে পা। বলা বাহুল্য, ট্রাইলোবাইট ছিল নানা ধরনেব। চেহারাব দিক থেকেও সবার মধ্যে মিল ছিল না। আজ পর্যন্ত যতো প্রজাতির ট্রাইলোবাইট পাওয়া গিয়েছে তাদের সংখ্যা হাজারেরও বেশি। কারও চোখ ছিল, কারও ছিল না। কিন্তু সকলেই চলতে পারত, অনেকেই সাঁতার দিতে পারত। শরীরের অংশ কারও ছিল মাত্র দুটি, কারও চল্লিশটিরও বেশি। সাধারণ ট্রাইলোবাইটরা লম্বায় হত এক থেকে তিন ইঞ্চি। তবে সিকি ইঞ্চি লম্বা ট্রাইলোবাইটের যেমন অভাব ছিল না, তেমনি অভাব ছিল না দু-ফুট লম্বা ট্রাইলোবাইটের।

ট্রাইলোবাইটদের সঙ্গে অন্যান্য জীবও অবশ্যই ছিল, ফসিলের নিদর্শন থেকে যাদের সম্পর্কে কিছু কিছু খবরও সংগ্রহ হয়েছে। ছিল নানা ধরনের জেলিমাছ, তারামাছ, স্পঞ্জ, পোকামাকড় ইত্যাদি। ক্যামব্রিয়ান কালের সমুদ্রের দিকে তাকালে এই জীবগুলোকে দেখা যেতে পারত। কেউ সাঁতার কাটছে, কেউ ভাসছে, কেউ

কাদামাটির মধ্যে গর্ত করছে। তবে সব মিলিয়ে দৃশ্যটি খুব মনোরম নয়। গাছপালার চিহ্নমাত্র নেই। ঘাসের একটি শীষও নয়। না পাখির গান, না জন্তুজানোয়ারের হুংকার-- শুধু সমুদ্র আর সমুদ্র। আর এই বিপুল সমুদ্রকে আশ্রয় করছে যে জীবজগৎ তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

তবে এই অকিঞ্চিৎকর জীবজগতেও তিনটি স্পষ্ট লক্ষণ ফুটে উঠেছিল। এই লক্ষণ বিচার করে ক্যামব্রিয়ান কালের জীবজগতকে তিনটি ভাগে ভাগ করা চলে: (১) উদ্ভিদ, যারা সূর্যের আলোর সাহায্যে নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরি করে নিত, (২) প্রাণী, যারা উদরসাৎ করত তৈরি-করা খাদ্য—অর্থাৎ উদ্ভিদ বা অন্য প্রাণী, (৩) জীবাণু, যারা নিজস্ব ধরনে বেঁচে থাকত। ক্যামব্রিয়ান কালের এগারো কোটি বছর ধরে এই তিনটি লক্ষণকে আশ্রয় করে প্রধান প্রধান সকল অমেরুদণ্ডী জীবেরই আবির্ভাব হয়েছিল। পৃথিবীতে মেরুদণ্ডী প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল তারপরের সাড়ে-তিন কোটি বছরের মধ্যে। ডাঙ্গার গাছপালা জন্মেছিল তারপরের আরো পাঁচ কোটি বছরের মধ্যে। তার মানে, ক্যামব্রিয়ান কাল শেষ হবার পরেও সাড়ে-আট কোটি বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল জীবজগতের মোটামুটি বিন্যাসটি পাবার জন্যে।

অর্ডোভিসিয়ান

অর্ডোভিসিয়ান কালটির শুরু আজ থেকে উনচল্লিশ কোটি বছর আগে। কালের নামকরণ ওয়েল্‌স্‌-নিবাসী একদল উপজাতি থেকে। ওয়েল্‌স্‌-এর এই বিশেষ অঞ্চলেই অর্ডোভিসিয়ান কালের শিলার প্রথম আবিষ্কার। এই কালের ব্যাপ্তি পাঁচ কোটি বছর।

ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে, অর্ডোভিসিয়ান কালে সমুদ্র বারবার সরে গিয়েছিল, বারবার এগিয়ে এসেছিল। কোথাও কোথাও সমুদ্র ছিল খুবই অগভীর ও উষ্ণ। এই অগভীর ও উষ্ণ সমুদ্র হয়ে উঠেছিল অজস্র প্রাণের আশ্রয়।

সম্ভবত এই সময়েই জীবজগৎ ছড়িয়ে পড়েছিল সমুদ্র থেকে হ্রদে ও জলাভূমিতে। নতুন নতুন প্রজাতির অমেরুদণ্ডী জীবের আবির্ভাব হয়েছিল। ট্রাইলোবাইটরাও অবশ্যই ছিল। শরীরে শক্ত খোলস ও গ্রন্থিযুক্ত পা থাকার জন্যে এই ট্রাইলোবাইটরাই হয়ে উঠেছিল সে-সময়ের সবচেয়ে উন্নত জীব।

এই অর্ডোভিসিয়ান কালেই অন্যদিকে জীবের শরীরে মস্ত একটি লক্ষণ ফুটে উঠেছিল। তা হচ্ছে জীবের শরীরের মেরুদণ্ড। এতকাল নরম তুলতুলে শরীরের ওপরে শক্ত একটা খোলস থাকাই ছিল উন্নতির চিহ্ন। কিন্তু মেরুদণ্ডী জীবরা প্রমাণ দিতে পেরেছিল, শরীরের বাইরের দিকে শক্ত একটি আবরণ থাকার চেয়ে শরীরের ভেতরের দিকে ঋজু একটি দণ্ড থাকা অনেক বেশি কাজের।

মেরুদণ্ডীদের উদ্ভব কোন্ অমেরুদণ্ডী জীব থেকে—এ বিষয়ে জীববিজ্ঞানীরা অনেক দিন থেকেই তর্ক করে আসছেন। তর্কের কোনো মীমাংসা এখনো হয়নি। তবে বিজ্ঞানীরা এ-বিষয়ে একমত যে এই অর্ডোভিসিয়ান কালেই মেরুদণ্ডী জীবের প্রথম উদ্ভব। মেরুদণ্ডী জীবের সবচেয়ে গোড়ার যুগের ফসিল পাওয়া গিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোলোরাডো অঞ্চল থেকে। জীববিজ্ঞানীরা এই মেরুদণ্ডী জীবের নাম দিয়েছেন অস্ট্রাকোডার্ম।

অস্ট্রাকোডার্মের চেহারা ছিল মাছের মতো। কারও কারও সামনের দিকে ছিল শক্ত হাড়ের আবরণ, শরীর ছিল আঁশে ঢাকা। কিন্তু বাইরের চেহারা মাছের মতো হলেও শরীরের গড়ন পুরোপুরি মাছের নয়। অস্ট্রাকোডার্মের চোয়াল বলে কোনো বস্তু ছিল না—কাজেই সাধারণ মাছের মতো ঠুকরে খাবার খাওয়া অস্ট্রা-কোডার্মের পক্ষে অসম্ভব ছিল। শরীরের পুষ্টির জন্যে সম্ভবত এই জীবগুলো কান্‌কোর সাহায্যে জল থেকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাদ্যকণা ছেঁকে বার করে নিতে পারত।

বিবর্তনের দিক থেকে বিচার করলে মেরুদণ্ডী জীবরা অবশ্যই অমেরুদণ্ডীদের তুলনায় মস্ত একধাপ অগ্রগতি। কিন্তু এই অগ্রগতি

আচমকা নিশ্চয়ই নয়—তার মধ্যেও অনেকগুলো পর্ব আছে। জীববিজ্ঞানীরা অবশ্য এমন কোনো ফসিল খুঁজে পাননি যা থেকে এই পর্বগুলো সম্পর্কে জানা যায়। তবে অমেরুদণ্ডীদের মধ্যে এমন কিছু কিছু নমুনা এখনো আছে যাদের দেখে মেরুদণ্ডীদের অমেরুদণ্ডী পূর্বপুরুষ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা হতে পারে।

তাহলে মোট কথাটা দাঁড়াল এই যে অর্ডোভিসিয়ান কালে জীবন যদিও জলের এলাকাতেই আবদ্ধ ছিল কিন্তু তারই মধ্যে সম্ভাবনা ঘটল মেরুদণ্ডী জীবের।

সিলিউরিয়ান

এই কালটির শুরু আজ থেকে চৌত্রিশ কোটি বছর আগে। নামকরণ ওয়েল্‌স্‌এর একদল উপজাতির নাম থেকে, যেখানে এই কালের শিলা প্রথম পাওয়া গিয়েছিল।

জীবজগতের চেহারা মোটামুটি অর্ডোভিসিয়ান কালের মতোই। জীবের একমাত্র আশ্রয় তখনো পর্যন্ত সমুদ্র—ডাঙ্গার জমিতে জীবনের চিহ্নমাত্র নেই।

সিলিউরিয়ান কালের সমুদ্রে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যেত বিছের মতো একজাতের জীব, যাদের নাম দেওয়া হয়েছে ইউরিপটেরিড্‌স্‌ (Eurypterids)। সম্ভবত ক্যাম্‌ব্রিয়ান কালের সমুদ্রেও এই জীবগুলোর অস্তিত্ব ছিল কিন্তু এতখানি প্রতাপ ছিল না। জলের মধ্যে দিয়ে এরা অতি দ্রুত সাঁতার কাটতে পারত এবং ন-ফুট পর্যন্ত লম্বা হত। আজকের দিনের বিছে মাকড়সা ইত্যাদি ধরনের জীবদের এরাই ছিল পূর্বপুরুষ। তবে ইউরিপটেরিডস্‌দের অস্তিত্ব পরের দশ কোটি বছরের মধ্যেই লোপ পেয়েছিল।

সিলিউরিয়ান কালের সমুদ্রে আরো লক্ষ্য করা যেত, আদিম মেরুদণ্ডী জীব অস্‌ট্রাকোডার্মেরও সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্ভবত এই সিলিউরিয়ান কালেই উদ্ভূত হয়েছিল প্রথম সত্যিকারের মাছ,

যাদের নাম দেওয়া হয়েছে প্লেকোডার্ম (Placoderm)। এই প্লেকোডার্মদের দাঁতওলা চোয়াল ছিল।

তবে জীবজগতে সিলিউরিয়ান কালটি চিহ্নিত হয়ে আছে অপর একটি স্মরণীয় কৃতিত্বের জন্যে। এই কালেই জীবনের অভিযান শুরু হয়েছিল সমুদ্রের এলাকা ছেড়ে ডাঙ্গার এলাকায়। অভিযানের নেতৃত্ব করেছিল উদ্ভিদ।

উদ্ভিদকে অনুসরণ করে সম্ভবত এই সিলিউরিয়ান কালেই একধরনের বিছেজাতীয় জীব জল থেকে ডাঙায় উঠে এসেছিল।

উদ্ভিদের পক্ষে সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে ডাঙ্গায় উঠে আসাটা খুবই সহজ। কিন্তু ঢেউ সরে যাবার পরে শুকনো জমিতে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাটা তেমনি খুবই শক্ত। এজন্যে অনেকগুলো প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়া দরকার। প্রথমত চাই জল। এই জল পাওয়া যেতে পারে মাটির তলা থেকে আর সেজন্যে চাই শেকড়। তারপরে চাই এমন একটি ব্যবস্থা যার ফলে শেকড়ের সাহায্যে টেনে নেওয়া জল উদ্ভিদের শরীরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে। তারপরে চাই বাতাস থেকে খাদ্যগ্রহণের ব্যবস্থা। আর সবশেষে অবশ্যই চাই মাটির আশ্রয়।

সিলিউরিয়ান কালের ফসিল থেকে ডাঙ্গার উদ্ভিদের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে ডাঙার শুকনো জমিতে উদ্ভিদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সবকটি ব্যবস্থাই সম্ভবপর হয়েছিল।

ডেভোনিয়ান

ডেভোনিয়ান কালটির শুরু আজ থেকে বত্রিশ কোটি বছর আগে এবং স্থায়িত্ব চারকোটি বছর। এই বিশেষ কালের শিলাস্তর প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল ইংলণ্ডের ডেভন্-এ। জায়গার নাম থেকেই কালের নাম।

এই ডেভোনিয়ান কালে পৃথিবীর উপরিতলে বা ভূত্বকে বড়ো

রকমের ওলোটপালেট ঘটেছিল। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর একটি নতুন চেহারা ফুটে উঠছিল। ভূত্বকে ভাঁজ পড়ার ফলে বহু সমুদ্র হয়ে উঠছিল পর্বত, বহু শুকনো জমি হয়ে উঠছিল সমুদ্র।

আবহাওয়া ক্রমেই হয়ে উঠছিল আরো শুষ্ক। বিস্তৃত হ্রদের এলাকাগুলো কখনো একেবারে শুকিয়ে যাচ্ছিল, কখনো বা হয়ে উঠছিল জলাভূমির মতো। এক কথায়, ডেভোনিয়ান কালের পরিবেশটি ছিল দ্রুত পরিবর্তনশীল। এ-অবস্থায় জলের জীবনে অভ্যস্ত জীবদের পক্ষেও প্রাণধারণ করাটা হয়ে উঠেছিল খুবই দুরূহ। ডেভোনিয়ান কালের এই অস্থির পরিবেশের সঙ্গে সবচেয়ে ভালোভাবে নিজেদের খাপ খাইয়ে চলতে পেরেছিল মেরুদণ্ডী জীব মাছ। এই কারণে ডেভোনিয়ানকে অনেক সময়ে বলা হয়ে থাকে মৎস্য যুগ। মাছের সবকটি প্রধান প্রধান শাখারই উদ্ভব হয়েছিল এই সময়ে।

আবার, এই ডেভোনিয়ান কালেই পাওয়া গিয়েছিল প্রথম ডাঙ্গার উদ্ভিদের সাক্ষ্য, যা ছিল পুরোপুরি অর্থেই ডাঙ্গার উদ্ভিদ, যার মধ্যে পাওয়া যেত সত্যিকারের শেকড় কাণ্ড ও পাতা।

কার্বনিফেরাস

কার্বনিফেরাস কালের শুরু আজ থেকে আঠাশ কোটি বছর আগে। এই কালেও ভূপৃষ্ঠের চেহারায় অবশ্যই অদল-বদল ঘটেছিল—কিন্তু এর আগের বা পরের কালের মতো তেমন প্রবলভাবে নয়। এই অদল-বদল ঘটেছিল ছ-কোটি বছর ধরে অতি ধীরে ধীরে। একদিকে ভূপৃষ্ঠের বিস্তৃত এলাকা জেগে উঠেছিল সমুদ্রের তলা থেকে; অন্যদিকে বিস্তৃত এলাকা ডুবে গিয়েছিল সমুদ্রের নিচে। এইভাবে সমুদ্রের স্থানচ্যুতির ফলে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে সৃষ্টি হয়েছিল অগভীর জলাভূমি।

আর ছিল ঘন অরণ্য। কোনো কোনো গাছ একশো ফুট পর্যন্ত

লম্বা হত। গাছের তলায় থাকত অজস্র ঝোপঝাড়। গাছের গা বেয়ে বেয়ে উঠত অজস্র লতা। জলাভূমির ধারে ধারে ঘন অরণ্যে ভূপৃষ্ঠের বিস্তৃত অঞ্চল ছেয়ে গিয়েছিল।

তারপরে গাছগুলো একসময়ে মরে যায় আর সবসুদ্ধ এসে পড়ে জলাভূমির মধ্যে আর সেখানে পচতে ও গলতে শুরু করে। কিছু অংশ মিশে যায় জলের সঙ্গে, কিন্তু বেশির ভাগ অংশই আলাদা থাকে। এমনি ভাবে জলাভূমির মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকে স্তরের ওপরে স্তর, তার ওপরে স্তর। ফলে ক্রমেই চাপ বাড়তে থাকে। প্রচণ্ড চাপে জলীয় অংশ বেরিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত, যা ছিল একসময়ে উদ্ভিদ, তাই রূপান্তরিত হয় পীট্-এ (peat)। তারপরেও যদি চাপ বজায় থাকে তাহলে পীট্ রূপান্তরিত হয় লিগ্নাইট-এ, তারপরে বাদামী কয়লায়, তারপরে পুরোপুরি কালো কয়লায়—যে কয়লা পুড়িয়ে আমরা রান্না করি।

অর্থাৎ, কয়লাকে আমরা বলতে পারি ফসিল-হয়ে-যাওয়া উদ্ভিদ। পনেরো ফুট পুরু পচা ও গলা গাছের কাণ্ড, শাখাপ্রশাখা ও পাতা প্রচণ্ড চাপে শেষ পর্যন্ত এক ফুট পুরু কয়লার স্তরে রূপান্তরিত হতে পারে। কিন্তু তারপরেও কয়লা থেকে উদ্ভিদের সমস্ত চিহ্ন অবলুপ্ত হয় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কয়লার একটি পাতলা পরতকে পর্যবেক্ষণ করলে গাছের ছাল বা পাতার দাগগুলো কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্যই চোখে পড়বে। আজকের দিনের পৃথিবীতে যেখানে যতো কয়লার সন্ধান আমরা পেয়েছি তার বেশির ভাগটাই সৃষ্টি হয়েছে আজ থেকে প্রায় পঁচিশ কোটি বছর আগে—এই কার্বনিফেরাস কালে। কয়লা বা কার্বন থেকেই এই কালটির নাম হয়েছে কার্বনিফেরাস।

অন্যদিকে জীবজগতেও দুটি নতুন লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিল। এই কার্বনিফেরাস কালেই প্রথম দেখা যেতে পারত ডানাওলা পতঙ্গ। জীবজগতে এটি একটি নতুন লক্ষণ। আবার এই কার্বনিফেরাস কালেই প্রথম দেখা যেতে পারত সরীসৃপ। এটিও নতুন লক্ষণ।

কার্বনিফেরাস কালের পতঙ্গটির নাম দেওয়া হয়েছে মেগানয়রা (Meganeura)। পতঙ্গটি দেখতে একালের প্রজাপতির মতো—ডানার বিস্তৃতি একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ২৯ইঞ্চি। এমন বৃহৎ আকারের পতঙ্গ পৃথিবীতে কোনো সময়েই দেখা যায়নি।

ডাঙ্গার জীবদের মধ্যে দেখা যেতে পারত নানা ধরনের মাকড়সা, বিছে ও কেন্নো জাতীয় জীব।

আর জলের জীবদের মধ্যে প্রথমেই চোখে পড়ত প্রচুর সংখ্যক মাছ। যেমন নোনা জলে, তেমনি মিষ্টি জলে। তবে হুবহু ডেভোনিয়ান কালের চেহারায় নয়। বরং, মোটামুটি এখনকার কালের চেহারায়। উভচর জীবরাও ছিল। গোড়ার দিকে তাদের আকার ছিল খুবই ছোট্ট, পরে পনেরো ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে উঠেছিল।

আর ছিল সরীসৃপ। এই সরীসৃপরা জীবজগতের একটি নতুন লক্ষণ এই কারণে যে এই সরীসৃপরাই প্রথম জলের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পেরেছিল। সরীসৃপদের বাচ্চা হত শক্ত খোলার আবরণযুক্ত ডিম থেকে। বিষয়টি নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। কার্বনিফেরাস কালে অতি নিরীহভাবে যার সূত্রপাত, তারই পরিণত রূপটি মধ্যজীবীয় যুগে প্রচণ্ড বিক্রমে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এমন কি পুরাজীবীয় যুগের কার্বনিফেরাস কালের দিকে তাকালেও বোঝা যেতে পারত, মাছ বা উভচরদের চেয়ে সরীসৃপ উন্নততর জীব। এই আদিমতম সরীসৃপের নাম দেওয়া হয়েছে কটিলোসর (Cotylosaur) বা মূল সরীসৃপ। এই মূল থেকেই পরবর্তী কালের বিচিত্র সরীসৃপ জগতের উদ্ভব।

পার্মিয়ান

পার্মিয়ান কালটির শুরু আজ থেকে বাইশ কোটি বছর আগে।

উরাল পর্বতমালার পার্ম অঞ্চলের নাম থেকে এই কালটির নামকরণ।

পার্মিয়ান কালে আরেক বার ভূপৃষ্ঠে বড়ো রকমের অদল-বদল ঘটেছিল। সঙ্গে সঙ্গে জলবায়ুতেও। মস্ত মস্ত পর্বতমালার জন্ম হয়েছিল এই সময়ে।

উত্তর গোলার্ধে সমুদ্র সরে গিয়ে বিস্তৃত অঞ্চল মরুভূমি হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে দক্ষিণ গোলার্ধে বিস্তৃত অঞ্চল মাঝে মাঝে বরফে ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল।

এই চূড়ান্ত রকমের বিপরীত জলবায়ুতে জীবের পক্ষে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা বড়ো সহজ ব্যাপার ছিল না। বিশেষ করে অমেরুদণ্ডীদের পক্ষে তো বটেই। ফলে এই পার্মিয়ান কালে কয়েক দল জীবের অস্তিত্বই একেবারে লোপ পেয়ে যায়। ট্রাইলোবাইট, ইউরিপ্‌টেরিড ও আরো কয়েক ধরনের সামুদ্রিক জীবের আয়ু এখানেই শেষ।

মেরুদণ্ডী জীবদের মধ্যেও বড়ো রকমের পরিবর্তন হয়েছিল। প্লেকোডার্মদের অস্তিত্ব লোপ পায়। উদ্ভব হয় আরো উন্নত জীবের।

পরিবর্তন আসে উভচর জীবদের মধ্যেও। তারা আকারে আরো বড়ো হয়ে ওঠে। তবে অনেকেরই অস্তিত্ব লোপ পায়।

অন্যদিকে সরীসৃপরাও বদলে যেতে শুরু করেছিল। কারও কারও শরীরটা বেঢপ রকমের মস্ত হয়ে ওঠে। কেউ তৃণভোজী, কেউ মাংসাশী। শরীরের হাড়গোড়গুলোও বদলে যেতে থাকে। কারও মাথার খুলিতে গজিয়ে ওঠে শিঙের মতো হাড়, কারও পিঠের ওপরে সারি সারি পাখনার মতো হাড়।

পার্মিয়ান কালের দুরূহ জলবায়ুতে অন্য একদিকেও জীবনের বিজয়বার্তা ঘোষিত হয়েছিল। উদ্ভিদের জন্ম হচ্ছিল বীজ থেকে। আমরা জানি, উদ্ভিদের বীজের ওপরেও একটি শক্ত আবরণ থাকে। এই আবরণটি থাকার দরুন বীজ সহজে মরে যায় না। গরম হোক, ঠাণ্ডা হোক, শক্ত আবরণের মধ্যে নতুন একটি উদ্ভিদের সম্ভাবনা

বেঁচে থাকে। তারপরে যখনই উপযুক্ত পরিবেশটি তৈরি হয়, বীজটি অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে ও নতুন আরেকটি জীবনের উল্লাস নিয়ে বড়ো হতে শুরু করে।

পার্মিয়ান কালে জীবনের কৃতিত্ব এখানেই শেষ নয়। কীটপতঙ্গের জগতেও জীবনের অগ্রগতির নতুন আরেকটি লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল। পার্মিয়ান কালের যে-সমস্ত নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তা থেকে জীববিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে এই কালেই সর্বপ্রথম মেটামর্ফোসিস বা রূপান্তর-প্রক্রিয়ার সূত্রপাত। যেমন, একটি শুঁয়োপোকা জাতীয় জীবের রূপান্তর হতে হতে শেষ পর্যন্ত একটি প্রজাপতি। এই বিশেষ প্রক্রিয়ায় জন্মের একেবারে গোড়ার অবস্থাটিকে বলা হয় শূক। পতঙ্গের জন্ম একেবারে সরাসরি না হয়ে শূক থেকে হবার একটা সুবিধে এই যে শূক বিরূপ পরিবেশেও টিকে থাকতে পারে।

পার্মিয়ান কালটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পুরাজীবীয় যুগেরও শেষ। এই সময়ে ভূপৃষ্ঠে বড়ো রকমের ভাঙাচোরা চলছিল। জলবায়ুও বদলে যাচ্ছিল। যে-সব উদ্ভিদ ও জীব এই নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে না; তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যারা খাপ খাইয়ে চলতে পারে তারা টিকে থাকে। এই টিকে-থাকার দলে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জীব ছিল সরীসৃপ। সরীসৃপদের গায়ের চামড়া হত শক্ত আর তাদের ছানা হত শক্ত খোলার আবরণযুক্ত ডিম থেকে। এই কারণে সরীসৃপদের পক্ষে এমন কি মরুভূমির পরিবেশেও বেঁচে থাকা ও বংশবৃদ্ধি করা সম্ভব ছিল।

পুরাজীবীয় যুগের পরে মধ্যজীবীয় যুগ, বা যাকে বলা হয়ে থাকে সরীসৃপ যুগ। এই যুগটি সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এখানে আরেক বার খুব সংক্ষেপে ধারাবাহিক লক্ষণ-গুলোকে তুলে ধরবার চেষ্টা করা যাক।

ট্রিয়াসিক

ট্রিয়াসিক কালটির শুরু আজ থেকে উনিশ কোটি বছর আগে। পশ্চিম জার্মানিতে আবিষ্কৃত তিন-স্তর শিলা বা 'ট্রিয়াস' থেকে এই কালটির নামকরণ।

গোড়ার দিকে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ছিল মরুভূমি। পরে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে। প্রচুর বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে ঘন অরণ্যে দেশ ছেয়ে যায়।

মধ্যজীবীয় যুগটির এই হল শুরু। এই যুগটিকে বলা হয়েছে সরীসৃপদের যুগ। কিন্তু সরীসৃপ-দলের বাইরেও আরো অজস্র জীব অবশ্যই ছিল যারা সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে নিতান্ত নগণ্য ছিল না।

অমেরুদণ্ডীদের দিকে তাকালে দেখা যেত, সমুদ্রের জলে ও শুকনো ডাঙ্গায় তারা এক বিচিত্র রূপ নিয়ে উপস্থিত। পুরাজীবীয় যুগে তাদের আমরা যে-চেহারায় দেখেছি তা আর নেই। আবার একালের এই নবজীবীয় যুগে তাদের আমরা যে-চেহারায় দেখছি তাও তখনো আসেনি। তবে তাদের চেহারার মধ্যে অতীতের লক্ষণগুলো টিকে আছে, ভবিষ্যতের ঝোঁকগুলো ফুটে উঠতে চাইছে। মধ্যজীবীয় যুগের অমেরুদণ্ডীদের অবস্থান আগের ও পরের যুগের অমেরুদণ্ডীদের মধ্যে অনেকটা যোগসূত্রের মতো।

অন্যদিকে মেরুদণ্ডীদের দিকে তাকালে প্রথমেই চোখ পড়ত সরীসৃপদের দিকে। কি জলে কি স্থলে। বিশেষ করে স্থলভাগে সরীসৃপরা দ্রুত বংশবিস্তার করছিল ও সারা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছিল। শুধু সংখ্যায় নয়, নানা শাখাপ্রশাখাতেও। এমনি একটি শাখায় পাওয়া গিয়েছিল ডাইনোসরকে। এই ডাইনোসররাই মধ্যজীবীয় যুগে আধিপত্য করে গিয়েছে।

ডাইনোসরদের সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। তবুও লক্ষণীয় বৈশিষ্টগুলো আরেক বার বলে নেওয়া যেতে পারে।

শরীরটাকে সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়ে পেছনের দু-পায়ে

ডাইনোসররা চলাফেরা করত। শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখত মস্ত ও ভারী লেজের সাহায্যে। এমন কি যে-সব ডাইনোসর চার পায়ে চলাফেরা করত তাদেরও সামনের দুটি পা হত অপেক্ষাকৃত ছোট। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের কাঠামোর মধ্যেও প্রয়োজনীয় গড়ন এসে গিয়েছিল। বিশেষ করে বুকের ও কোমরের হাড়ে।

ডাইনোসররা অধিকাংশই গোড়ার দিকে ছিল মাংসাশী কিন্তু শেষের দিকে তৃণভোজী।

অন্যদিকে এই ট্রিয়াসিক কালেই প্রায় অলক্ষ্যে জীবনের অন্য একটি আশ্চর্য প্রকাশ ঘটতে চলেছিল। এদের নাম দেওয়া হয়েছে স্তন্যপায়ী। আশ্চর্য এই কারণে যে যদিও গোটা মধ্যজীবীয় যুগে এদের অস্তিত্ব কোনো সময়েই তেমন প্রকট হয়ে ওঠেনি কিন্তু প্রবলপ্রতাপান্বিত ডাইনোসরদের পাশাপাশি গোটা মধ্যজীবীয় যুগে এদের অস্তিত্ব বজায় ছিল। পরে নবজীবীয় যুগে এই স্তন্যপায়ীদেরই আধিপত্য শুরু হয়েছে।

'স্তন্যপায়ী' নামের মধ্যেই এদের প্রধান লক্ষণটি বলে দেওয়া হয়েছে। বাচ্চারা মায়ের দুধ খেয়ে বড়ো হয়। প্রায় দু-শো কোটি বছরের জীবজগতের ইতিহাসে এই লক্ষণটি আগে আর কখনো দেখা যায়নি।

আরো একটি লক্ষণ, স্তন্যপায়ীদের শরীরের রক্ত উষ্ণ। এই কারণে, পরিবেশের তাপমাত্রা ওঠানামা করলেও স্তন্যপায়ীদের শরীরের তাপ মোটামুটি একই মাত্রায় বজায় থাকে।

তবে সম্ভবত ট্রিয়াসিক কালের স্তন্যপায়ীরা আকারে ইঁদুরের চেয়ে বড়ো হত না। 'সম্ভবত' বললাম এই কারণে যে ট্রিয়াসিক কালের ফসিলের নিদর্শন যা-কিছু পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে স্তন্যপায়ীদের খবর বিশেষ কিছু নেই। ফসিলের নিদর্শনে স্তন্যপায়ীদের খবর পাবার জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে টারশিয়ারী কাল পর্যন্ত।

জুরাসিক

জুরাসিক কালের শুরু আজ থেকে চোদ্দ কোটি বছর আগে। নামকরণ পশ্চিম ইওরোপের জুরা পর্বতমালা থেকে।

জুরাসিক কালের সরীসৃপদের সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। কিন্তু সরীসৃপদের বাদ দিলেও এই কালটি সম্পর্কে বিশেষভাবে কৌতূহলী হবার আরো কতগুলো কারণ আছে। প্রথমত এই জুরাসিক কালের ফসিলে অমেরুদণ্ডী জীবদের নিদর্শন সবচেয়ে ভালোভাবে পাওয়া গিয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই জুরাসিক কালেরই এমন নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে যা থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে, এই সময়েই প্রথম গাছের ফুল ফুটতে শুরু করেছিল। তৃতীয়ত, এই জুরাসিক কালেই প্রথম সত্যিকারের পাখি আকাশে ডানা মেলেছিল। সরীসৃপ, পাখি ও ফুল—এই তিনের সমন্বয়ের জন্যে জুরাসিক কালটি জীববিজ্ঞানীদের কাছে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে।

যে-সব গাছে ফুল হয়ে থাকে, যাদের বলা হয় সপুষ্পক উদ্ভিদ, তাদের উদ্ভব সম্পর্কে উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা স্পষ্ট কোনো হদিশ দিতে পারেননি। তার প্রধান কারণ এই যে ফুল এমনই একটি নরম ও পেলব পদার্থ যে ফুলের কোনো ফসিল পাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই ফুল নিয়ে আমরা যতোই উচ্ছ্বাস করি না কেন, পৃথিবীর প্রথম যে গাছটিতে প্রথমে যে ফুলটি ফুটেছিল তার জন্মবৃত্তান্তটি আমাদের অজানা।

তাহলেও, এই প্রথম ফুলটি যে জুরাসিক কালেই ফুটেছিল সে-খবর অন্য একটি উপায়ে জানা গিয়েছে। পৃথিবীর মাটির নিচে রয়েছে জুরাসিক কালের কয়লার স্তর আর এই কয়লার স্তরে পাওয়া গিয়েছে ফুলের পরাগ। উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছে, জুরাসিক কালের এই পরাগ একালের জলপদ্ম-ধরনের কোনো ফুলের। এই প্রমাণ থেকে অন্তত এটুকু ঘোষণা নিশ্চয়ই করা চলে যে জুরাসিক কালের মধ্যেই পৃথিবীতে ফুল ফুটতে শুরু করেছিল।

পৃথিবীর প্রথম পাখিও এই জুরাসিক কালেই। উড়ন্ত সরীসৃপ নয়, সত্যিকারের পাখি। এক্ষেত্রেও এখনো পর্যন্ত বিস্তারিত খবর জানা যায়নি। আমরা আগেই বলেছি, সরীসৃপ থেকেই পাখিরা এসেছে, কিন্তু বিবর্তনের কোন্ কোন্ ধাপ পার হয়ে তা আমরা জানি না। জুরাসিক কালের পাখির যে নিদর্শনটি পাওয়া গিয়েছে তার নাম আর্কিওপ্টেরিক্স্। এটি সত্যিকারের পাখি হলেও পুরোপুরি পাখি নয়। বিষয়টি নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এই জীবটির মধ্যে পাখির লক্ষণ ও সরীসৃপের লক্ষণ প্রায় সমান সমান মাত্রায় থেকে গিয়েছে। একালের চোখ নিয়ে তাকালে আমরা হয়তো এই জীবটিকে পাখি বলেই গণ্য করব না। সেজন্যে আমাদের আরো দশ কোটি বছর অপেক্ষা করতে হবে।

এবারে জুরাসিক কালের দৃশ্যটি আরেক বার কল্পনা করা চলে। আমরা সরীসৃপদের সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছিলাম এমনি একটি দৃশ্য কল্পনা করে। সে-দৃশ্যের নায়ক ছিল ব্রণ্টোসরাস, আল্লোসরাস ও আরো অনেক সরীসৃপ। জলে-স্থলে-আকাশে এই সরীসৃপরাই আধিপত্য করত। কেউ মস্ত কেউ ছোট, কেউ ক্ষিপ্র কেউ শ্লথ, কেউ মাংসাশী কেউ তৃণভোজী—কিন্তু সব মিলিয়ে পরস্পরের হানাহানি কাটাকাটির মধ্যে প্রাণের এক হিংস্র ও ভয়ংকর রূপই প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু এখন আমরা বলতে পারি, এটুকুই সব নয়। এই সরীসৃপ-জগতেও ফুল ফুটত, পাখি উড়ত, স্তন্যপায়ীরা মাতৃস্নেহে বড়ো হয়ে উঠত। পৃথিবীর এই জীবজগতটি কোনো সময়েই একটি মাত্র রঙে প্রকাশ পায়নি। নানা রঙের বৈপরীত্যে ও সমন্বয়ে তা সবসময়েই অতি বিচিত্র।

ক্রিটাশুস

ক্রিটাশুস কালের শুরু আজ থেকে এগারো কোটি বছর আগে। কার্বনিফেরাস নামটি যেমন এসেছে 'কার্বন' থেকে এবং নামের

মধ্যেই কালের লক্ষণটি পাওয়া যাচ্ছে—তেমনি 'ক্রিটাশুস' নামটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'ক্রিটা' (creta) থেকে। এই নামের মধ্যেও কালের-লক্ষণটি পাওয়া যাবে।

'ক্রিটা' শব্দের অর্থ চক্ (chalk) বা খড়ি। এই বিশেষ কালের শিলাস্তর প্রথম যেখানে আবিষ্কৃত হয়েছিল সেখানে প্রধানত পাওয়া গিয়েছিল এই চক্ বা খড়ি।

চক্ বা খড়ি হচ্ছে এক ধরনের নরম চুনাপাথর (limestone)। প্রকৃতির রাজ্যে এই চুনাপাথর তৈরি হয়ে থাকে বিশেষ ধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদের সাহায্যে, যাদের শরীরেই চুন থাকে। মারা যাবার পরে এই সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ জলের টানে এসে জড়ো হতে থাকে কোনো অগভীর সমুদ্রের নিচে। একটু একটু করে সমুদ্রের তলদেশে চুনের আস্তরণ পড়তে শুরু করে। একটু একটু করে তা পুরু হয়। অবশ্য সময় লাগে অবিশ্বাস্য রকমের বেশি। প্রায় আড়াই হাজার বছরে এক ইঞ্চি। কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথিবীর কোনো কোনো অংশে হাজার ফুট পুরু খড়ির আস্তরণও পাওয়া গিয়েছে। এক ইঞ্চি পুরু হতে যদি সময় লেগে থাকে আড়াই হাজার বছর তাহলে হাজার ফুট পুরু হতে সময় লেগেছে তিন কোটি বছর। অর্থাৎ, ধরে নিতে হয়, এই তিন কোটি বছর ধরে এই বিশেষ এলাকায় সমুদ্র ছিল অগভীর ও উষ্ণ। কারণ, যে বিশেষ ধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদের শরীর থেকে খড়ি পাওয়া যায় তাদের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্যেই অগভীর ও উষ্ণ সমুদ্রের পরিবেশটি প্রয়োজন।

ক্রিটাশুস কালের পাখির নিদর্শন হিসেবে খুব বেশি ফসিল পাওয়া যায়নি। কিন্তু যে কটি পাওয়া গিয়েছে তা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, জীবজগতের এই বিশেষ শাখাটি বিবর্তনের পথে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিল। এক ধরনের পাখি ছিল (Ichthoyrnis) যাদের বুকের হাড় একালের পাখির মতোই মস্ত ও ডানা শক্তিশালী। আরেক ধরনের পাখি ছিল (Hesperornis) যাদের ডানা প্রায় অদৃশ্য কিন্তু পায়ের গড়ন এমন যে সাঁতার কাটতে খুব পটু।

ক্রিটাশুস কালের উদ্ভিদজগতের দিকে তাকালেও মনে হতে পারত যে একালের চেহারাটিই যেন ফুটে উঠছে। সপুষ্পক উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যেত আরো অনেক বেশি সংখ্যায়। ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ কমে আসছিল।

এই ক্রিটাশুস কালটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মধ্যজীবীয় যুগেরও শেষ। তার মানে, বুঝতে হবে, জীবজগতের বিকাশের বিশেষ ধরনটি এখানেই শেষ হল।

এতক্ষণের আলোচনায় আমরা জেনেছি যে মধ্যজীবীয় যুগের আধিপত্য-বিস্তারী জীব ছিল সরীসৃপ। কিন্তু সরীসৃপদের প্রচণ্ড আধিপত্যও ক্রিটাশুস কাল শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি ফুৎকারে যেন স্তিমিত হয়ে গেল। নবজীবীয় যুগে এই সরীসৃপরা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

অন্যদিকে মধ্যজীবীয় যুগে যে স্তন্যপায়ীরা ছিল অকিঞ্চিৎকর তারাই আধিপত্য করছে নবজীবীয় যুগে।

নতুন যুগে উদ্ভিদজগতটিও নতুন রূপ নিয়েছে। ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ অবশ্যই লুপ্ত হয়নি কিন্তু প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সপুষ্পক উদ্ভিদের।

আগে আমরা বলেছি, পুরাজীবীয় যুগটি শেষ হয়েছিল ভূত্বকে বড়ো রকমের ভাঁজ পড়ার মধ্যে দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে জলবায়ুতেও বড়ো রকমের পরিবর্তন এসেছিল। মধ্যজীবীয় যুগটি শেষ হবার সময়েও তেমন প্রচণ্ডভাবে না হলেও ভূপৃষ্ঠে একই ধরনের ওলোটপালোট ঘটেছিল। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই জলবায়ুরও পরিবর্তন।

তবুও জীববিজ্ঞানীরা এখনো পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি, সরীসৃপরা কেন এই পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারেনি। ব্যাখ্যা যাই হোক, ক্রিটাশুস কালের শেষদিকে নিশ্চয়ই এমন মারাত্মক কিছু ঘটেছিল যার ফলে পৃথিবী থেকে কয়েক শ্রেণীর জীব নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

যাই হোক, এবারে আমরা নবজীবীয় যুগের আলোচনায় আসতে পারি। নবজীবীয় যুগের দুটি কাল—টারশিয়ারী ও কোয়াটারনারি।

টারশিয়ারী

টারশিয়ারী (তৃতীয়) কালটির শুরু আজ থেকে সাত কোটি বছর আগে। এই কালটিকে পাঁচটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে—প্যালিও-সিন, ইওসিন, ওলিগোসিন, মাইওসিন ও প্লাইওসিন। কিন্তু পাঁচ-পাঁচটি পর্ব থাকা সত্ত্বেও এই কালটির ব্যাপ্তি অতি সামান্যই—মাত্র সাড়ে-ছয় কোটি বছর।

আগেই বলেছি, এই টারশিয়ারী কালটি শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে নবজীবীয় যুগটির শুরু। এটি স্তন্যপায়ীদের যুগ। অর্থাৎ এই যুগে স্তন্যপায়ীরাই সবচেয়ে লক্ষণীয় ভাবে নানা শাখাপ্রশাখায় ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিল। কিন্তু স্তন্যপায়ীদের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে জীব-জগতের অন্যান্য ক্ষেত্রের দিকে তাকালে লক্ষ্য করা যেত যে সঙ্গে সঙ্গে আরো নতুন নতুন প্রাণী ও উদ্ভিদও সৃষ্টি হয়েছে। তার মধ্যে অনেকগুলিই আজকের দিনের মতো চেহারায়। ওলিগোসিন পর্বটি শেষ হবার আগেই কীটপতঙ্গ ও জলচর অমেরুদণ্ডীদের মধ্যে মোটামুটি আজকের দিনের চেহারা এসে গিয়েছিল।

ওলিগোসিন পর্বে দেখা যেতে পারত, অরণ্যের এলাকা কমে গিয়েছে আর সে-জায়গায় তৈরি হয়েছে বিস্তৃত তৃণভূমি। এই নতুন অবস্থার সুযোগ নিয়ে তৃণভোজী প্রাণীরা দূর দূর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিল।

সমুদ্রের মেরুদণ্ডী জীবরাও উপস্থিত ছিল মোটামুটি আজকের দিনের চেহারাতেই। হাঙর ও মাছ আজকের দিনে আমরা যা দেখি তার প্রায় সবকটিকেই টারশিয়ারী কালের সমুদ্রে চিনে নেওয়া যেতে পারত।

কিন্তু সরীসৃপ-জগতটি আগের যুগের তুলনায় খুবই ছোট। সরীসৃপ

বলতে দেখা যেতে পারত শুধু কয়েক শ্রেণীর কচ্ছপ, গিরগিটি, সাপ ও কুমির। আজকের দিনেও এই কটিকেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

পাখিদের মধ্যে কতকগুলি ছিল যারা উড়তে পারত না। তবে, উড়তে পারত এমন পাখিও অজস্র ছিল আর তাদের চেহারাও আজকের দিনের মতোই।

বলা বাহুল্য, টারশিয়ারী কালে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যারা বদলে যাচ্ছিল, সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যারা উন্নত হয়ে উঠছিল, তারা হচ্ছে স্তন্যপায়ী। নবজীবীয় যুগটি শুরু হবার আগেও দশ কোটি বা তারও বেশি সময় ধরে পৃথিবীতে স্তন্যপায়ীদের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু দশ কোটি বছর সময় পাওয়া সত্ত্বেও স্তন্যপায়ীরা আশানুরূপ উন্নত হয়ে উঠতে পারেনি। জীববিজ্ঞানীদের মতে, ডাইনোসরদের আধিপত্য এই দশ কোটি বছরে স্তন্যপায়ীদের উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করেছিল।

নবজীবীয় যুগ শুরু হবার সময়ে উত্তর আমেরিকা, ইওরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা আজকের মতো বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল না। পুরোপুরি অখণ্ড না হলেও সবটা মিলে ছিল প্রকাণ্ড এক মহাদেশের মতোই। এই প্রকাণ্ড মহাদেশটিকে আশ্রয় করেই স্তন্যপায়ীরা বিবর্তনের বড়ো বড়ো ধাপগুলো পার হয়েছিল। দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া—এই দুটি মহাদেশ মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। সম্ভবত এই কারণেই এই দুটি মহাদেশে স্তন্যপায়ীদের বিবর্তনের গোড়ার ধাপগুলো টিকে আছে।

কোয়াটারনারি

কোয়াটারনারি কালটি শুরু হয়েছে আজ থেকে দশ লক্ষ বছর আগে। এই কালের দুটি পর্ব—প্লাইস্‌টোসিন (সাম্প্রতিকতম) ও হোলোসিন (একেবারেই সাম্প্রতিক)। কোয়াটারনারি কালের শেষ দশটি হাজার বছর নিয়ে হোলোসিন পর্ব, বাকি সবটাই প্লাইস্‌টোসিন।

প্লাইস্‌টোসিন পর্বটিকে অনেক সময়ে বলা হয়ে থাকে বিরাট হিমযুগ। পৃথিবীর ইতিহাসে হিমযুগ অবশ্য অনেক বারই এসেছে। কিন্তু এই প্লাইসটোসিন হিমযুগ সম্পর্কেই আমরা সবচেয়ে বেশি খবর রাখতে পেরেছি আর এই প্লাইস্‌টোসিন হিমযুগের বরফ এখনো পৃথিবীতে থেকে গিয়েছে। এই কারণে বিরাট হিমযুগ বলতে প্লাইস্‌টোসিন হিমযুগকেই বোঝানো হয়ে থাকে।

সঠিক ভাবে বলতে গেলে, প্লাইস্‌টোসিন পর্বেও হিমযুগ এসেছিল একবার নয়, অন্তত চারবার। তার মানে, প্লাইস্‌টোসিন পর্বের দশ লক্ষ বছরের মধ্যে অন্তত চারবার ভূপৃষ্ঠের অনেকখানি অংশ বরফে ঢেকে যায়। আবার দুই হিমযুগের মাঝখানের অপেক্ষাকৃত উষ্ণ জলবায়ুর সময়ে সেই বরফ গলতে শুরু করে।

প্লাইস্‌টোসিন হিমযুগে অবস্থা মাঝে মাঝে এমন চরমে পৌঁছেছিল যে ভূপৃষ্ঠের শতকরা ২৮ ভাগ অংশই চাপা পড়ে গিয়েছিল হিমবাহের নিচে। আল্পস, হিমালয় ও আন্দিজ পর্বতমালা এবং হাওয়াই ও জাপানের পর্বতমালা—সর্বত্রই পুরু হয়ে বরফ জমেছিল এবং হিমবাহের আকারে নেমে এসেছিল সমতল জমির দিকে। উত্তর ইওরোপ, উত্তর আমেরিকার অংশবিশেষ ও আরো নানা অঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছিল হাজার হাজার ফুট পুরু বরফ। আর বরফের এই চাদরটি অতি ধীরে ধীরে, এক-এক ইঞ্চি করে, নেমে আসছিল নিচের দিকে।

মস্ত মস্ত বরফের চাঁই জমির ওপর দিয়ে চলতে শুরু করলে ফল কী হতে পারে তা অনুমান করা শক্ত নয়। কোথাও কোথাও তৈরি হবে প্রকাণ্ড খাদ, কোথাও কোথাও উপত্যকা; নদী যাবে বুজে; মাটি চেঁছে, শিলাস্তর ভেঙে গুঁড়িয়ে ভূপৃষ্ঠের নতুন আদল তৈরি হবে। অবশ্য বরফ যতোদিন থাকবে ততোদিন এই নতুন আদলটি টের পাওয়া সম্ভব নয়।

তারপর হিমযুগ শেষ হলে এই বিপুল পরিমাণ বরফ গলতে শুরু করবে। গলা বরফের জলে ভর্তি হয়ে যাবে সমস্ত খাদ ও

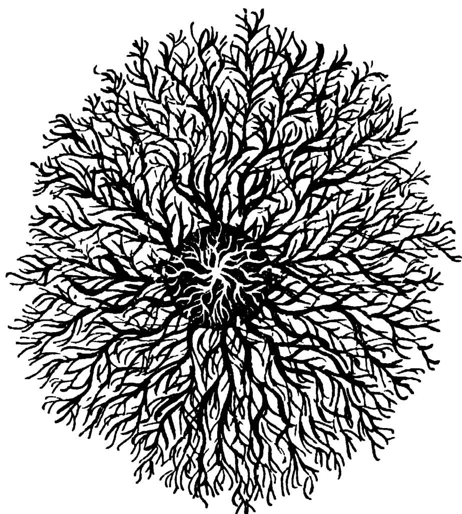
উপত্যকা। তৈরি হবে মস্ত মস্ত হ্রদ। গলা বরফের জল গিয়ে পড়বে সমুদ্রে আর সমুদ্র আরো উঁচু হয়ে উঠবে। অনেক উপত্যকা তলিয়ে যাবে সমুদ্রের জলে।

ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে, হিমযুগে সমুদ্রের জলের উচ্চতা এখনকার চেয়ে আরো ৩০০ ফুট নিচে ছিল। আর হিমযুগের পরের উষ্ণযুগে—যখন পৃথিবীর সমস্ত বরফ গলে জল হয়ে গিয়েছিল—সমুদ্রের জলের উচ্চতা এখনকার চেয়ে আরো ১০০ বা ১৫০ ফুট বেড়ে গিয়েছিল। আজকের পৃথিবীতেও দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর মেরুদেশে প্রচুর পরিমাণ জল বরফ হয়ে জমে আছে। আমরা বাস করছি এমন এক সময়ে যখন একটি হিমযুগ শেষ হতে চলেছে। আজকের দিনের সমস্ত বরফ যখন গলে জল হবে তখন আজকের সমুদ্রের জলের উচ্চতাও বাড়বে আরো ১০০ কি ১৫০ ফুট। ফলে পৃথিবীর এখনকার স্থলভাগের অনেক অংশই জলের নিচে তলিয়ে যাবে সে-সময়ে।

পৃথিবীতে প্রত্যেকবার হিমযুগ শুরু হবার পরে প্রাণী ও উদ্ভিদ-জগতটিও প্রচণ্ড একটা নাড়া খায়। হিমবাহ যতোই নেমে আসতে শুরু করে ততোই ট্রপিকাল জলবায়ুর উপযোগী উদ্ভিদ ও প্রাণীরা সরতে শুরু করে। অনেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আবার হিমযুগ শেষ হবার পরে অনেকে ফিরে আসে, অনেকে ফিরতে পারে না। ইওরোপের বিভিন্ন দেশের মাটির তলা থেকে ট্রপিক জন্তুজানোয়ারের অজস্র নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে।

মানুষের ইতিহাসের দিক থেকে প্লাইস্টোসিন পর্বটির গুরুত্ব খুবই বেশি। এই পর্বটি শুরু হবার সময় থেকেই মানুষ এসেছে এই পৃথিবীতে। কিংবা হয়তো অল্প কিছুকাল পরে। বলা বাহুল্য, মানুষ পুরোপুরি মানুষ হিসেবে আচমকা আবির্ভূত হয়নি। বিষয়টি নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

পৃথিবীর শেষ পঞ্চাশ কোটি বছরের এই হচ্ছে মোটামুটি ছবি।



অদ্বিতীয় প্রাণ

শ্যামল প্রাণের উৎস হতে
অবারিত পুণ্যস্রোতে
ধৌত হয় এ বিশ্বধরণী
দিবস রজনী।

এতক্ষণ আমরা পৃথিবীর ইতিহাসের গত পঞ্চাশ কোটি বছরকে চোখের সামনে রেখে জীববজগতের বিবর্তনের ধারাটিকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছি। আমরা দেখেছি, জীবজগৎ ক্রমেই সরল থেকে জটিল হয়েছে, এক থেকে বহু, কিন্তু তারই মধ্যে আবার অসংখ্য জীব নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গিয়েছে। অনেক জন্ম, অনেক বিবিধায়ন, অনেক মৃত্যু পার হয়ে আজকের এই জীবজগৎ। মানুষই এসেছে সবচেয়ে পরে, কোটি কোটি বছরের ইতিহাসে মাত্র কয়েক লক্ষ বছর তার পরমায়ু।

আগেই বলেছি, মানুষ জীবজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো সৃষ্টি নয়, জীবজগতেরই বিবর্তনের ফল। মানুষের সঙ্গে মনুষ্যেতর জীবের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। বিশেষ করে গত একশো বছরে এই সম্পর্কের নানা নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

এই একশো বছরে একদিকে যেমন আমরা জেনেছি মানুষ কি-করে মানুষ হয়েছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে জেনেছি যে পৃথিবীর এই জীবজগতটি ঠিক আজকের মতো চেহারাতেই চিরকাল ছিল না। জীবজগতের বৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণাও মোটামুটি এই সময়ে। আমরা জেনেছি, এই পৃথিবীর জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে লক্ষ লক্ষ প্রজাতি নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে সংগ্রাম করে চলেছে। পৃথিবীর পরিসর যতোই সীমাবদ্ধ হোক—সেখানে কোটি কোটি জীব অতি বিচিত্র এক জীবন-চক্রে আবর্তিত।

তবুও আমরা অনেক সময়েই উদ্ভট কোনো জীবের সাক্ষাৎ পেলে প্রশ্ন করে বসি, এই জীবটির সার্থকতা কী?

প্রশ্নটি আমাদের কাছে অস্বাভাবিক ঠেকে না। কিন্তু এই প্রশ্নটির পেছনে আমাদের মনোভাবকে জানা দরকার। কয়েক-শো বছর আগেও আমরা ভাবতাম যে পৃথিবীর যা-কিছু আয়োজন সবই মানুষের প্রয়োজনকে সিদ্ধ করবার জন্যে। আর এই ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে মানুষের বাসভূমি এই পৃথিবীকেও আমরা একটি বিশেষ মর্যাদার আসন দিয়েছিলাম।

"মাত্র সাড়ে-চারশো বছর আগেও মানুষের ধারণা ছিল, পৃথিবী এই বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু। এবং পৃথিবী স্থির ও অনড়। যেন বিশ্বজগতের সম্রাজ্ঞী তাঁর মর্যাদার আসনটিতে অধিষ্ঠিত রয়েছেন আর তাঁকে ঘিরে রয়েছে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্র। অবিশ্বাস করবার কারণ ছিল না। চোখ মেলে তাকিয়ে এই ব্যাপারটিকেই যেন ঘটতে দেখা যেত। আকাশের দিকে তাকালে মনে হত যেন একটি উল্টনো গামলা দিগন্তে এসে মিলেছে। যেন একটি গোলকের অর্ধাংশ। আর এই গোলকের গায়ে নানান কক্ষে চলেছে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রের অবিরাম পরিক্রমা। দিনের বেলা সূর্য থাকে পৃথিবীর 'ওপরে' আর রাত্রিবেলা পৃথিবীর 'নিচে'। তারাগুলো দিনের বেলা পৃথিবীর 'নিচে', রাত্রিবেলা পৃথিবীর 'ওপরে'। আর এই সূর্য ও তারা বসানো বিশ্বগোলকটি প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় একবার

পাক খায়। এই ছিল সেকালের সহজ সরল বিশ্বতত্ত্ব।"

এই বিশ্বতত্ত্ব থেকে সহজেই বিশ্বাস করা যেতে পারত যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবীর গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। পৃথিবী আছে বলেই সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রের সার্থকতা।

একই কথা ভাবা যেতে পারত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ সম্পর্কেও। মানুষ আছে বলেই পৃথিবীতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর এমন বিচিত্র আয়োজন। যেন মানুষের প্রয়োজনকে সিদ্ধ করার মধ্যেই উদ্ভিদ ও প্রাণীর সার্থকতা।

আর এখনো সেই সাড়ে-চারশো বছর আগেকার কালের ধারণার জের টেনেই আমরা অনেক সময়ে প্রশ্ন করে বসি, এই জীবটির সার্থকতা কি? অর্থাৎ আমরা জানতে চাই, এই বিশেষ জীবটি মানুষের কোন্ প্রয়োজনকে সিদ্ধ করছে?

ইতিমধ্যে এই সাড়ে-চারশো বছরে কোপারনিকাস প্রমাণ করেছেন যে পৃথিবী এই বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু নয়—পৃথিবী এই সৌরমণ্ডলের সাধারণ একটি গ্রহ মাত্র। নিউটন এমন কতকগুলো সূত্রের সন্ধান দিয়েছেন যার সাহায্যে আকাশের প্রত্যেকটি জ্যোতিষ্কের গতিবিধির মাপ নেওয়া চলে। হাটন আবিষ্কার করেছেন সময়ের বিপুলতা। আর ডারউইন তুলে ধরেছেন মানুষের সঙ্গে জীবজগতের সম্পর্কের সূত্রটি।

এই অবস্থায়—অসীম মহাবিশ্ব, নিরবধি কাল ও নিয়ত-পরিবর্তনশীল বিপুল এক জীবজগতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোনো একটি বিশেষ জীবের সার্থকতা সম্পর্কে প্রশ্ন করাটা নিরর্থক হয়ে পড়ে। বরং প্রশ্ন করা যেতে পারে, মানুষ নামক জীবেরই বা সার্থকতা কী?

বিজ্ঞান আমাদের শিখিয়েছে যে আমাদের এই পৃথিবী নিতান্তই একটি মাঝারি আকারের গ্রহ। আমাদের এই সূর্য নিতান্তই একটি মাঝারি আকারের নক্ষত্র। সূর্যের মতো ও সূর্যের চেয়েও হাজার

মহাকাশের ঠিকানা—পৃঃ ১

গুণ বড়ো আরো কোটি কোটি নক্ষত্র রয়েছে আমাদের এই বিশ্বে। এমনি কোটি কোটি বিশ্ব নিয়ে এই মহাবিশ্ব। এই অনন্ত বিস্তৃতি সম্পর্কে আমরা শুধু খানিকটা অনুমান করতে পারি—কিংবা হয়তো তাও পারি না। আর এই অনন্ত বিস্তৃতির মধ্যে কতটুকু পরিসরে মানুষের অবস্থান! কত নগণ্য! কত তুচ্ছ!

কিন্তু তবু, একথাও স্বীকার করতে হবে, অকিঞ্চিৎকর এই পৃথিবীর ততোধিক অকিঞ্চিৎকর এই জীবজগতটি নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী নয়—কোটি কোটি বছর ধরে তার বিবর্তন চলেছে। আমরা মানুষরা দু-শো কোটি বছরের বিবর্তনের শেষতম ধাপ মাত্র—আমরা সেখানে বিশেষ নই, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রজাতির একটি। তবে মানুষ হিসেবে অবশ্যই আমাদের গুরুত্ব আছে। কিন্তু ঠিক তেমনি গুরুত্ব আছে একটি প্রজাপতির বা একটি ব্যাঙের বা একটি আরসোলার। বিশেষ বিশেষ জীবের সার্থকতার মাপকাঠিটি এই নয় যে অমুক জীবটি মানুষের খাদ্য হতে পারে, অমুক জীবটি বাগানের গাছে ফুল ফোটাতে সাহায্য করে, অমুক জীবটি মানুষের রোগ সারিয়ে তোলে। বিশেষ একটি জীব হিসেবেই তার সার্থকতা। প্রকৃতি-রাজ্যে বিশেষ সময়ের বিশেষ পরিস্থিতিতে জীবজগতের যে বিশেষ বিন্যাস তারই মধ্যে বিশেষ এক-একটি জীব বিশেষ এক-একটি ভূমিকায় অবতীর্ণ। কোটি কোটি বছরের জীবজগতে প্রত্যেকটি জীবেরই কোনো না কোনো ভূমিকা ছিল বা আছে। জীবের সার্থকতা এই বিশেষ বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্যেই।

আমরাও এতক্ষণ জীবজগতের গত পঞ্চাশ কোটি বছরের যে বিবর্তনকে তুলে ধরতে চেয়েছি তাও এই বিশেষ ভূমিকার দিকে লক্ষ্য রেখেই। একটি জীব আপাতদৃষ্টিতে যতোই উদ্ভট হোক না কেন, তার ভূমিকাটি যদি বিশ্লেষণ করতে পারা যায় তাহলে দেখা যাবে—জীবজগতের কাঠামোর মধ্যে তারও একটি বিশেষ জায়গা আছে। এই বিশেষ জায়গাটিতে থেকেই সেও জীবজগতের সম্পূর্ণ ছবিটি

ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে। তাকে সরিয়ে নিলে এই ছবিটির মধ্যেও যেন অসম্পূর্ণতা এসে যায়। কারণ, লক্ষণ মিলিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, কোনো জীবই সম্পূর্ণ একক বা বিচ্ছিন্ন নয়। মানুষের কথাই ধরা যেতে পারে। মাত্র একশো বছর আগেও আমরা ভাবতাম যে মানুষ এক অনন্যসাধারণ সৃষ্টি— মানুষের সঙ্গে অন্য কোনো জীবকে একাসনে ঠাঁই দেওয়া চলে না। কিন্তু গত একশো বছরের নানা নিদর্শন আমাদের বাধ্য করেছে মানুষ শিম্পাজী ওরাং-ওটাং ও গোরিলাকে একঠাঁই করে প্রাইমেট হিসেবে ভাবতে। আবার অন্য কতকগুলি লক্ষণের বিচারে প্রাইমেটের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে অন্য স্তন্যপায়ীর, স্তন্যপায়ীর সঙ্গে সরীসৃপের, সরীসৃপের সঙ্গে মাছের, মাছের সঙ্গে আদিপ্রাণের। এমনি ভাবে সম্পর্কের সূত্র ধরে ধরে গোটা ছবিটি এঁকে নিতে পারলে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে হয় যে শাখাপ্রশাখায় ছড়ানো পৃথিবীর এই বিচিত্র জীবজগতটি একই প্রাণের কাণ্ড থেকে উদ্ভূত।

প্রাণের এই সর্বব্যাপী একক রূপটি সম্পর্কে ষোল শতকের আগে পর্যন্ত জীববিজ্ঞানীদের স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এই ধারণাও ছিল না যে কোনো রকম অলৌকিক সাহায্য ছাড়াই প্রজাতির মধ্যে পরিবর্তন আসে ও নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়। প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মেই ব্যাপারটি ঘটতে থাকে। সেখানে এমন চিন্তা করাটা ঠিক নয় যে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হবার জন্যেই প্রজাতির উদ্ভব।

ষোল শতকের আগে পর্যন্ত এই নতুন ভাবনা জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে আসতে পারেনি। আসা সম্ভবও ছিল না। নতুন ভাবনায় ভাবিত হতে হলে নতুন মন চাই, নতুন তথ্য চাই। দুয়েরই তখনো পর্যন্ত অভাব ছিল। বিশেষ করে ছিল তথ্যের অভাব। পশুপাখি ও উদ্ভিদ সম্পর্কে খবর রাখা হত খুবই অসম্পূর্ণ ভাবে। না ছিল পূর্ণাঙ্গ তালিকা, না যথাযথ বিবরণ, না নামকরণ, না শ্রেণীবিন্যাস।

অনেক সময়েই উপকথার জগতের কল্পিত জীবজন্তুর সঙ্গে বাস্তব জগতের জীবজন্তুকে গুলিয়ে ফেলা হত। সব মিলিয়ে এমন একটা অবস্থা যে জীবের উৎপত্তি ও বিবর্তন সম্পর্কে কোনো একটি ধারণায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব ছিল না।

শ্রেণীবিন্যাস

প্রথম যে-বিজ্ঞানী এই বিশৃঙ্খল জগতে একটি নিয়মের সূত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করেছিলেন তিনি ক্যারোলাস লিনীয়াস (১৭০৭-৭৮)। তাঁর সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। আজ থেকে দুশো বছর আগে তিনি প্রায় ৪৪০০ প্রজাতির জীবের বিবরণ দিতে পেরেছিলেন। শুধু বিবরণ দেওয়া নয়, সঠিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করে সেই ৪৪০০ প্রজাতির জীবকে শ্রেণীবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর সময়ের জানাশোনা কোনো জীবকেই তিনি তালিকা থেকে বাদ দেননি। পরবর্তী দুশো বছরে এই তালিকা অবশ্যই বড়ো হয়েছে। এখন এই তালিকায় পাওয়া যাবে প্রায় দশলক্ষ জীবের নাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রজাতির সংখ্যা নিঃশেষ হবার কোনো লক্ষণ নেই। একমাত্র পোকামাকড়দের মধ্যেই প্রতি বছর ১০,০০০ নতুন প্রজাতির নামকরণ হচ্ছে। তার মানে, আমাদের পক্ষে এখনো সঠিক ভাবে বলা সম্ভব নয়, আমাদের এই পৃথিবীতে মোট কত সংখ্যক প্রজাতির বাস। তবে অনুমান করা যেতে পারে, প্রজাতির সংখ্যা কুড়ি লক্ষের কাছাকাছি। খুব সম্ভবত এই কুড়ি লক্ষের মধ্যে দশ লক্ষই হচ্ছে পোকামাকড়।

আলোচনায় আরও অগ্রসর হবার আগে শ্রেণীবিন্যাসের পদ্ধতি সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে নেওয়া যেতে পারে।

শিশু যখন কথা বলতে শেখে তখন গোড়াতেই তাকে শ্রেণীবিন্যাসের পাঠ নিতে হয়। সে যখন বলে ‘কুকুর’ বা ‘বেড়াল’ বা ‘ঘোড়া’ তখন বুঝতে হবে যে কয়েকটি জীবকে অন্য সমস্ত জীব থেকে পৃথক করে নিয়ে সে একটি দলে ফেলছে। এই দল কখনো হতে পারে

ছোট, কখনো বড়ো। যেমন, শিশুটি যখন বলে 'ইলিশ' বা 'রুই' —তখন সে কতকগুলো ছোট ছোট দলকে বোঝাতে চায়। কিন্তু সে যখন বলে 'মাছ'—তখন এই ছোট দলগুলো মিলে গিয়ে তৈরি হয় একটি বড়ো দল। এক্ষেত্রে দলের মধ্যে দল এসে যাচ্ছে।

জীবের শ্রেণীবিন্যাসের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটিও এই নীতির অনুসারী। বংশগত লক্ষণ মিলিয়ে মিলিয়ে দলের মধ্যে দল গঠন। তবে, বলাই বাহুল্য, জীবের শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খ ও যথাযথ বিচারের প্রয়োজন।

যেমন ধরা যাক, মানুষ। এই মানুষ নামক জীবটিকে নানা ধরনের দলে ফেলা যেতে পারে। মানুষের প্রজাতি (species)—হোমো স্যাপিয়েন্স্ (Homo sapiens) ; জাতি (genus)—হোমো ; গোত্র (family)—হোমিনিডী (Hominidae) ; বর্গ (order) —প্রাইমেট্স্ ; শ্রেণী (class)—স্তন্যপায়ী (Mammalia) ; পর্ব (phylum)—কোর্ডাটা (Chordata) ; সর্গ (kingdom)— অ্যানিম্যালিয়া (Animalia)।

এই সাতটির মধ্যে যে-কোনো একটি দলে মানুষকে ফেলা চলে। কোন্ দলে ফেলা হবে তা নির্ভর করবে কতখানি বিশেষভাবে মানুষকে উপস্থিত করার চেষ্টা হচ্ছে তার ওপরে।

জীবের শ্রেণীবিন্যাসের ব্যাপারটিকে তুলনা করা চলে পিরামিডের সঙ্গে। পিরামিডের ভূমিতে রয়েছে লক্ষ লক্ষ প্রজাতি আর চুড়োয় দুটি সর্গ। একটি সর্গে উদ্ভিদ, অন্য সর্গে প্রাণী (animal)।

তবে জীববিজ্ঞানীদের কাছে প্রজাতি-গত বিভাগটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, জীবজগতের স্বাভাবিক বিবিধায়ন সম্পর্কে ধারণা করতে হলে এই প্রজাতির দিকেই তাকাতে হবে। তাছাড়া, বিবর্তনবাদ গ্রাহ্য হবার পর থেকে জীববিজ্ঞানীরা জীবজগতের বিন্যাসটিকে এমনভাবে উপস্থিত করেন যাতে জীবের সঙ্গে জীবের সম্পর্কের দিকটি স্পষ্ট হয়। প্রজাতিগত বিভাগটাই এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। একটু আগে যে পিরামিডের কথা

বলেছি তাকে উলটিয়ে ধরলে জীবন-বৃক্ষের ছবিটি পাওয়া যেতে পারে—এই বৃক্ষের কাণ্ডে রয়েছে সর্গ আর একেবারে মগডাল-গুলোতে প্রজাতি

নামকরণ

সাধারণ মানুষের ভাষায় প্রত্যেকটি উদ্ভিদ ও প্রাণীর এক-একটি নাম আছে। যেমন বট, অশ্বত্থ, হাতি, টিকটিকি ইত্যাদি। কিন্তু এই নামগুলো শুনতে যতো সুন্দরই হোক, এ থেকে কোনো পরিচয় বেরিয়ে আসে না। পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রজাতির জীব আছে হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ। তেমনি নামও আছে হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ। কিন্তু শুধু এই নামের সাহায্যে জীবজগতের পরিচয় নিতে চেষ্টা করলে দিশেহারা হতে হবে। কারণ প্রত্যেকটি নাম যেমন আলাদা, প্রত্যেকটি জীবও তেমনি আলাদা। এই আলাদা-আলাদা জীবগুলো সম্পর্কে জানবার বিষয়েরও যেন শেষ নেই। যতো সামান্য জীবই হোক, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যেই কোনো জীবই আর শেষ পর্যন্ত সামান্য থাকে না। জীববিজ্ঞানীরা প্রত্যেকটি জীব সম্পর্কেই কৌতূহলী হবার অজস্র বিষয় খুঁজে পেয়েছেন।

জীবের সঙ্গে জীবের যেমন একদিকে রয়েছে মিল, তেমনি অন্যদিকে অমিল। অথচ তবুও, মিল বা অমিল কোনোটাই পুরোপুরি নয়। হাজার মিলের মধ্যেও অমিল থেকে যায়, হাজার অমিলের মধ্যেও মিল। জীবজগতকে যতোই পর্যবেক্ষণ করা যাবে ততোই মনে হবে জীবজগতের সমস্তটাই যেন প্রকাণ্ড একটা বিশৃঙ্খলা। সেখানে তথ্য এতই বেশি ও এতই বিচিত্র যে সেগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে কোনো একটি নিয়মের সূত্রে উপস্থিত করা হয়তো সম্ভব নয়।

তাই বলে একেবারেই অসম্ভব, তাও জীববিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন না। যতো অসম্পূর্ণ ভাবেই হোক, যদি কতকগুলো নীতি

ও ধারণার ভিত্তিতে জীবজগতটিকে বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে জীবজগতের সামগ্রিক একটি রূপও যেন বেরিয়ে আসে।

আমরা স্বীকার করে নিয়েছি যে জীবজগতের বর্তমান রূপটি কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের ফল। আর বিবর্তন যদি ঘটে থাকে, তাহলে এও স্বীকার করতে হবে যে কোনো কোনো প্রজাতির সঙ্গে কোনো কোনো প্রজাতির রক্তের সম্পর্ক খুবই নিকট। ফলে তাদের মধ্যে সাদৃশ্যও খুবই বেশি। উল্‌টো দিকে, কোনো কোনো প্রজাতির সঙ্গে কোনো কোনো প্রজাতির রক্তের সম্পর্ক খুবই দূর; ফলে সাদৃশ্যও খুবই কম। তার মানে, কথাটা দাঁড়ায়, বিভিন্ন জীবের মধ্যে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের মাত্রা বিচার করে জীবজগৎ সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণায় উপস্থিত হওয়া চলে।

জীববিজ্ঞানীরা এই সাদৃশ্যের সূত্র ধরেই অগ্রসর হয়েছেন। সমগ্র প্রাণীজগতকে তাঁরা বিভক্ত করেছেন প্রায় বারোটি প্রধান পর্বে। যেমন, একটি পর্ব মেরুদণ্ডী প্রাণীদের নিয়ে। এই পর্বটির নাম মেরুদণ্ডী বা কোর্ডেট্‌স্ (Chordates)। মানুষ এই পর্বেরই অন্তর্ভুক্ত। আরেকটি পর্বের নাম অ্যান্‌থ্রোপোড্‌স (Anthropods) বা বহুগ্রন্থি-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট। এই পর্বে রয়েছে কীটপতঙ্গ। এমনি ভাবে বিশেষ বিশেষ লক্ষণের ভিত্তিতে অন্যান্য পর্ব।

প্রত্যেকট পর্ব বিভক্ত হয়েছে কয়েকটি শ্রেণীতে, প্রত্যেকটি শ্রেণী কয়েকটি বর্গে, প্রত্যেকটি বর্গ কয়েকটি গোত্রে, প্রত্যেকটি গোত্র কয়েকটি জাতিতে, প্রত্যেকটি জাতি কয়েকটি প্রজাতিতে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, জীবজগতকে প্রথমে ভাগ করা হয়েছে দুটি প্রধান সর্গে। উদ্ভিদ ও প্রাণী। প্রত্যেকটি সর্গকে আবার ভাগ করা হয়েছে পর্ব থেকে প্রজাতি পর্যন্ত অনেকগুলো শাখাপ্রশাখায়। এইভাবে সমগ্র জীবজগতটি একটি নিয়মের সূত্রে বাঁধা পড়ে যাচ্ছে। কোনো একটি জীবকে কতকগুলো বিশেষ লক্ষণের জন্যে উদ্ভট মনে হতে পারে, কিন্তু তাকেও বিশেষ একটি দলে পড়তেই হবে। যেমন, আজকের দিনে সীলাকন্থকে আমরা উদ্ভট মনে করব কিন্তু

সীলাকন্থ দলছাড়া নয়। অন্যদিকে, যেহেতু আমরা জীবজগতের পুরো ছবিটি আগে থেকে এঁকে নিতে পেরেছিলাম, সেজন্যে সীলা-কন্থকে চোখে দেখার আগেও সীলাকন্থের বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের অজানা ছিল না। ঠিক এমনি ভাবেই পিথিক্যানথ্রপাস আবিষ্কৃত হবার আগেই পিথিক্যানথ্রপাসের চেহারা সম্পর্কে আভাস দিতে পারা গিয়েছিল।

এই কারণে শুধু নাম থেকেই জীবকে চিনে নেবার সুবিধের জন্যে জীববিজ্ঞানীরা প্রত্যেকটি জীবের বৈজ্ঞানিক নামকরণ করেছেন। এই নামকরণের জন্যে ল্যাটিন ভাষার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি নামের দুটি অংশ—প্রথম অংশে উল্লিখিত হয় জীবটির জাতি, দ্বিতীয় অংশে প্রজাতি। দুয়ে মিলে পুরো নাম।

যেমন, আমাদের একটি অতি পরিচিত প্রাণী—ব্যাঙ। আমরা জানি, ব্যাঙ নানা ধরনের হয়ে থাকে। কিন্তু শুধু ব্যাঙ বললে বোঝা সম্ভব নয় কোন্ ধরনের ব্যাঙের কথা বলা হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক নামকরণে ব্যাঙের জাতিগত নাম—রানা (Rana)। উপজাতিগত নাম অবশ্যই বিভিন্ন হয়ে থাকে। দুয়ে মিলে পুরো নামটি যখন পাওয়া যায় তখন পরিচয়টি জানতেও আর বাকি থাকে না। আমরা যখন বলি বট বা অশ্বত্থ, তখন দুটি আলাদা গাছের চেহারা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে যে কোনো মিল আছে তা এই দুটি পৃথক নাম থেকে বোঝার উপায় নেই। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন ফাইকাস বেঙ্গলেনসিস ও ফাইকাস রিলিজিওসা। এই নাম দুটি শোনা মাত্রই ধরে নেওয়া চলে যে দুটি গাছের জাতি এক।

প্রত্যেকটি জীবেরই এমনই একটি বৈজ্ঞানিক নাম আছে। এই নামের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় জীবজগতের বিন্যাসে তার স্থান কোথায়। এই বিন্যাসের প্রধান প্রধান ধারাগুলো সম্পর্কে যদি আমাদের ধারণা থাকে, তাহলে এই বিশেষ জীবটি সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা করে নেওয়া অসম্ভব নয়। আর শুধু এই বিশেষ

জীবটি সম্পর্কেই নয়, তার জ্ঞাতিদের সম্পর্কেও। অর্থাৎ, আমরা সঙ্গে সঙ্গে ধারণা করতে পারি, এই জীবটির সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে আর কোন্ কোন্ জীবের, তাদের সংখ্যাই বা কত বা তাদের বৈশিষ্ট্যই বা কী।

অভিযোজন

তবে জীবের সঙ্গে জীবের সাদৃশ্য খুঁজতে গিয়ে শুধু চেহারার দিকে বা রক্তের সম্পর্কের দিকে নজর রাখাটাই যথেষ্ট নয়। জীবের ওপরে পরিবেশের প্রভাবের ব্যাপারটিও মনে রাখা দরকার।

জীবের অস্তিত্ব বজায় থাকার একটি প্রধান শর্ত, পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারা। জীবজগতের বিবর্তনের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক খুবই বেশি। জীবকে অবশ্যই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হবে। এরই নাম অভিযোজন (adaptation)।

প্রথমে পৃথিবী নামক এই গ্রহটির কথাই ধরা যেতে পারে। পৃথিবীতে জীবের যে-সব নমুনা পাওয়া যাচ্ছে তা বিশেষ করে পৃথিবীর বিশেষ পরিবেশের মধ্যেই সম্ভব। বৃহস্পতি গ্রহে যদি জীবের অস্তিত্ব থাকত তাহলে বৃহস্পতির বিশেষ পরিবেশের দরুনই সেখানকার জীব হত অন্য ধরনের। পৃথিবীর চেয়ে বৃহস্পতির মাধ্যাকর্ষণ ২·৬৪ গুণ বেশি। শুধু এইটুকু পার্থক্যের জন্যেই বৃহস্পতির সম্ভাব্য জীবের শরীরের গড়ন হওয়া দরকার অন্য ধরনের। যেমন, ঘোড়া বা হরিণ ধরনের জীব বৃহস্পতি গ্রহে কিছুতেই সম্ভব নয়। সেখানে অধিকতর মাত্রার মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে জীবের পা-গুলো হওয়া দরকার মোটা মোটা আর ভারী ভারী। যতোদূর মনে হয়, আকাশচারী জীব বৃহস্পতি গ্রহে একেবারেই অসম্ভব। এমন কি আমাদের এই পৃথিবীতেও আকাশচারী জীবের যে-সব নমুনা পাওয়া যাচ্ছে তা আকারে খুবই ছোট হয়ে থাকে।

বিষয়টিকে আরো নানা দিক থেকে দেখা যেতে পারে। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এমন কোনো জীবের সাক্ষ্য পওয়া যায়নি যার শরীরে রঞ্জনরশ্মির বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা আছে, বা, এমন কোনো ইন্দ্রিয় আছে যার সাহায্যে রঞ্জনরশ্মির অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। কারণ খুবই স্পষ্ট। ভূপৃষ্ঠের যে বিশেষ পরিসরে জীবের জীবনধারণ সেখানে সূর্যের আলোর রঞ্জনরশ্মি পৌঁছতে পারে না, তার আগেই বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

আরো দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে। আমরা আজকের দিনে যে পরিবেশে বাস করি সেখানে বৈদ্যুতিক তারের অভাব নেই। বৈদ্যুতিক শকে মৃত্যুর সংখ্যাও যথেষ্ট। তা সত্ত্বেও আমাদের শরীরে এমন কোনো আয়োজন নেই যার সাহায্যে তারের মধ্যে বিদ্যুতের প্রবাহ আছে কিনা তা আমরা বুঝতে পারি। এক্ষেত্রেও কারণ খুবই স্পষ্ট। প্রকৃতির রাজ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ এতই অল্প মাত্রার যে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়। আর কখনো কখনো বজ্রপাতের মতো এতই বেশি মাত্রার যে তাকে আয়ত্তে আনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

এমনি ভাবে ভাবতে বসলে দেখা যাবে, জীবের শরীরের আয়োজন কেমনধারা হবে তা নির্ভর করছে পরিবেশের ওপরে। জীবজগতের বিবর্তনে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা বা অভিযোজন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাজেই জীবের শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রেও এই বিষয়টিকে অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে।

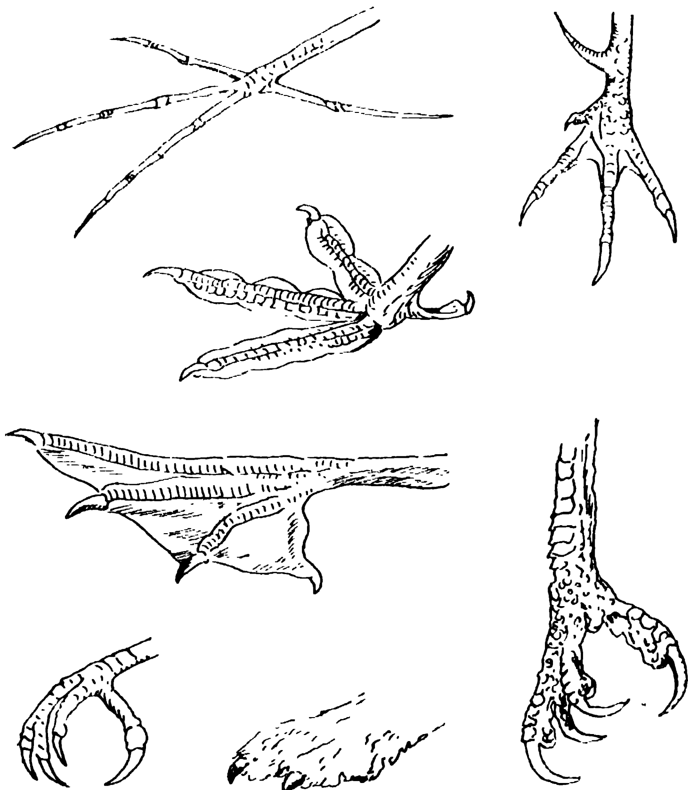
এই সঙ্গেই আরো একটি কথা এসে পড়ে। অভিযোজনের ফলে জীবের শারীরিক উন্নতিও হয়ে থাকে। শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে এই বিষয়টিও বিচার্য। কারণ, রক্তের সম্পর্কে সাদৃশ্য আছে এমন জীবের মধ্যেও একদল হতে পারে উচ্চতর, অপর দল নিম্নতর। উচ্চতর জীবরা অবশ্যই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার ব্যাপারে অধিকতর যোগ্য। তার মানে, পরিবেশের সঙ্গে খাপে খাইয়ে চলার ব্যাপারে কোন্ জীব কতখানি যোগ্য তা বুঝতে হলেও উচ্চতর ও নিম্নতর জীবের পার্থক্যটি স্পষ্ট করা দরকার।

অভিযোজনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত

পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে গিয়ে জীবের শরীরে যে-সব লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যেতে পারে।

পাখি ও স্তন্যপায়ীদের শরীরের উত্তাপ সাধারণত পরিবেশের উত্তাপের চেয়ে বেশি মাত্রার হয়ে থাকে। কাজে কাজেই তাদের শরীরে এমন আয়োজনও থাকা দরকার যাতে শরীরের উত্তাপ আচমকা খোয়া না যায়। এই আয়োজনটি পাওয়া যায় পাখির শরীরের পালকে ও স্তন্যপায়ীর শরীরের লোমে।

হাঁস বা অন্যান্য যে-সব পাখিকে জলে সাঁতার কাটতে হয় তাদের



ভিন্ন ভিন্ন পাখির পা। কোন্ পায়ের সাহায্যে কী ধরনের কাজ করা হয় তারই ওপরে নির্ভর করে পায়ের গড়ন

পায়ের পাতা হয় পরদাযুক্ত। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তাই হয়ে থাকে। আবার এমন পাখিও আছে যারা জলে সাঁতার কাটে না কিন্তু যারা জলজ উদ্ভিদের ভাসমান পাতার ওপরে বসে খাদ্যসংগ্রহের জন্যে। এই পাখির পায়ের আঙুলগুলো হয় সরু-সরু আর লম্বা-লম্বা। শিকারী পাখিদের পা হয়ে থাকে বাঁকানো ও তীক্ষ্ণ নখরযুক্ত। এমনি ভাবে, কোনো পাখির পা ছুটবার উপযোগী, কোনো পাখির পা আঁকড়ে ধরার উপযোগী, কোনো পাখির পা আঁচড় দেবার উপযোগী। পায়ের গড়ন নির্ভর করে কোন্ পাখি কি-ভাবে বেঁচে থাকে তার ওপরে। বেঁচে থাকার লড়াইয়ে জয়লাভ হয় তাদেরই যাদের শরীরের আয়োজনটিও বিশেষ ধরনের লড়াইয়ের উপযুক্ত।

এই আয়োজনটি যে কত বিচিত্র হতে পারে, জীবজগতে তার নিদর্শন অজস্র। এক ধরনের সাপ আছে যারা চোয়ালের খিল খুশিমতো আল্‌গা করতে পারে। এই আয়োজনটি আস্তো ডিম গিলবার সুবিধের জন্যে। কিন্তু ডিম যদি পেটের মধ্যে গিয়েও আস্তো থাকে তাহলে আর খাদ্য হিসাবে তার কোনো সার্থকতা থাকে না। এজন্যেই, এই সাপের শরীরের মধ্যে এমন একটি হাড় আছে যার সাহায্যে ডিমটি ভাঙা হয়।

পরিবেশের প্রভাব আরো নানাভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে। সাধারণত দেখা যায়, জীবের গায়ের রঙ হয় এমন যাতে পরিবেশের সঙ্গে সে সহজেই মিশে যায়। এক্ষেত্রে একদিকে যেমন সে শত্রুর আক্রমণ থেকে নিস্তার পায়, অন্যদিকে অতি অলক্ষ্যে শিকারের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যে জীব 'কামুফ্লাজে' যতো নিপুণ, বেঁচে থাকার সংগ্রামে তার জয়লাভের সম্ভাবনাও ততো বেশি। জীবজগতে এই নিপুণতার অজস্র নিদর্শন আছে। মেরুদেশের বরফের রাজ্যে অধিকাংশ প্রাণীই হয় সাদা। মরুভূমির বালির রাজ্যে অধিকাংশ প্রাণীই হয় বালিরঙের। সুন্দরবনের অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে তাঁরা জানেন, সুন্দরবনের বাঘের গায়ের রঙটিই এমন যে পরিবেশ থেকে আচমকা আলাদা করে চেনা যায় না। ইংলণ্ডে

'বিস্টোন বেটুলারিয়া' নামে এক ধরনের প্রজাপতি পাওয়া যায় যাদের গায়ের রঙ একশো বছর আগে ছিল সাদা, এখনো গ্রামাঞ্চলে সাদাই আছে, কিন্তু শিল্পাঞ্চলে হয়ে উঠেছে কাল্‌চে। এই পরিবর্তনের কারণ অনুমান করা শক্ত নয়। আসলে একশো বছর আগেও সাদা ও কাল্‌চে দু-ধরনের প্রজাপতিই ছিল। দিনের বেলা গাছের গুঁড়ির ওপরে এই প্রজাপতিগুলো যখন বসে থাকত তখন সাদা বাকলের ওপরে সাদা প্রজাপতিগুলোকে বড়ো সহজে দেখা যেত না। শিকারী পাখির চোখ গিয়ে পড়ত কালো প্রজাপতির ওপরে। ফলে কালো প্রজাপতিরাই বেশি সংখ্যায় পাখির খাদ্য হত। কিন্তু একশো বছরের মধ্যে শিল্পাঞ্চলে চিমনির ধোঁয়ায় গাছের বাকল কালো হয়ে উঠেছে। ফলে এই শিল্পাঞ্চলে গাছের বাকলের ওপরে কালো প্রজাপতিরাই মিশ খায় ভালো। ফলে কালোরা বেঁচে যায় আর পাখির খাদ্য হয় সাদারা।

আরেক দল জীব অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে অনুকৃতির (mimicry) আশ্রয় নিয়ে থাকে। অনুকৃতি মানে নকল করার চেষ্টা। যেমন, প্রকৃতিরাজ্যে বেশ কিছু সংখ্যক নিরীহ ও নির্বিষ পতঙ্গ আছে যারা হুবহু বোলতার মতো দেখতে। জীবজগতে বোলতার দুর্নাম তার বিষভরা হুলটির জন্যে। বোলতাকে সবাই এড়িয়ে চলে। ফলে, বোলতার মতো দেখতে নিরীহ ও নির্বিষ পতঙ্গগুলোকেও বোলতা-ভ্রমে এড়িয়ে চলা হয়।

তাছাড়া, অনুকৃতি বাদ দিলেও, পরিবেশের প্রভাবে বিভিন্ন জীবের শরীরের গড়নে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। মাছের শরীরকে দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়া চলে। জলের মধ্যে দ্রুত চলাফেরার সুবিধের জন্যে মাছের শরীরটি হয়ে থাকে 'স্ট্রীমলাইনড্'। কিন্তু জলের জীবনকে যারাই আশ্রয় করে তাদের সকলের শরীরই এমনিধারা হয়ে থাকে। দুটি পরিচিত দৃষ্টান্ত—ইক্‌থিওসরাস (সরীসৃপ) ও তিমি (স্তন্যপায়ী)।

এমনি ভাবে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার চেষ্টার মধ্যে

দিয়ে প্রত্যেকটি জীবই কতকগুলো শারীরিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গড়ন হয় এমন যা বিশেষ বিশেষ চাহিদা পূরণের উপযোগী। আর সব মিলিয়ে শরীরের গড়নটাই হয় এমন যাতে বিশেষ ধরনের জীবনযাত্রার প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।

এখানে একটি বিষয়ে সাবধান করার আছে। কথাটা বইয়ের শুরুতে একবার বলেছি, আবারও বলছি। শারীরিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করাটা জীবের স্বেচ্ছাকৃত ব্যাপার নয়—প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল। জীবের শরীরে নিয়তই বিবিধায়ন ঘটছে। বিবিধায়নের ফলে জীবের শরীরে নানা পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। যে-সব পরিবর্তন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার ব্যাপারে সহায়ক সেগুলোই টিকে থাকে, বাকিগুলো লোপ পায়।

যোগ্যতমের টিকে থাকার ব্যাপারটি অন্য আরেক দিক থেকেও বিবেচনা করা যেতে পারে। জীবজগতে সকল জীবের উন্নতি একই স্তরের নয়। জীব হিসাবে কোনোটি নিম্নতর, কোনোটি উচ্চতর। বিষয়টিকে বোঝবার সুবিধের জন্যে একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক।

একটি বাড়ি, সঙ্গে পুকুর ও বাগান। বাড়ির মধ্যে রয়েছে একজন মানুষ, বাগানের ফুলগাছে একটি পোকা, উঠোনের পুকুরে একটি মাছ, একটি হাইড্রা ও একটি অ্যামিবা।* এই পরিবেশ ও এই সমন্বয় অনায়াসেই কয়েক বর্গগজ এলাকার মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে উল্লিখিত ছ-টি জীবের মধ্যে মানুষ উচ্চতম, অ্যামিবা নিম্নতম।

কিন্তু এত কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও এই ছ-টি জীবের পরিবেশ সমান মাত্রার নয়। এক এক করে ধরা যাক।

* অ্যামিবা এক প্রকার প্রাথমিক জীব, দেহের মাপ এক-ইঞ্চির প্রায় একশো ভাগের একভাগ। জেলির মতো পদার্থে দেহ গঠিত। আর হাইড্রা হচ্ছে ক্ষুদ্র নলাকৃতি জল-জীব। মুখের কাছে ছ-টা থেকে আটটা পর্যন্ত শোঁয়া থাকে। শোঁয়া সমেত লম্বায় আধ ইঞ্চি পর্যন্ত হতে পারে।

অ্যামিবার পরিবেশ খুবই সামান্য। মোটের উপর এক মিলিমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে। এই এলাকার বাইরে যা কিছু ঘটে তার দরুন অ্যামিবার মধ্যে কোনো সাড়া জাগে না। এমন কি বাইরে থেকে যদি কোনো আলোকের বা কম্পনের ঢেউ তাকে ধাক্কা দেয় তাহলেও তার শরীরের প্রতিক্রিয়া খুবই প্রাথমিক ধরনের। আলোক বা কম্পনের উৎস সম্পর্কে কোনো খবর সংগ্রহ করবার কিছুমাত্র আয়োজন অ্যামিবার শরীরে নেই।

হাইড্রার উন্নতি অ্যামিবার তুলনায় সামান্যই। অ্যামিবার পরিবেশের ব্যাসার্ধ যেখানে এক মিলিমিটার, হাইড্রার সেখানে কয়েক সেন্টিমিটার। তার বাইরে অ্যামিবা ও হাইড্রা একই স্তরের জীব। পোকা অবশ্যই উন্নততর জীব, কিন্তু ইন্দ্রিয় বলতে আমরা যা বুঝি তা এই পোকার শরীরে নেই। এই জীবটি কোনো জিনিসের আকার বা রঙ বা দূরত্ব বুঝতে পারে না এবং শব্দ শুনতে পায় না। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কহীন জীবন। এ-তুলনায় মাছকে অবশ্যই আরো উন্নত জীব বলে স্বীকার করতে হবে। তবুও মাছের পরিবেশ জলের এলাকাতেই সীমাবদ্ধ। তবে কুকুরের সম্পর্কে প্রথমেই স্বীকার করতে হবে যে কুকুরের চোখ কান ও নাক তিনটি ইন্দ্রিয়ই খুব প্রখর। ভূপৃষ্ঠে খুশিমতো চলেফিরে বেড়াবার ক্ষমতাও কুকুরের আছে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পরিবেশকে যতোখানি জানা যেতে পারে তা বিচার করলে কুকুর মানুষের চেয়ে কোনো অংশে খাটো নয়। কিন্তু মানুষের মতো চিন্তা করার ক্ষমতা কুকুরের নেই। যেমন, কোনো কুকুরের পক্ষে কোনো কালেই আবিষ্কার করা সম্ভব নয় যে আকাশের মেঘ চন্দ্র ও সূর্যের দূরত্ব এক নয়। কিন্তু মানুষের হাতে আছে টেলিস্কোপ, স্পেকট্রো-স্কোপ ও গণিতের সূত্র, যার সাহায্যে আকাশের খুঁটিনাটি বিষয়ও তার জানা হয়ে যায়। আর এই জানাটা শুধু তার নিজের নয়, অন্য সমস্ত মানুষকেও সে জানিয়ে যেতে পারে।

যে ছ-টি জীবকে দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা হয়েছে, তাদের আকার ও

শরীরের জটিলতা বিভিন্ন মাত্রার। অ্যামিবা এককোষী জীব, হাইড্রার শরীরে কোষের সংখ্যা কয়েক হাজার, পোকার শরীরে কয়েক লক্ষ, কুকুর ও মানুষের শরীরে কোটি কোটি। তাছাড়া, মানুষ ও কুকুরের শরীরে যতো রকমের কোষ আছে, অ্যামিবা বা হাইড্রা বা এমন কি পোকার শরীরেও তা নেই। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে কোষের সংখ্যা ও প্রকার বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের ওপরে জীবের আধিপত্যও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অ্যামিবা বা হাইড্রার এমন ক্ষমতা নেই যে বন্যা বা খরা থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারে। পোকাকে জীবন কাটাতে হয় অতি সীমাবদ্ধ একটি পরিসরের মধ্যে। মাছের চলাফেরার পরিধি অবশ্য অনেকখানি বিস্তৃত, বিরূপ অবস্থায় মাছের পক্ষে বাসা বদল করাও অসম্ভব নয়—কিন্তু সর্ব অবস্থাতেই মাছকে জলের মধ্যেই থাকতে হয়। কুকুরের বিচরণ-ক্ষেত্রও পৃথিবীর স্থলভাগের সীমানার মধ্যে। মানুষই একমাত্র জীব জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে যার সমান আধিপত্য।

বিষয়টিকে যদি তলিয়ে বিচার করা যায় তাহলে দেখা যাবে, পরিবেশের ওপরে কোনো কোনো জীবের আধিপত্য অপেক্ষাকৃত বেশি মাত্রায়। আধিপত্য না বলে নিয়ন্ত্রণ বললেও ভুল হয় না। কোনো কোনো জীব অপেক্ষাকৃত বেশি মাত্রায় পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আর নিয়ন্ত্রণ করা মানেই জয় করা। যেমন, বন্যা বা খরার অবস্থায় মনুষ্যেতর জীব অসহায় বোধ করে (আদিম মানুষরাও করত), কিন্তু একমাত্র মানুষেরই এমন আয়োজন আছে যার ফলে বন্যার বা খরার প্রতিরোধ সম্ভব। কুকুর চাষ করছে বা নদীতে বাঁধ দিচ্ছে—এমন কথা ভাবাও যায় না। মাছ বা পোকা বা হাইড্রা বা অ্যামিবার বেলাতেও নয়।

এবারে একটি সিদ্ধান্ত টানা যেতে পারে। কোন্ জীব কতখানি উন্নত তা বোঝা যেতে পারে জীবটি পরিবেশকে কতখানি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে তা থেকে। এই উন্নতির লক্ষণ ফুটে উঠবে তার শরীরের গড়নে এবং ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের সাহায্যে লব্ধ বাইরের পৃথিবী

সম্পর্কে তার জ্ঞানের মাত্রাভেদে।

ফসিলের নিদর্শন থেকে জীবজগতের পরিবর্তনের যে ধারাটি আমরা আবিষ্কার করেছি তাতে একটি বিষয়ে কোনো অস্পষ্টতা নেই। যে জীব যতো উন্নত তার উদ্ভব ততো শেষের দিকে। কথাটা উলটিয়ে বললেও ভুল হয় না। জীবজগতের আদি পর্বে ছিল শুধু নিম্নতর জীব।

মানুষকে পাওয়া যাচ্ছে প্রায় দুশো কোটি বছরের বিবর্তনের একেবারে শেষ পর্বে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে উচ্চতম জীব মানুষ আসার পরেও নিম্নতম জীব অ্যামিবা লোপ পায়নি। জীবজগতের শেষ পঞ্চাশ কোটি বছর নিয়ে আমরা যে-আলোচনা করেছি তাতেও দেখা গিয়েছে, উচ্চতর জীব আসার পরেও নিম্নতর জীবের নিদর্শন অবর্তমান নয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা চলে, মধ্যজীবীয় যুগে আধিপত্য-বিস্তারী জীব ছিল সরীসৃপ। কিন্তু টারশিয়ারী কালে যখন স্তন্যপায়ীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তখনো কিন্তু সরীসৃপরা পুরোপুরি লোপ পায়নি। তেমনি, স্তন্যপায়ীদের মধ্যে উচ্চতম জীব মানুষ আসার পরেও নিম্নতমদের অস্তিত্ব থেকে গিয়েছে।

বিবর্তনের এই বৈশিষ্ট্যটি বিশেষ ভাবে মনে রাখা দরকার। উচ্চতর জীবের উদ্ভব নিম্নতর থেকে—শুধু এইটুকু বললেই বিবর্তন সম্পর্কে সব কথা বলা হয়ে যায় না। সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে, উচ্চতর জীবের উদ্ভব হবার পরেও নিম্নতরের অস্তিত্ব বজায় থাকে। অর্থাৎ, বলা যেতে পারে, বিবর্তনের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে উন্নত জীবের উন্নততর হওয়ার মধ্যে। অভিযোজনের অন্যতম লক্ষণ জীবজগতের এই ক্রমোন্নতি।

তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি, আমাদের এই পৃথিবীতে প্রাণের সূত্রপাত হয়েছিল খুবই সরল এবং সম্ভবত খুবই ক্ষুদ্র আকারে। তারপর দুশো কোটি বছর ধরে বিবর্তনের পথে সেই সরল ও ক্ষুদ্র প্রাণ জটিল ও বৃহৎ হয়েছে এবং তার ফলে উদ্ভূত হয়েছে লক্ষ লক্ষ

প্রজাতি। আজকের দিনের পৃথিবীতে যে-সব জীবের অস্তিত্ব বজায় আছে তাদের সংখ্যাই কয়েক লক্ষ। কিন্তু যে-সব প্রজাতির অস্তিত্ব নেই, অর্থাৎ বেঁচে থাকার সংগ্রামে যারা হেরে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে, তাদের সংখ্যা আরো অনেক বেশি।

জীবনের দুটি মৌলিক লক্ষণ হচ্ছে পুষ্টি ও বংশরক্ষা। এই লক্ষণ দুটি প্রত্যেকটি জীবের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়াও, কোন্ জীব কি-ভাবে বেঁচে থাকে তারই ওপরে নির্ভর করে আরো অনেকগুলো লক্ষণ প্রত্যেকটি জীবের মধ্যে প্রকাশ পায়। বিশেষ করে এই লক্ষণগুলোকে বিচার করলেই জীবজগতের বিবর্তন ও ক্রমোন্নতির ধারাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তখন আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান এই বিশৃঙ্খল জীবজগতটিও একটি নিয়মের সূত্রে বিন্যস্ত হতে পারে।

অবিচ্ছিন্ন ধারা

গত পঞ্চাশ কোটি বছরে প্রাণের বিবর্তন যে-সব ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে তার অতি সংক্ষিপ্ত একটি ছবি আমরা পেয়েছি। ছবিটি উপস্থিত হয়েছে টুকরো টুকরো অংশে বিভক্ত হয়ে। কিন্তু পুরো ছবিটিকে যদি একসঙ্গে চোখের সামনে রাখা যায় তাহলে ধারণা হবে, প্রাণের নিদর্শন ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও একটি অবিছিন্ন ধারায় প্রবাহিত। কালের দিক থেকে তো বটেই, এমন কি স্থানের দিক থেকেও। কথাটা একটু ব্যাখ্যা করা যাক।

ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও প্রাণের প্রবাহটি যে অবিচ্ছিন্ন—এই কথাটির ওপরে আমরা এতক্ষণের আলোচনায় বারবার জোর দিয়ে এসেছি। আদিম সমুদ্রের কীট থেকে মাছ, মাছ থেকে উভচর জীব, উভচর জীব থেকে সরীসৃপ, সরীসৃপ থেকে পাখি ও স্তন্যপায়ী, স্তন্যপায়ী থেকে মানুষ—এই মূল ধারাটিতে কোনো ছেদ নেই। এই ছেদহীন ধারাটিকে অনুধাবন করবার জন্যে আমরা একটি তত্ত্বেরও আশ্রয় নিয়েছি।

এই তত্ত্বটির নাম বিবর্তনবাদ।

কিন্তু প্রাণের প্রবাহকে স্থানগত পটভূমিতে স্থাপন করলেও ছেদহীনতার অন্যতর একটি ছবি পাওয়া যায়। এই স্থানগত পটভূমিটির নাম দেওয়া হয়েছে জীবমণ্ডল (biosphere)। ১৮০৯ সালে ফরাসী জীববিজ্ঞানী লামার্ক এই নামটির প্রবর্তন করেন। এই নামের সাহায্যে তিনি পৃথিবী নামক গ্রহের সেই বিশেষ পরিসরটুকুকে বোঝাতে চেয়েছেন যার আশ্রয়ে পৃথিবীর এই বিচিত্র জীবজগতটি টিকে রয়েছে। আমরা জানি, পৃথিবীতে জীবজগতের অস্তিত্ব একমাত্র ভূপৃষ্ঠের এলাকাতেই। এই এলাকাটি খুবই সংকীর্ণ। সমুদ্রের কয়েক হাজার ফুট গভীরতা থেকে বায়ুমণ্ডলের কয়েক হাজার ফুট উচ্চতা পর্যন্ত। পৃথিবীতে কুড়ি লক্ষ প্রজাতির জীব থাকতে পারে কিন্তু সকলেরই বিচরণক্ষেত্র এই কয়েক হাজার ফুট বিস্তৃত ভূপৃষ্ঠের অতি সংকীর্ণ একটি এলাকা—তার বাইরে কিছুতেই নয়। ভূপৃষ্ঠের জীব-পরিপোষক এই বিশেষ এলাকাকেই বলা হয়েছে জীবমণ্ডল। কয়েক হাজার মাইল ব্যাস বিশিষ্ট এই পৃথিবীতে জীবমণ্ডলের বিস্তৃতি মাত্র কয়েক হাজার ফুট। ভূপৃষ্ঠের আয়তন ১৯.৭ কোটি বর্গমাইল। তার মধ্যে ১৪ কোটি বর্গমাইল, বা মোট আয়তনের শতকরা ৭১ ভাগ হচ্ছে সমুদ্র। মাত্র ৫.৭ কোটি বর্গমাইল, বা মোট আয়তনের শতকরা ২৯ ভাগ হচ্ছে মহাদেশ। সবচেয়ে বড়ো সমুদ্র প্রশান্ত মহাসাগর, আয়তনে ৬.৬ কোটি বর্গমাইলেরও বেশি। ভূপৃষ্ঠের মোট আয়তনের তিনভাগের একভাগ জুড়ে আছে এই মহাসমুদ্রটি।

এখনো পর্যন্ত যতোদূর জানা গিয়েছে, মহাসমুদ্রের গভীরতম এলাকাতেও জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে। এমন কি, সমুদ্রের তলদেশে যে-সমস্ত গভীর খাদ রয়েছে—তার মধ্যেও কোনো না কোনো জীবনের নিদর্শন পাওয়া সম্ভব।

মহাদেশের এলাকায় জীবন কিন্তু সমুদ্রের এলাকার জীবনের মতো সর্বত্র ছড়িয়ে নেই। তার কারণ, মহাদেশের এলাকার বেশ বড়ো

একটি অংশ—শতকরা প্রায় বারো ভাগ—সারা বছর বরফ ও তুষারে ঢাকা থাকে। এটি জীবনের পক্ষে খুব অনুকূল পরিবেশ নয়। এই বিশেষ এলাকায় জীবন বলতে আছে সীল, পেঙ্গুইন ও কয়েক ধরনের উদ্ভিদ। সপুষ্পক উদ্ভিদ আজ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে মাত্র দু-ধরনের।

এই তুষার ও বরফের এলাকার বাইরেও জীবমণ্ডলটির বৈচিত্র্য বড়ো কম নয়। কোথাও মহাসমুদ্র, কোথাও মহাদেশ; আবার মহাদেশের এলাকাতেও কোথাও অরণ্য, কোথাও তৃণভূমি, কোথাও নদী। তবে এতসব বৈচিত্র্য সত্ত্বেও জীবমণ্ডলের তিনটি প্রধান বিভাগ মেনে নেওয়া চলে: সমুদ্র, ডাঙ্গা, মিষ্টি জল। এই তিনটি এলাকার পরিবেশ তিন রকমের। স্বভাবতই ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে জীবনের লক্ষণও ভিন্ন ভিন্ন। জীবজগতের বিবর্তন নিয়ে আমরা আগে যে আলোচনা করেছি তাতে লক্ষ্য করা গিয়েছে যে সমুদ্রের জীব ও ডাঙ্গার জীব ও মিষ্টি জলের জীবের মধ্যে নানা বিষয়ে পার্থক্য এসে যায়। কিন্তু এই পার্থক্য নিতান্তই খুঁটিনাটি ব্যাপারে। সমুদ্রের জীব, ডাঙ্গার জীব ও মিষ্টি জলের জীবের মধ্যে মৌলিক মিলও অবশ্যই আছে। কিন্তু সবচেয়ে মুশকিল বাধে যখন আমরা কোথাও একটি সীমানা টেনে বলতে চাই, এখানে সমুদ্রের জীবন শেষ ও ডাঙ্গার জীবন শুরু বা এখানে ডাঙ্গার জীবন শেষ ও মিষ্টি জলের জীবন শুরু। সমুদ্রের জীবন ও ডাঙ্গার জীবন যে পরস্পরের সঙ্গে কতখানি সম্পর্কিত এবং পরস্পরের মধ্যে কতখানি সম্প্রসারিত তা বোঝা যায় সমুদ্রের কোনো দ্বীপে উপস্থিত হলে। তেমনি নদীর খাঁড়িতে বা সমুদ্র-উপকূলের জলাভূমিতে উপস্থিত হলে লক্ষ্য করা যাবে সমুদ্রের জীবন ও মিষ্টি জলের জীবন একাকার হতে চাইছে। অন্যদিকে ডাঙ্গার জীবনে ও মিষ্টি জলের জীবনে সীমানা টানা আরো বেশি শক্ত। প্রচুর সংখ্যক জীব পাওয়া যায় যাদের জীবনের এক অংশ কাটে মিষ্টি জলে, অন্য অংশ ডাঙ্গায়।

সমুদ্রের এলাকাটি জীবনের আশ্রয় হিসেবে সবচেয়ে বৃহৎ তো বটেই, সবচেয়ে প্রাচীনও। গোড়ার দিকে বহু কোটি বছর ধরে সমুদ্রের এলাকার বাইরে জীবনের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। এখনো পর্যন্ত সমুদ্রে যতো বিভিন্ন পর্বের জীবের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, মিষ্টি জলে বা ডাঙ্গায় তা পাওয়া সম্ভব নয়। তার কারণ এই যে সমুদ্রের পরিবেশটিই এমন যে জীবের পুষ্টি ও বংশবৃদ্ধির পক্ষে তা অতিমাত্রায় সহায়ক। ডাঙ্গার জীবনে অবশ্যই প্রচুর সংখ্যক প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে কিন্তু তার মূলে পর্ব কিন্তু অল্প কয়েকটি। আমাদের আলোচনা থেকেই জানা গিয়েছে, ডাঙ্গার জীবদের মধ্যে মূলত রয়েছে কয়েক ধরনের ফার্ন ও সপুষ্পক উদ্ভিদ, কীট, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী। কিন্তু সমুদ্রের জীবনে রকমফের আরো অনেক বেশি মাত্রায়। এমন কয়েকটি পর্বের জীব সেখানে আছে যার কোনো প্রতিনিধি ডাঙ্গার জীবনে খুঁজে পাওয়া যাবে না। যেমন, দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা চলে সীলেন্‌টেরাটা (Coelenterata) পর্বের, যার প্রতিনিধিত্ব করছে জেলিমাছ, প্রবাল ইত্যাদি। বিশেষ করে সমুদ্রের জীবের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে এমনি পর্ব আরো আছে। কিন্তু এমন পর্ব একটিও নেই যা সমুদ্রে নেই অথচ ডাঙ্গার জীবে রয়েছে।

তবে ডাঙ্গায় না থাকলেও সীলেনটেরাটা পর্বের কিছু কিছু নিদর্শন মিষ্টি জলের এলাকায় পাওয়া যেতে পারে। এমনি আরো কয়েকটি পর্বের। তবে উদ্ভিদের মধ্যে শ্যাওলা, প্রাণীদের মধ্যে শামুক ইত্যাদি ধরনের কয়েকটি জীব আছে যাদের অস্তিত্ব রয়েছে জীবমণ্ডলের তিনটি এলাকাতেই—অবশ্যই সবচেয়ে বেশি সমুদ্রে, তারপরে মিষ্টি জলে আর সবচেয়ে কম ডাঙ্গায়।

ব্যাঙ ও গিরগিটি জাতীয় কয়েকটি জীবের অর্ধেক জীবন কাটে ডাঙ্গায়, অর্ধেক জীবন মিষ্টি জলে। এমন কি, যাদের বলা হয় পুরোপুরি ডাঙ্গার জীব—যেমন, সপুষ্পক উদ্ভিদ, কীট, সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী—তারাও মাঝে মাঝে ডাঙ্গার পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের

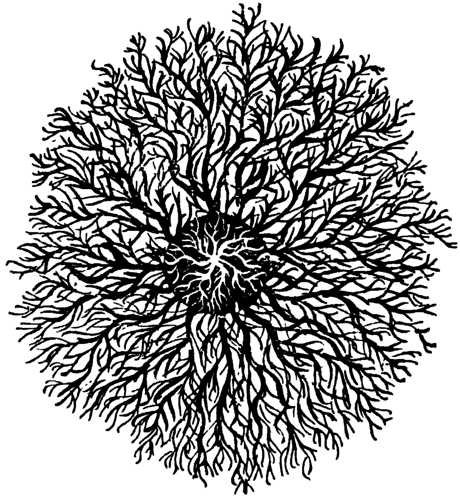
খাপ খাওয়াতে না পেরে মিষ্টি জলের এলাকায় আশ্রয় নেয়। এমনি ভাবে জীবজগতের সাক্ষ্যপ্রমাণ মিলিয়ে দেখলে একথা বলা যেতে পারে, মিষ্টি জলের জীবন রয়েছে সমুদ্রের জীবন ও ডাঙ্গার জীবনের মাঝখানটিতে।

আর সব মিলিয়ে জীবমণ্ডলের পুরো ছবিটি চোখের সামনে রাখলে তার অবিচ্ছিন্নতাও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে।

সঙ্গে সঙ্গে একথাটিও মনে রাখা দরকার যে সমুদ্র ডাঙ্গা ও মিষ্টি জলের এলাকায় পরিবেশ সর্বত্র একরকমের নয়। এমন কি পৃথিবীর সবকটি সমুদ্র পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সমুদ্রের জলের তাপমাত্রা অঞ্চল বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। ফলে পরিবেশেও বিভিন্নতা এসে যায়। এক-একটি পরিবেশকে আশ্রয় করে এক-একদল জীব। ডাঙ্গাতেও রয়েছে কোথাও মরুভূমি, কোথাও অরণ্য, ইত্যাদি। কোনো অঞ্চল গ্রীষ্মপ্রধান, কোনো অঞ্চল শীতপ্রধান। ট্রপিক দেশের ডাঙ্গার জীবকে শীতের জলবায়ুতে কিছুতেই আনা চলে না। তেমনি আনা চলে না শীতের দেশের জীবকে ট্রপিক দেশে। বিশেষ বিশেষ পরিবেশ বিশেষ বিশেষ জীবের আশ্রয়।

তার মানে, আমাদের স্বীকার করতে হবে, পৃথিবীর এই জীবমণ্ডলের কোন্ এলাকা কোন্ ধরনের জীবের আশ্রয় হতে পারে তার মধ্যেও বেশ একটা ধরাবাঁধা ব্যাপার আছে। একমাত্র মানুষকে বাদ দিলে অন্য কোনো জীবের পক্ষেই মর্জি মতো এক পরিবেশ থেকে অন্য পরিবেশে ডেরা বাঁধা সম্ভব নয়। মনুষ্যেতর জীব পরিবেশের দাস।

তাহলে মোট কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই : কালগত বিচারেই হোক বা স্থানগত বিচারেই হোক পৃথিবীর এই জীবজগতটি অতি বিচিত্র ও ব্যাপক। কিন্তু বৈচিত্র্যের মধ্যেও রয়েছে শৃঙ্খলা। ব্যাপকতার মধ্যেও অবিচ্ছিন্নতা। কারণ বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা সত্ত্বেও পৃথিবীর এই জীবজগতটি একই প্রাণের প্রকাশ মাত্র। কালগত বিচারে তো বটেই, স্থানগত বিচারেও।



প্রাণের আশ্রয়

প্রাণের প্রথমতম কম্পন
অশথের মজ্জায় করিতেছে বিচরণ,
তারই সেই ঝংকার ধ্বনিহীন—
আকাশের বক্ষেতে কেঁপে ওঠে নিশিদিন

অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা মাইক্রোস্কোপ মানুষকে সম্পূর্ণ নতুন একটি জগতের সন্ধান দিয়েছিল। যদিও এই জগতটি বরাবর ছিল মানুষের চোখের সামনেই, কিন্তু সেখানে সবকিছুই এত ছোট মাপের যে মানুষের সাদা চোখে তা ধরা পড়ত না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ভেতর দিয়ে তাকিয়েই প্রথম টের পাওয়া গেল যে জীবজগতে জীবাণুর সংখ্যাও অজস্র। শুধু তাই নয়, যে-সব জীব সাদা চোখে প্রকাণ্ড, তাদের প্রকাণ্ডতার মূলেও দেখা গেল সাদা চোখে দেখা যায় না এমন কণা-সমষ্টি। মানুষ যেমন এক সময়ে এই পৃথিবীতে বাস করেও পৃথিবী সম্পর্কে কিছুই জানত না, সেজন্যে প্রয়োজন হয়েছিল অভিযাত্রীদের অভিযান ; মহাকাশের দিকে তাকিয়েও গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে কোনো ধারণা করতে পারেনি, সেজন্যে প্রয়োজন হয়েছিল দূরবীক্ষণ যন্ত্র ; তেমনি এই বিপুল ও বিচিত্র জীবজগতটি চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও

জগতটিকে ভালো ভাবে জানবার জন্যে প্রয়োজন হয়েছিল অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

কোষ

জীবদেহের গড়ন সম্পর্কে মানুষ প্রথম জানতে পেরেছিল এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই। এমনিতে মনে হতে পারে, জীবের শরীরটি বুঝি ভরাট মাংসপিণ্ড দিয়ে তৈরি। তার মধ্যে কোথাও কোনো ফাঁক বা ছিদ্র নেই। কিন্তু সাদা চোখের দেখার এই ধারণাকে বাতিল করতে হল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে। দেখা গেল, যে-ব্যাপারটিকে মনে হয়েছিল ভরাট তার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামরা বা কোষ (cell)। কোষের মধ্যে আছে জেলির মতো স্বচ্ছ একটি পদার্থ যার নাম প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ (protoplasm), আর প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌-এর মধ্যে আছে ঘনতর পদার্থের একটি বিন্দু যার নাম নিউক্লিয়স। পদার্থ দুটি থাকে একটি আবরণের মধ্যে যার নাম কোষ-প্রাচীর। তবে এই আবরণটি উদ্ভিদের কোষে যতোখানি স্পষ্ট, প্রাণীর কোষে ততোখানি নয়। এমন কি প্রাণীদেহের কোনো কোনো কোষ একেবারেই আবরণহীন।

বোঝা যাচ্ছে জীবদেহের কোষ খুব একটা সরল ব্যাপার নয়। তার মধ্যে অনেক কিছুর আয়োজন। কিন্তু সবই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মাপের। এতই ক্ষুদ্র যে সাদা চোখে এই কোষগুলো দৃশ্যমান নয়। সাধারণ একটি কোষের মাপ হয়ে থাকে এক মিলিমিটারের একশোভাগের একভাগ। বা, ইঞ্চির মাপে, এক ইঞ্চির আড়াই-হাজার ভাগের একভাগ। তার মানে, ভেতরকার আয়োজন যেমনই হোক, সব মিলিয়ে একটি কোষের পরিসর একটি জ্যামিতিক বিন্দুর চেয়েও অনেক অনেক ছোট। কাজেই জীবদেহের কোষকে বিন্দু বা কণা বলাটা ভুল। চোখের দেখার জগতে এমন কিছু নেই যার সঙ্গে কোষের তুলনা চলতে পারে।

তারপরে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন যে চোখের দেখার বাইরের জগতেও জীবের অস্তিত্ব রয়েছে। উদ্ভিদ ও প্রাণী—দুয়েরই। এদের নাম দেওয়া হল জীবাণু। ইতিপূর্বে যে অ্যামিবার কথা বলা হয়েছে তাও একটি জীবাণু। আরো জানা গেল, অ্যামিবার দেহে রয়েছে মাত্র একটি কোষ। অর্থাৎ, অ্যামিবাকে বলতে হবে এক-কোষী জীব। অনুসন্ধানের ফলে একটি আশ্চর্য তথ্য জীববিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে পারলেন। জীব যতো প্রাথমিক ধরনের তার দেহে কোষের সংখ্যাও ততো কম। জীব যতো উন্নত পর্যায়ের, তার দেহে কোষের সংখ্যাও ততো বেশি। অ্যামিবার দেহে কোষের সংখ্যা একটি, মানুষের দেহে কোটি কোটি। অ্যামিবা আদিমতম জীব, মানুষ শেষতম। এদিক থেকে অ্যামিবা থেকে মানুষ পর্যন্ত জীবের বিবর্তনটিকে এককোষী থেকে বহুকোষী হবার অতি বিচিত্র একটি প্রক্রিয়া হিসেবেও দেখা যেতে পারে।

এক্ষেত্রে অবশ্যই সিদ্ধান্ত করতে হয় যে প্রাণের উৎপত্তি একটি কোষকে আশ্রয় করেই। অন্তত একটি কোষ। দুশো কোটি বছর আগে পৃথিবীর আদিম সমুদ্রে যে-প্রকারেই হোক অন্তত একটি কোষের উৎপত্তি হয়েছিল—এটুকু ধরে নিতে হবে। তারপরেই পুষ্টি ও বংশরক্ষার স্বাভাবিক নিয়মে এক হয়ে উঠতে পারে অনেক, বিবিধায়ন ও অভিযোজনের স্বাভাবিক নিয়মে সরল হয়ে উঠতে পারে জটিল। এতক্ষণ আমরা জীবজগতের এই বিবর্তন নিয়েই আলোচনা করেছি। কিন্তু এবারে অনিবার্য ভাবেই আরো গোড়ার একটি প্রশ্নের মুখোমুখি আমাদের দাঁড়াতে হচ্ছে। প্রাণের আশ্রয় প্রথমতম সেই কোষটির উৎপত্তি কি-ভাবে ?

প্রথমতম প্রাণ

প্রাণের বিবর্তনকে তুলনা করা হয়েছে বৃক্ষের সঙ্গে। দুশো কোটি বছরে এই বৃক্ষটি যতো ডালপালা ছড়িয়েছে তার সংখ্যাও বড়ো কম নয়। কিন্তু এই বৃক্ষেরও আদিমতম রূপটিকে একটি বীজ হিসেবে

কল্পনা করতেই হয়। তখন অনিবার্য ভাবেই প্রশ্ন এসে পড়ে: এই বীজটি এল কোত্থেকে ?

বছর পঞ্চাশ আগে কোনো কোনো বিজ্ঞানী বলেছিলেন যে প্রাণের বীজটি এই পৃথিবীতে এসেছে মহাকাশের অন্য কোনো গ্রহ থেকে। দু-দিক থেকে বক্তব্যটি বিবেচনা করা দরকার।

প্রথমত, গ্রহ বলতে আছে আমাদের এই সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহ। এখনো পর্যন্ত যতোদূর জানা গিয়েছে, পৃথিবী ছাড়া সৌরমণ্ডলের অন্য কোনো গ্রহেই সম্ভবত প্রাণের অস্তিত্ব নেই। কাজেই, পৃথিবীতে প্রাণের বীজটি ভেসে এসেছে সৌরমণ্ডলের অন্য কোনো গ্রহ থেকে—এ কথাটি বলা চলে না।

দ্বিতীয়ত, গ্রহ থাকতে পারে সূর্যের মতো অনেক অনেক নক্ষত্রের। পৃথিবী থেকে নিকটতম নক্ষত্রের দূরত্ব হচ্ছে পঁচিশ লক্ষ-কোটি মাইল। যদি আমরা ধরে নিই যে এই নিকটতম নক্ষত্রের একটি গ্রহমণ্ডল রয়েছে আর প্রাণের বীজটি এসেছে এই গ্রহমণ্ডলের কোনো গ্রহ থেকে, তাহলে ধরে নিতে হয় প্রাণের বীজটি পৃথিবীতে পৌঁছেছে পঁচিশ লক্ষ-কোটি মাইল দূরত্ব পার হয়ে। কিন্তু আমরা জানি, মহাকাশে রয়েছে অজস্র প্রাণঘাতী রশ্মি যা যে-কোনো প্রাণকে বিনষ্ট করতে পারে। এই প্রাণঘাতী রশ্মির এলাকা পার হতে হলে প্রাণের বীজটির মৃত্যু অনিবার্য। এইভাবে, যেদিক থেকেই বিবেচনা করা যাক না কেন, মহাকাশের কোনো গ্রহ থেকে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের বীজটি পৌঁছেছে—এই তত্ত্ব বাতিল হয়ে যায়।

যদি ধরেও নেওয়া যায় যে অন্য কোনো গ্রহ থেকেই পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের বীজটি এসেছে—তাহলেও গোড়ার সেই প্রশ্নটি কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। সেই বিশেষ গ্রহেই বা প্রাণের উৎপত্তি হল কি ভাবে ?

এক্ষেত্রে সম্ভাব্য একটি মাত্র ব্যাখ্যাই থাকতে পারে। প্রাণের প্রথম কোষটির উৎপত্তি হয়েছে নিষ্প্রাণ পদার্থ থেকে। এমন সমস্ত নিষ্প্রাণ পদার্থ থেকে যা এই পৃথিবীতেই আছে।

কি ভাবে? নিষ্প্রাণ পদার্থ থেকে প্রাণের উৎপত্তি কি ভাবে? এই প্রশ্নেরই জবাব এবার আমাদের খুঁজতে হবে।

ব্যাপারটি খুবই দুরূহ ও জটিল। দুশো কোটি বছর আগে যখন নিষ্প্রাণ পদার্থ থেকে প্রাণের উৎপত্তি হচ্ছিল, সেই আশ্চর্য ঘটনার কোনো সাক্ষী ছিল না। দুশো কোটি বছর পরে আমাদের হাতে রয়েছে শুধু কয়েকটি বিচ্ছিন্ন সূত্র। এই সূত্রগুলো জোড়া লাগিয়েই জানতে হবে কি-ভাবে ঘটনাটি ঘটেছিল।

সূত্রগুলোর হদিশ পাবার জন্যে নানা ক্ষেত্রে আমাদের খোঁজ করতে হবে। জ্যোতির্বিদ্যা, ভূবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও জীববিদ্যা— প্রত্যেকটি বিদ্যার ভাণ্ডার হাতড়ে হাতড়ে আমরা জানতে চেষ্টা করব— পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি হবার সময়ে কি-কি মূল উপাদানের অস্তিত্ব ছিল আর এই মূল উপাদানগুলো কি-কি ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে চেহারা পালটাতে পালটাতে শেষ পর্যন্ত একটি জীবন্ত কোষ তৈরি করতে পেরেছে।

প্রাণের উৎপত্তির রহস্য-উদ্ঘাটন গোয়েন্দা-কাহিনীর মতোই রোমাঞ্চকর। আমরাও এই কাহিনীটিকে পাকা গোয়েন্দার মতো একটি একটি করে সূত্র ধরে অনুসরণ করতে চেষ্টা করব।

জীবনের লক্ষণ

জীবনের লক্ষণ কি? সব সময়েই নড়েচড়ে বেড়ানো আর কিছু না কিছু করা। বিশেষ করে প্রাণীদের বেলায় তো বটেই। যে-কোনো প্রাণীর দিকে তাকানো যাক—সে সব সময়ে লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে, আঁচড়াচ্ছে, কামড়াচ্ছে, কিছু না কিছু করছে। এমন কি যখন সে কিছু করে না, অর্থাৎ ঘুমোয়, তখনো তার হৃদপিণ্ড ধুকধুক করে। উদ্ভিদ যদিও নড়েচড়ে বেড়ায় না কিন্তু উদ্ভিদের দেহের মধ্যেও সব সময়ে নানা ধরনের কাণ্ডকারখানা ঘটে চলে। এমন কি যে কোষকে বলা হয়েছে জীবনের মূল আশ্রয়, তার মধ্যেও প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ কখনো স্থির হয়ে থাকে না। এক কথায় বলা চলে, অস্থিরতাই

হচ্ছে জীবনের লক্ষণ।

এজন্যে অবশ্যই জীবের শরীরে কিছু শক্তির যোগান চাই। জীবকে চলে ফিরে বেড়াবার জন্যে এই শক্তি খরচ করতে হয়। শক্তিক্ষয় হবার আরো নানা কারণ অবশ্যই ঘটে থাকে। যেমন ধরা যাক স্তন্যপায়ী ও পাখির শরীরের উত্তাপ বজায় থাকার ব্যবস্থাটি। এই উত্তাপ স্তন্যপায়ী ও পাখির শরীরের মধ্যেই তৈরি হওয়া দরকার। ঈল মাছের মতো কোনো কোনো জীবের শরীরে প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুতের প্রয়োজন আছে। এই বিদ্যুৎ তৈরি হবার ব্যবস্থাও জীবের শরীরের মধ্যেই চাই। জোনাকির আলো সম্পর্কেও একই কথা। এমনি ভাবে জীবের শরীরে সব সময়েই কোনো না কোনো ভাবে শক্তিক্ষয় হয়ে চলেছে। শক্তির যোগানও থাকছে জীবের শরীরের মধ্যেই। খরচ হওয়া মানেই যোগান থাকা। তেল বা কয়লা বা বিদ্যুৎ খরচ হবার পরেই মোটর বা ইঞ্জিন চলতে শুরু করে। তেলের কথাই ধরা যাক। তেল হচ্ছে রাসায়নিক শক্তির ভাঁড়ার। তেল পোড়ালে পাওয়া যায় উত্তাপ। উত্তাপ থেকে গতি। এক্ষেত্রে বিশেষ এক ধরনের শক্তি রূপান্তরিত হচ্ছে বিশেষ অন্য ধরনের শক্তিতে। জীবদেহকেও তুলনা করা চলে মোটর বা ইঞ্জিনের সঙ্গে। এই যন্ত্রটিতেও বিশেষ এক ধরনের শক্তি বিশেষ অন্য ধরনের শক্তিতে রূপান্তরিত হবার ব্যবস্থা।

জীবদেহের কোষ একটি কারখানা-ঘরের মতো। এই কারখানা-ঘরে সব সময়েই শক্তি উৎপাদন হয়ে চলেছে। বা, আরো সঠিক ভাবে বলতে গেলে, শক্তির রূপান্তর। মোটর চালু রাখবার জন্যে যেমন তেল পোড়াতে হয়, তেমনি জীবকোষের এই কারখানা-ঘরটিকে চালু রাখবার জন্যেও জ্বালানীর প্রয়োজন আছে।

এই জ্বালানী আসে কোত্থেকে? বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। আমরা খুঁটিনাটি বিবরণের মধ্যে না গিয়ে মোটা ভাষায় বুঝে নিতে চেষ্টা করব।

জ্বালানীর যোগান রয়েছে জীবকোষের কাঠামোর মধ্যেই। সেখানে এমন কিছু রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে যার ফলে শক্তি নিঃসৃত হয়। অর্থাৎ, আমরা বলতে পারি, জীবকোষের শরীরের অংশবিশেষই হয়ে উঠছে জ্বালানী। জীবকোষ নিজেকে পুড়িয়ে পুড়িয়েই নিজের কারখানা-ঘরটিকে চালু রাখছে। আর যতোই পুড়তে থাকে ততোই জীবকোষের বিশেষ বিশেষ অংশ বাতিলের পর্যায়ে চলে যায়। সাধারণ বুদ্ধিতে অবশ্য এ-ব্যাপারে অস্বাভাবিক কিছু নেই। জ্বালানী পুড়লে কিছু বাতিল পদার্থ পেতেই হবে (কয়লা পুড়লে যেমন ছাই)। জীবকোষ এই বাতিল পদার্থগুলোকে বর্জন করে।

জীবকোষের এই নিরন্তর ক্ষয় আসলে জীবনেরই লক্ষণ। জীব-বিজ্ঞানীরা এই ক্ষয়ের প্রক্রিয়াটির নাম দিয়েছেন ক্যাটাবলিজ্‌ম্ (catabolism')।

কিন্তু জীবকোষকে যদি বেঁচে থাকতে হয় তাহলে ক্ষয়ের পাশাপাশি একটি গড়ে-ওঠার প্রক্রিয়াও থাকা দরকার। যে রাসায়নিক পরিবর্তনের জন্যে জীবকোষে শক্তি নিঃসৃত হয়েছিল, তার বিপরীত একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আবার যদি শক্তির সঞ্চয় না হয়— তাহলে জীবকোষের কারখানা-ঘরটি অচিরেই বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। প্রোটোপ্লাজ্‌ম্-এর যে-অংশ জ্বালানী হিসেবে কাজে লাগবার পরে বাতিল হয়ে গিয়েছিল তার শূন্যস্থানটি যদি নতুন প্রোটোপ্লাজ্‌ম্-এ ভরাট না হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত গোটা জীব-কোষটিরই মৃত্যু অনিবার্য। জীববিজ্ঞানীরা এই গড়ে-ওঠার প্রক্রিয়াটির নাম দিয়েছেন অ্যানাবলিজ্‌ম্ (anabolism)। এই প্রক্রিয়াটি যাতে বজায় থাকে সেজন্যে জীবকোষে টাটকা উপকরণ যোগান দিয়ে চলার একটি ব্যবস্থাও পাশাপাশি চলেছে। তা হচ্ছে জীবকোষের বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য।

তাহলে দেখা যাচ্ছে জীবকোষে পাশাপাশি চলেছে একদিকে ভাঙার প্রক্রিয়া, অন্যদিকে গড়ে-ওঠার প্রক্রিয়া। জীববিজ্ঞানীরা এই দুটি

প্রক্রিয়াকে একত্রে নাম দিয়েছেন মেটাবলিজম্ (metabolism) বা বিপাক। এই হচ্ছে জীবনের মূল লক্ষণ।

একদিকে ভাঙা, অন্যদিকে গড়া ; একদিকে ক্ষয়, অন্যদিকে সঞ্চয় ; একদিকে সরবরাহ, অন্যদিকে যোগান—দুই বিপরীত প্রক্রিয়ায় জীবকোষটি হয়ে ওঠে অস্থির ও পরিবর্তনশীল। তবে মনে রাখা দরকার যে এই পরিবর্তন মূলত রাসায়নিক। ভাঙার পর্বে প্রোটো-প্লাজমের জটিল রাসায়নিক পদার্থগুলো হয়ে ওঠে সরল। আর গড়ার পর্বে সরল রাসানিক পদার্থগুলো হয়ে ওঠে জটিল। সব মিলিয়ে জীবকোষ এমন একটি রাসায়নিক কারখানা যেখানে অষ্ট-প্রহর পদার্থ ভাঙার ও গড়ার ভিয়েন চড়ানো রয়েছে। ভাঙার পর্বে পদার্থ রূপান্তরিত হচ্ছে জটিল থেকে সরলে, গড়ার পর্বে সরল থেকে জটিলে। কারখানাটিকে চালু রাখবার জন্যে কাঁচামাল ও জ্বালানীর যোগান বজায় রাখতে হচ্ছে। অন্যদিকে কারখানা থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে শক্তি আর কিছু বাতিল পদার্থ। কিন্তু এই কারখানার বিশেষত্বটিও লক্ষ্য করা দরকার। এখানে যা কিছু উৎপন্ন হচ্ছে তা নিজের প্রয়োজনেই লেগে যাচ্ছে। কথাটাকে এইভাবেও বলা চলে : জীবকোষের কারখানাতে উৎপন্ন হচ্ছে জীবকোষ। ভাঙার পর্বে জীবকোষের যে-অংশটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গড়ার পর্বে জীব-কোষের সেই অংশটুকুকেই আবার নতুন করে পাওয়া যাচ্ছে।

জীবকোষের এই আশ্চর্য কারখানাটির কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। এমনিতে সাদা চোখে দেখা যায় না, আণুবীক্ষণিক যার অস্তিত্ব, তাকে আশ্রয় করেই কিনা জীবনের এমন বিচিত্র প্রকাশ! জীবকোষকে বলা হয়ে থাকে জীবনের মৌল উপকরণ। এই জীবকোষ যতো বেশি পরিমাণে সক্রিয়, জীবনের প্রকাশও ততো বেশি পরিমাণে জীবন্ত।

জীবকোষের সক্রিয়তা বলতে আমরা কী বুঝব ?

আমরা জেনেছি, জীবকোষে সব সময়েই ভাঙা-গড়া চলেছে। ভাঙা ও গড়া দুটোই যদি সমান মাত্রায় চলতে থাকে তাহলে জীবকোষের

ধ্বংসও নেই, বৃদ্ধিও নেই। কিন্তু যতো তাড়াতাড়ি ভাঙে ততো তাড়াতাড়ি যদি গড়ে না ওঠে তাহলে কোষটি আস্তে আস্তে মরে যায়। অন্যদিকে, যতো তাড়াতাড়ি গড়ে ওঠে ততো তাড়াতাড়ি যদি না ভাঙে তাহলে কোষটি বড়ো হয়ে ওঠে। ব্যাপারটা যদি চলতেই থাকে তাহলে কোষটিরও বড়ো হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু তা হয় না। বড়ো হবার একটা সীমা আছে। সেই সীমায় পৌঁছলেই কোষটি দু-ভাগ হয়ে যায়। একটি হয় দুটি। এইভাবে কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি হতে থাকে।

জীবনের দুটি মৌলিক লক্ষণের কথা আগে বলেছি। পুষ্টি ও বংশরক্ষা। এক্ষেত্রেও একটি আণুবীক্ষণিক কোষের মধ্যে জীবনের এই দুটি মৌলিক লক্ষণই প্রকাশ পেল।

জীবনের উপকরণ

জীবকোষের কারখানা-ঘরে কতকগুলো বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হয়ে থাকে। সহজেই বোঝা যায়, জীবনের সঙ্গে এই বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পদার্থগুলোর সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। এই কারণে এদের নাম দেওয়া হয়েছে জৈব পদার্থ। এই নামকরণ অবশ্য হালের নয়, প্রাচীনকালের—যখন মানুষের ধারণা ছিল যে চিনি তেল মাখন ঘি চাল গম বা এমন কি ধূপ রঞ্জকদ্রব্য গন্ধদ্রব্য ও এমনি ধরনের অন্যান্য পদার্থের জন্যে উদ্ভিদ বা প্রাণীর ওপরে নির্ভর করতেই হবে। কাজেই পদার্থগুলোকে বলা হয়েছিল জৈব। সম্প্রতি অবশ্য বিজ্ঞানীরা অনেকগুলো জৈব পদার্থকে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করতে পেরেছেন—সেজন্যে উদ্ভিদ বা প্রাণীর ওপরে নির্ভর করতে হয়নি। আমাদের দেশের নীলের চাষের কথা সবাই জানেন। এখন আর নীলের চাষ করতে হয় না—কৃত্রিম উপায়েই তা তৈরি হয়। তাই বলে 'জৈব' বিশেষণটি বাতিল হয়ে যায়নি। আঠারো শতকের রসায়নবিদ ল্যাভয়সিয়র প্রমাণ করেছিলেন যে জৈব পদার্থের একটি অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে কার্বন। তারপর থেকে

জৈব পদার্থ বলতে কার্বন-ঘটিত পদার্থকেই বোঝানো হয়ে থাকে। কয়েক ধরনের জৈব পদার্থের সঙ্গে আমাদের খুবই পরিচয় আছে। আমরা যে ভাত খাই তার মধ্যে আছে স্টার্চ বা শ্বেতসার। পাকা ফলের রসে ও চিনিতে আছে শুগার বা শর্করা। ঘি-মাখন-তেলে আছে ফ্যাট বা স্নেহ। মাছ-মাংস-ডিমে আছে প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড।

তাই বলে যা কিছু আমরা খাই সবই জৈব পদার্থ নয়। জল ও লবণ না হলে আমাদের খাওয়ার ব্যাপারটা বিরস ও বিস্বাদ ঠেকবে। এই দুটি পদার্থই অজৈব। জীবকোষের প্রোটোপ্লাজম-এ জৈব পদার্থ অবশ্যই আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে অজৈব পদার্থও। প্রোটোপ্লাজম-এর বেশির ভাগটাই হচ্ছে জল—অর্থাৎ অজৈব। বাকি অংশের প্রায় অর্ধেক প্রোটিন।

এক টুকরো মাংস যদি পোড়ানো যায় তাহলে মাংস আর মাংস থাকে না, হয়ে ওঠে অঙ্গার। এই হচ্ছে প্রোটিনের কার্বন। একগাছি চুল পোড়ালেও এই একই অঙ্গার পাওয়া যায়। কিন্তু সেটুকুই সব নয়, সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় একটি কটু গন্ধ। রসায়নবিদকে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে, এই কটু গন্ধ নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থের। তাহলে ধরে নিতে হয় যে এই নাইট্রোজেনেরও ঘাঁটি ছিল প্রোটিনের মধ্যেই—প্রচণ্ড উত্তাপ তাকে ঘাঁটিছাড়া করেছে।

তাহলে প্রোটিনের মধ্যে চারটি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেল। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন (এই দুটি পদার্থ রয়েছে জলে), কার্বন ও নাইট্রোজেন।

এই চারটি মৌলিক পদার্থই জীবনের প্রধান উপকরণ। জীবদেহের শতকরা ৯৯ ভাগ অংশ জুড়েই এই চার প্রধানের অবস্থান।

উপকরণ সংগ্রহ

জীবদেহে এই উপকরণগুলো কি-ভাবে সংগৃহীত হয়ে থাকে ? জবাবটা আমাদের সকলেরই জানা। উপকরণ সংগ্রহের উপায় হচ্ছে

খাদ্যগ্রহণ। ব্যাপারটা আমাদের কাছে আনন্দেরও বটে। আমাদের জীবনের অধিকাংশ আয়োজনই খাওয়াকে কেন্দ্র করে। খাই-খাই করেই আমাদের জীবনের বেশির ভাগটা কেটে যায়।

তাহলে ধরে নেওয়া চলে যে জীবমাত্রেরই খাওয়ার প্রয়োজন আছে। এই খাওয়াটাই উপকরণ সংগ্রহের উপায়। পুষ্টিরও বটে।

কিন্তু সব জীবের খাওয়ার ধরন এক নয়। যে-সব জীবের মুখ আছে পেট আছে তাদের কথা আলাদা। কিন্তু মুখ নেই পেট নেই এমন অজস্র জীব আমাদের চোখের সামনেই মাটিতে শেকড় গেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি উদ্ভিদের কথা বলছি। উদ্ভিদের পুষ্টি আছে তা তো চোখের সামনেই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু উদ্ভিদের খাদ্যগ্রহণের উপায়টা কী?

সালোকসংশ্লেষ

জীববিজ্ঞানীরা উদ্ভিদের খাদ্যগ্রহণের উপায়টির নাম দিয়েছেন ফোটোসিন্‌থেসিস (photosynthesis) বা সালোকসংশ্লেষ। সালোক মানে আলোক সহ। সংশ্লেষ মানে সমন্বয় বা একীকরণ। অর্থাৎ, আলোকের সাহায্যে কোনো কিছুকে যেন মিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই কথাটির মধ্যেই উদ্ভিদের খাদ্যগ্রহণের উপায়টির হদিশ পাওয়া যাবে।

প্রথমে উদ্ভিদের খাদ্যগ্রহণের বিশেষত্বটুকু বলে নেওয়া দরকার। আমরা যেমন সব সময়ে তৈরী খাবারের দিকে হাত বাড়াই, উদ্ভিদের প্রকৃতিই তা নয়। আমাদের খাদ্য ভাত-ডাল-তরকারি, মাছ-মাংস-ডিম, দুধ-মাখন-ঘি বা এরই রকমফের। এই জৈব পদার্থগুলো কোনোটাই আমরা নিজেরা তৈরি করি না, প্রকৃতির রাজ্য থেকে তৈরী অবস্থায় আত্মসাৎ করি। শুধু আমরাই নই, প্রাণীমাত্রই অন্যনির্ভর। এদিক থেকে উদ্ভিদ একেবারেই স্বতন্ত্র। এই পৃথিবীর জল-মাটি-বাতাস থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে উদ্ভিদ তার নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করে নেয়।

বাতাসে আছে কার্বন ডাই-অক্সাইড। উদ্ভিদের পক্ষে এই কার্বন ডাই-অক্সাইড সংগ্রহ করতে অসুবিধে হবার কথা নয়। উদ্ভিদের কোষে এই কার্বন ডাই-অক্সাইড যুক্ত হয় জলের সঙ্গে আর তার ফলে তৈরি হয় একটি শর্করা যার নাম গ্লুকোজ। যে দুটি পদার্থ যুক্ত হল, অর্থাৎ কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল, দুয়ের মধ্যেই আছে অক্সিজেন। যে-পরিমাণে আছে তার সবটুকুই গ্লুকোজ তৈরি করবার জন্যে প্রয়োজন হয় না। খানিকটা উদ্বৃত্ত থেকে যায়। এই উদ্বৃত্ত অক্সিজেন উদ্ভিদ ছেড়ে দেয় বাতাসে। অন্যদিকে গ্লুকোজ যুক্ত হয় অন্যান্য রাসায়নিকের সঙ্গে আর তার ফলে উদ্ভিদের পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত জৈব পদার্থ তৈরি হয়ে থাকে।

তবে প্রক্রিয়াটি যতোটা সরলভাবে বর্ণনা করা হল আসলে তা নয়। কার্বন ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে জল এমনিতে যুক্ত হয় না, সেজন্যে কিছুটা শক্তি ব্যয় করার প্রয়োজন আছে। যে-শক্তি শেষ পর্যন্ত মজুদ থাকে গ্লুকোজে। উদ্ভিদ এই শক্তি সংগ্রহ করে সূর্যের আলো থেকে। সূর্যের আলোর সাহায্যে গ্লুকোজ তৈরির এই প্রক্রিয়ারই নাম সালোকসংশ্লেষ। উদ্ভিদের পাতার কোষে আছে ক্লোরোফিল (chlorophyll) নামে একটি সবুজ রাসায়নিক। এই ক্লোরোফিলের সাহায্যেই সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হয়ে থাকে। এই বিশেষ প্রক্রিয়ার জন্যে এটি একটি অপরিহার্য উপাদান।

উদ্ভিদের প্রোটিন খাদ্যের জন্যে আরো একটি মৌলিক পদার্থের প্রয়োজন আছে। সেটি হল নাইট্রোজেন। উদ্ভিদ তার শেকড়ের সাহায্যে যে-মাটি থেকে জল টেনে নেয় তার মধ্যেই মিশে থাকে নাইট্রোজেন-ঘটিত অজৈব পদার্থ। উদ্ভিদ এই নাইট্রোজেনকেও আত্মসাৎ করে আর এই নাইট্রোজেন থেকেই তৈরি করে অ্যামিনো অ্যাসিড। তারপরে অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে প্রোটিন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে উদ্ভিদ খাদ্যের ব্যাপারে স্ব-নির্ভর। বাতাস, মাটি, জল থেকে সে কতকগুলো উপকরণ সংগ্রহ করে মাত্র। কিন্তু সেই সমস্ত উপকরণ থেকে খাদ্য তৈরির ব্যবস্থা তার নিজের শরীরের

মধ্যেই। উদ্ভিদকে বলা হয়ে থাকে স্বভোজী বা অটোট্রফিক (autotrophic) জীব।

প্রাণীর শরীরে ক্লোরোফিল নেই। ক্লোরোফিল না থাকার দরুন জল-মাটি-বাতাস থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে জৈব পদার্থ তৈরি করে নেবার কোনো ব্যবস্থাই প্রাণীর শরীরে হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই প্রাণীদের জৈব পদার্থ সংগ্রহ করতে হয় প্রকৃতির রাজ্য থেকে তৈরী অবস্থায়। প্রাণীর খাদ্য উদ্ভিদ বা অন্য প্রাণী। কারও কারও উদ্ভিদ, কারও কারও প্রাণী। মানুষ অবশ্য বিশেষ একদলের নয়। উদ্ভিদ বা মাংস কোনোটাতেই তার অরুচি নেই। এই পরভোজী জীবদের বলা হয় হেটেরোট্রফিক (heterotrophic)।

তবে উদ্ভিদের রাজ্যেও এমন কিছু কিছু নমুনা আছে যারা ক্লোরোফিল সম্পদ থেকে বঞ্চিত। যেমন, এক-ধরনের এককোষী উদ্ভিদ যাদের নাম ঈস্ট (yeast)। এই উদ্ভিদের নিজস্ব ক্লোরোফিল নেই, অন্য উদ্ভিদের শর্করায় ভাগ বসিয়ে এদের পুষ্টি। খাদ্যগ্রহণের এই বিশেষ পদ্ধতির জন্যেই ঈস্ট-এর সাহায্যে ফারমেন্টেশন বা গাঁজন প্রক্রিয়াটি ঘটানো যেতে পারে। ক্লোরোফিলশূন্য আরো কয়েক ধরনের উদ্ভিজ্জাণুকে বলা হয়ে থাকে ব্যাক্‌টেরিয়া। অধিকাংশই এককোষী। ব্যাক্‌টেরিয়ার খাদ্যসংগ্রহ মৃত উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহ থেকে। আর তার ফলে মৃত উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহে পচন ধরে। আর পচনশীল জীবদেহ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে যে-সব উদ্ভিদ তাদের বলা হয় ছত্রাক। সাধারণত পচা গাছের গুঁড়িতে বা পচা পাতা মাটির সঙ্গে মিশেছে এমন জমিতে ছত্রাক দেখা যায়।

তাহলে দু-দল জীব পাওয়া যাচ্ছে। স্বভোজী বা অটোট্রফিক। পরভোজী বা হেটেরোট্রফিক। প্রথম দলে রয়েছে উদ্ভিদ, দ্বিতীয় দলে প্রাণী। এই ভাগাভাগির ব্যাপারটা পেছনদিকে টেনে নিয়ে গেলে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক একটি প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। প্রাণের উৎপত্তি হবার সময়ে কোন্ দল প্রথমে এসেছিল—

স্বভোজীরা না পরভোজীরা? যদি স্বভোজীরা আগে এসে থাকে তাহলে ধরে নিতে হয় যে তাদের দেহে খাদ্য তৈরি করে নেবার আয়োজনটিও ছিল। অর্থাৎ, তাদের দেহ ছিল ক্লোরোফিল-যুক্ত। কিন্তু সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি এমনই একটি জটিল ব্যাপার যে এমনটি হওয়া সম্ভব নয় বলেই মনে হয়।

বরং ব্যাপারটিকে অনেক বেশি স্বাভাবিক মনে হয় যদি আমরা ধরে নিই যে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছিল এমন কতকগুলো জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যার মধ্যে আজকের দিনের মতো জটিলতা ছিল না। জীবদেহে সালোকসংশ্লেষ বা অন্যান্য জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলোর উদ্ভব পরবর্তীকালের—প্রাণের বিবর্তন কিছুটা অগ্রসর হবার পরে। একেবারে গোড়ার পর্যায়ের জীবদেহে—বা, আরো সঠিকভাবে বলতে হলে, জীবকোষে—এমন কোনো আয়োজন ছিল না যার ফলে জৈব পদার্থ তৈরি হতে পারত। তাহলে নিশ্চয়ই তৈরী অবস্থায় জৈব পদার্থের একটা যোগান থাকারও প্রয়োজন ছিল।

বিষয়টি নিয়ে পরে আমাদের আলোচনা করতে হবে। আপাতত বলা যেতে পারে, সেই আদিম পৃথিবীর সমুদ্রে নানা ধরনের জৈব পদার্থ তৈরি হবার মতো অবস্থা ছিল। আর সেই সমস্ত জৈব পদার্থের রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেই প্রথম প্রাণের উদ্ভব। সেই একই জৈব পদার্থ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেই তাদের পুষ্টি ও সংখ্যাবৃদ্ধি। সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই টান পড়েছিল সমুদ্রের জৈব পদার্থের ভাঁড়ারে। শুরু হয়েছিল বেঁচে থাকার সংগ্রাম ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মে যোগ্যতমের টিকে থাকা। এই বেঁচে থাকার সংগ্রামই শেষ পর্যন্ত একদল জীবকে খাদ্যের ব্যাপারে স্ব-নির্ভর করে তোলে। যাদের আমরা বলি উদ্ভিদ। সঙ্গে সঙ্গে অন্যরা—যারা ক্লোরোফিল-যুক্ত হতে পারেনি, যাদের অপেক্ষা করতে হত তৈরী জৈব পদার্থের জন্যে—তারাও বাঁচবার সহজ রাস্তা খুঁজে পায়। কারণ তারপর থেকে উদ্ভিদই হয়ে ওঠে তাদের খাদ্য।

পৃথিবীতে প্রাণের বিজয়-অভিযানে যে-সব উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের চিহ্ন রয়েছে, নিঃসন্দেহে তার মধ্যে একটি হচ্ছে বিশেষ একদল জীবের ক্লোরোফিল-লাভ।

বায়ুজীবী ও অবায়ুজীবী

একটু আগে আমরা বলেছি, জীবকোষে শক্তি-উৎপাদনের জন্যে জ্বালানীর যোগান থাকা দরকার। অর্থাৎ, কল্পনা করা হয়েছে, জীবকোষের মধ্যে যেন একটা অগ্নিকাণ্ডের মতো ব্যাপার ঘটছে। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে অগ্নিকাণ্ডটা নিতান্তই কল্পনা। আসলে যা ঘটে তা হচ্ছে রাসায়নিক ক্রিয়াকাণ্ড। আগুনের শিখা থাকে না বটে কিন্তু ফল একই। এমন কি, জ্বালানী পোড়াবার জন্যে যেমন অক্সিজেন চাই, তেমনি জীবকোষের অগ্নিকাণ্ডটিও অক্সিজেন ছাড়া হবার উপায় নেই। জীবকোষে জ্বালানীও যেমন চাই, তেমনি চাই অক্সিজেন। দুয়ে মিলে জীবনের শিখাটি প্রজ্বলিত রাখে। জীবদেহে এই অক্সিজেনের যোগান বজায় রাখবার ব্যবস্থাটির নাম শ্বাসকার্য।

আমরা জানি—কয়লা যখন পোড়ে, কয়লার কার্বন অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তৈরি হয় কার্বন ডাই-অক্সাইড। এই কার্বন ডাই-অক্সাইড ধোঁয়ার সঙ্গে বেরিয়ে আসে আগুন থেকে। একই ব্যাপার ঘটে শর্করা বা স্নেহপদার্থ জ্বালানী হিসেবে জীবকোষের মধ্যে পুড়তে শুরু করলে। জ্বালানীর কার্বন যুক্ত হয় অক্সিজেনের সঙ্গে আর নিশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসে কার্বন ডাই-অক্সাইড।

অধিকাংশ জীবই দেহের ভেতরকার জ্বালানী পোড়াবার জন্যে অক্সিজেন ব্যবহার করে থাকে। তবে ব্যতিক্রমও আছে। যেমন, ঈস্ট। এই এককোষী জীবটি শক্তি সংগ্রহ করে শর্করা পদার্থকে গাঁজিয়ে। এই গাঁজন প্রক্রিয়াটির জন্যে অক্সিজেনের কোনো প্রয়োজন নেই। ঈস্ট-জাতীয় জীবের দৃষ্টান্ত আরো আছে।

তাহলে এক্ষেত্রেও জীবজগৎ দু-দলে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। একদলের

বেঁচে থাকার জন্যেই বাতাসের অক্সিজেন প্রয়োজন। এই দলটিকে বলা হয় বায়ুজীবী (aerobic)। অপর দলের বাতাস ছাড়াও চলে। তারা শক্তি সংগ্রহ করে গাঁজন প্রক্রিয়ায়। এই দলটিকে বলা হয় অবায়ুজীবী (anaerobic)।

এবারেও যদি এই ভাগাভাগির ব্যাপারটাকে পেছন দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে একটি কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। প্রাণের উৎপত্তি হবার সময়ে কোন্ দল আগে এসেছিল? বায়ুজীবীরা, না, অবায়ুজীবীরা? এই প্রশ্নের জবাব পেতে হলে অন্য একটি প্রশ্নের জবাব আগে জানা দরকার। প্রাণের উৎপত্তি হবার সময়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এখনকার মতো মুক্ত অক্সিজেন ছিল কি? বিজ্ঞানীরা বলেন, সম্ভবত ছিল না। কাজেই ধরে নিতে হয়, আগে এসেছিল অবায়ুজীবীরাই। বাতাসে মুক্ত অক্সিজেন জমা না হওয়া পর্যন্ত বায়ুজীবীদের অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

আমরা জেনেছি, বাতাসে মুক্ত অক্সিজেনের যোগান সম্ভব হতে পারে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায়। উদ্ভিদ বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড টেনে নেয় আর অক্সিজেন ছাড়ে। তার মানে আমরা বলতে পারি, পৃথিবীতে বায়ুজীবীরা এসেছিল ক্লোরোফিল-যুক্ত জীবের আবির্ভাবের পরে।

এ থেকেও বোঝা যাবে, বিশেষ একদল জীবের ক্লোরোফিল-লাভ জীবজগতের ইতিহাসে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

কার্বন-চক্র

জীবদেহ গড়ে ওঠে জৈব পদার্থে। আর জৈব পদার্থ মাত্রেই আছে কার্বন। একটু ভাবলেই বোঝা যাবে জীবদেহের এই কার্বন সরবরাহ হয় বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে। কি ভাবে? সবুজ উদ্ভিদ বাতাস থেকে টেনে নেয় কার্বন ডাই-অক্সাইড আর সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইডের কার্বন আত্মসাৎ

করে। এমনি ভাবে উদ্ভিদের দেহের পুষ্টি হতে থাকে। তারপরে এই উদ্ভিদ হয় প্রাণীর খাদ্য। তখন প্রাণীর দেহটিও পুষ্ট হয়ে ওঠে। এইভাবে উদ্ভিদের কার্বনকে আত্মসাৎ করে প্রাণী। অর্থাৎ, বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইডের কার্বনকে প্রথমে পাওয়া যাচ্ছে উদ্ভিদের দেহে, তারপরে প্রাণীর দেহে। আমরা জানি, কিছু পরিমাণ উদ্ভিদ মাটির নিচে চাপা পড়ে কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছে, কিছু পরিমাণ প্রাণী একই প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়েছে পেট্রোলিয়ামে। এই কয়লা ও পেট্রোলিয়ামকে বলা চলে মাটির নিচের কার্বনের ভাঁড়ার। এমনি ভাবে বাতাস থেকে কার্বনের যোগান চলে আসছে উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে এবং মাটির নিচের কয়লা ও তেলের খনিতে।

কিন্তু এই যোগানটি যদি একতরফা হত তাহলে বাতাসের কার্বন অনেক আগেই নিঃশেষ হয়ে যেতে পারত। রাসায়নিক বিশ্লেষণে জানা গিয়েছে, বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ শতকরা মাত্র সাড়ে-তিন ভাগ। এই যৎসামান্য পুঁজি ভাঙিয়ে বেশি দিন চলবার কথা নয়। তবুও যে বাতাসে কার্বনের পরিমাণ কমছে না তার কারণ, যোগান যেমন চলছে তেমনি অন্যদিকে আছে সরবরাহ। যখনই কোনো জৈব পদার্থ পোড়ে তখনই তৈরি হয় কার্বন ডাই-অক্সাইড। আমরা জেনেছি, জৈব পদার্থ অনবরত পুড়ে চলেছে জীবদেহের কোষে, জীবের মৃত্যুর পরে জীবদেহের পচনে এবং সত্যিকারের অগ্নিকাণ্ডে তো বটেই। এমনি ভাবে বাতাসে কার্বন ডাই-অকসাইডের একটি অবিরাম সরবরাহও বজায় থাকছে। আর এই যোগান ও সরবরাহ মিলে তৈরি হচ্ছে একটি চক্র। বাতাসের কার্বন একদিকে যোগান যাচ্ছে জীবদেহে, অন্যদিকে জীবদেহ থেকে ফিরে আসছে বাতাসে। ব্যাপারটা অনেকটা কৃত্রিম ফোয়ারার জলের মতো। কৃত্রিম ফোয়ারায় সাধারণত একটি পাম্প বসানো থাকে। যে-জল একবার ফোয়ারা হয়ে বেরিয়ে আসে সেই জলকেই আবার পাম্প করে তুলে দেওয়া হয় ট্যাংকে। সেই একই জল আবার বেরিয়ে আসে ফোয়ারা হয়ে। অর্থাৎ, ফোয়ারা ও ট্যাংকের

মধ্যে জলের একটি চক্র তৈরি হয়। তেমনি একই কার্বনকে কখনো দেখা যাচ্ছে বাতাসে, কখনো জীবদেহে। সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় বাতাসের কার্বন জীবদেহে, আবার দহন প্রক্রিয়ায় জীবদেহের কার্বন বাতাসে। একই কার্বনের চলাফেরা। অর্থাৎ, এক্ষেত্রেও তৈরি হচ্ছে কার্বনের একটি চক্র।

আর এই কার্বন-চক্রটি থাকার জন্যে অক্সিজেনকেও বাধ্য হয়ে একটি চক্রের মধ্যে পড়তে হয়। কার্বনের সঙ্গে অক্সিজেনের খুবই মিতালি। সুযোগ পেলেই কার্বন অক্সিজেনের সঙ্গে জোট বাঁধে। বাতাসে কার্বন পাওয়া যায় এই অক্সিজেনের সঙ্গে জোট বাঁধা অবস্থাতেই, যার নাম কার্বন ডাই-অক্সাইড। উদ্ভিদ সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় বাতাস থেকে যে কার্বন সংগ্রহ করে তার উৎসও এই কার্বন ডাই-অক্সাইড। আমরা জেনেছি, উদ্ভিদ কার্বন বাই-অক্সাইডের কার্বনকে নিজের দখলে রাখে আর অক্সিজেনকে ছেড়ে দেয় বাতাসে। অর্থাৎ অক্সিজেন মুক্তি পায়। কিন্তু এই মুক্তি সাময়িক। দহন প্রক্রিয়ায় জীবদেহের কার্বন আবার এই অক্সিজেনের সঙ্গেই জোট বাঁধে ও কার্বন ডাই-অক্সাইড হয়ে বেরিয়ে আসে বাতাসে। তার মানে, অক্সিজেনেরও দুটি পৃথক অবস্থা—কখনো কার্বনের সঙ্গে জোটবদ্ধ, কখনো মুক্ত। এই হচ্ছে অক্সিজেনের চক্র।

কিন্তু এই চক্রের মধ্যে কখনো কখনো বড়ো রকমের ফাঁক পড়ে যায়। কিছু পরিমাণ কার্বন ও অক্সিজেন চলে আসে চক্রের বাইরে। তখন আর পরস্পরের সঙ্গে জোট বাঁধবার রাস্তা থাকে না।

যেমন ধরা যাক, মাটির নিচে কয়লা বা তেল তৈরি হবার ব্যাপারটি। এই দুটি জৈব পদার্থের উৎস উদ্ভিদ ও প্রাণী। মাটি বা সমুদ্রের নিচে চাপা পড়ে যাওয়াতে তাদের শরীরের কার্বন কার্বন-অবস্থাতেই থেকে গিয়েছিল—অক্সিজেনের সঙ্গে জোট বাঁধতে পারেনি। ফলে বাতাসের কিছু পরিমাণ অক্সিজেনও অক্সিজেন-অবস্থাতে

থেকে যায়। কারণ, যে-কার্বনের সঙ্গে তাদের জোট বাঁধবার কথা, সেই কার্বন মাটি বা সমুদ্রের নিচে চাপা পড়ে যাওয়াতে নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে। এমনি ভাবে মাটির নিচে যতো বেশি পরিমাণে কয়লা ও তেল তৈরি হয়েছে ততো বেশি পরিমাণে অক্সিজেন মুক্ত হতে পেরেছে বাতাসে। কিন্তু অক্সিজেন এমনই একটি পদার্থ যা সহজেই অন্য কতকগুলো পদার্থের সঙ্গে জোট বাঁধে। বিশেষ করে লোহার সঙ্গে। আমরা যাকে মরচে বলি তা আসলে লোহার সঙ্গে অক্সিজেনের জোট বাঁধার ফল। আর পৃথিবীর শিলাখণ্ডে লোহার কোনো অভাব নেই। ফলে বাতাসের মুক্ত অকসিজেন কিছু পরিমাণে শিলাখণ্ডের লোহার সঙ্গে মিশে গিয়ে মরচে হয়ে জেঁকে বসে। কিন্তু বাকিটা বাতাসেই মুক্ত অবস্থাতে থেকে যায়। একটু একটু করে পরিমাণেও বাড়ে। এমনি ভাবেই বাতাসে মুক্ত অকসিজেনের সৃষ্টি।

নাইট্রোজেন চক্র

জীবদেহকে কেন্দ্র করে আরো একটি চক্র তৈরি হয়েছে, যাকে বলা হয় নাইট্রোজেন চক্র। কি ভাবে?

জীবদেহে আছে প্রোটিন আর প্রোটিনে আছে নাইট্রোজেন—এ-খবর আমরা আগে জেনেছি। এই নাইট্রোজেন পাওয়া যায় নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ নাইট্রেট থেকে। আর এই নাইট্রেট আছে মাটির সঙ্গে মিশে। উদ্ভিদের শেকড় মাটি থেকে এই নাইট্রেট টেনে নিতে পারে। উদ্ভিদ-কোষে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অনবরত প্রোটিন তৈরি হয়ে চলেছে, তার অন্যতম জরুরি উপাদান নাইট্রোজেন পাওয়া যায় এই নাইট্রেট থেকেই। এমনি ভাবে উদ্ভিদের মারফৎ মাটি থেকে জীবদেহে নাইট্রোজেনের যোগান চলে আসছে। তবে বিশেষ ভাবে মনে রাখা দরকার, মাটি থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহের ক্ষমতা আছে একমাত্র উদ্ভিদেরই। নাইট্রোজেন সংগ্রহের জন্যে প্রাণীরা কখনো মাটি খেতে যায় না। খেয়েও কোনো লাভ নেই। প্রাণীরা

কেউ খায় উদ্ভিদ, কেউ উদ্ভিজভোজী প্রাণী। তাহলে প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে জীবদেহে নাইট্রোজেন যোগানের তিনটি ধাপ পাওয়া যাচ্ছে। প্রথম ধাপে মাটি থেকে উদ্ভিদ, দ্বিতীয় ধাপে উদ্ভিদ থেকে তৃণভোজী, তৃতীয় ধাপে তৃণভোজী থেকে মাংসাশী।

কিন্তু প্রকৃতির ভাণ্ডারটি কখনোই অফুরন্ত হতে পারে না। তাছাড়া মাটির সঙ্গে মিশে থাকা নাইট্রেটের পরিমাণও সামান্যই। সহজেই মনে হতে পারে, মাটির সঙ্গে মিশে থাকা এই নাইট্রেট অনেক আগেই নিঃশেষ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমরা ও উদ্ভিদরা যে এখনো বেঁচে আছি, তা থেকেই বোঝা যায় যে তা হয়নি। আসলে, মাটি থেকে নাইট্রোজেনের যোগানটা একতরফা নয়, অন্যদিক থেকে একটি সরবরাহের ব্যবস্থাও আছে। খরচ পুষিয়ে যাচ্ছে জমায়। নাইট্রোজেনের এই একদিকের খরচ ও অন্যদিকের জমা মিলিয়ে তৈরি হয়েছে একটি চক্র। আমরা খরচের দিকটা দেখেছি, এবারে জমার দিকে তাকানো যাক।

জীব যখন বেঁচে থাকে তখন খাদ্যগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাকে অনবরত কিছু কিছু পদার্থ বর্জন করেও চলতে হয়। এই বর্জ্য পদার্থগুলো মিশে যায় মাটির সঙ্গে। তারপরে জীব যখন মরে যায় তখনো তার মরা শরীরটা মাটিতেই মেশে। এই দুয়ের মধ্যেই থাকে নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ। এক ধরনের জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এই পদার্থগুলো পচতে শুরু করে ও রূপান্তরিত হয় অ্যামোনিয়ায়। তারপরে দ্বিতীয় আরেক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এই অ্যামোনিয়া রূপান্তরিত হয় নাইট্রাইটে। এখানেই শেষ নয়। তারপরেও তৃতীয় আরেক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে নাইট্রাইট রূপান্তরিত হয় নাইট্রেটে। যে মুহূর্তে মাটিতে নাইট্রেটকে ফিরে পাওয়া গেল, তখনই আবার শুরু হতে পারল উদ্ভিদের মারফৎ খরচের পালা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, একটি বিশেষ চক্রে পাক খেতে গিয়ে নাইট্রোজেন অনেকবারই চেহারা পালটায়। নাইট্রেট থেকে যদি

চক্রটিকে শুরু করা যায় তাহলে নাইট্রেট চেহারা পাল্‌টিয়ে প্রথমে হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসিড ও প্রোটিন, তারপরে অ্যামোনিয়া, তারপরে নাইট্রাইট, তারপরে আবার নাইট্রেট।

এই চক্রটিকে যদি একটি ফাঁপা নলের রিঙের সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে মনে হতে পারে, এই নলের মধ্যে দিয়ে একটি প্রবাহ যেন সমানে পাক খেয়ে খেয়ে চলেছে।

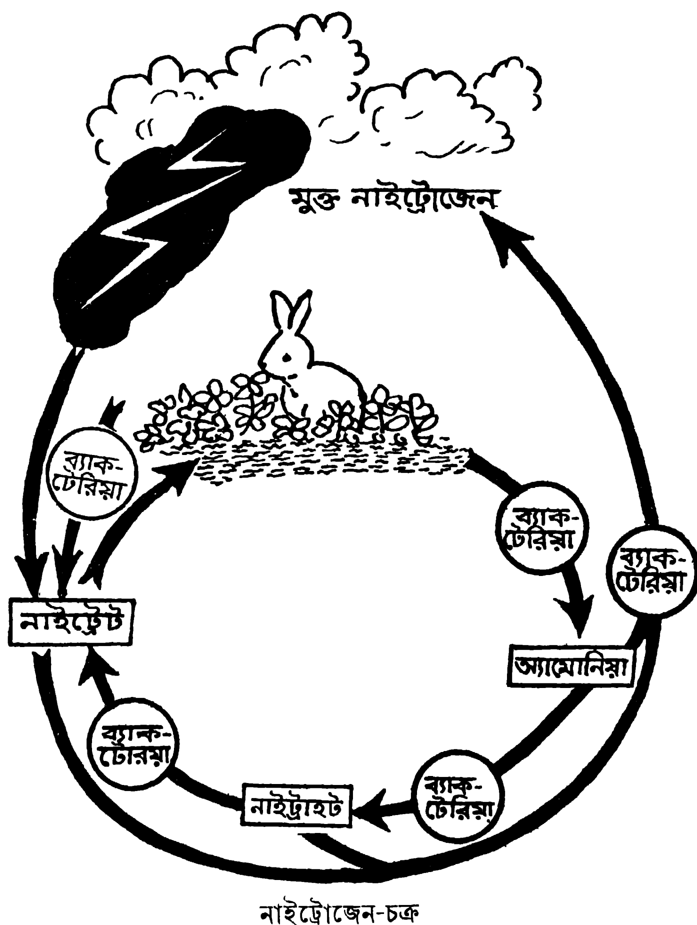
কিন্তু বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, এই ফাঁপা নলে দু-একটি ছিদ্র থেকে গিয়েছে আর ছিদ্র থাকার দরুন নল থেকে কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন খোয়া যাচ্ছে। এই ছিদ্রের মূলেও রয়েছে চতুর্থ আরেক ধরনের ব্যাক্‌টেরিয়া, যারা অ্যামোনিয়া ও নাইট্রাইট ও নাইট্রেটে ভাঙন ধরিয়ে এই তিনটি পদার্থের ভেতরকার নাইট্রোজেনকে পৃথক করে দিতে পারে। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি, নাইট্রোজেন, চক্রের প্রবাহে বিশুদ্ধ নাইট্রোজেনের কোনো স্থান নেই। ফলে ব্যাক্‌-টেরিয়ার আক্রমণে যে বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন গ্যাস তৈরি হচ্ছে, তা চক্রের প্রবাহ থেকে বেরিয়ে এসে বাতাসে মিশে যায়। বাতাসের এই মুক্ত নাইট্রোজেনকে কিন্তু উদ্ভিদ কোনো কাজে লাগাতে পারে না। নাইট্রোজেন মুক্ত হওয়া মানেই জীবের কছে নাইট্রোজেন খোয়া যাওয়া।

এই ব্যাপারটিও যদি একতরফা চলতে থাকে তাহলে কিছুকালের মধ্যেই সমস্ত নাইট্রোজেন খোয়া যাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, যতোই খোয়া যাক, প্রকৃতির রাজ্যে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও আছে।

কোনো কোনো উদ্ভিদের শেকড়কে আশ্রয় করে থাকে পঞ্চম আরেক ধরনের ব্যাক্‌টেরিয়া যারা বাতাসের মুক্ত নাইট্রোজেনকে নাইট্রেটে রূপান্তরিত করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারে। তাছাড়া, বজ্র-পাতের সময়ে বাতাসে যে বিদ্যুতের প্রবাহ সৃষ্টি হয় তার ফলেও বাতাসের মুক্ত নাইট্রোজেন হয়ে ওঠে নাইট্রেট, তারপরে বৃষ্টির জলের সঙ্গে মাটিতে নেমে আসে।

ব্যাপারটা প্রায় সেই চৌবাচ্চার অঙ্কের মতো। একটি নল দিয়ে চৌবাচ্চার জল বেরিয়ে যাচ্ছে, আরেকটি নল দিয়ে চৌবাচ্চায় জল ঢুকছে—দুয়ে মিলে চৌবাচ্চার জল যেমন থাকার তেমনি থেকে যাচ্ছে। এখানেও নাইট্রোজেন খোয়া যাবার ছিদ্রটা বন্ধ হল না বটে কিন্তু নাইট্রোজেনকে আবার নাইট্রেটের চেহারায় মাটিতে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা পাওয়া গেল।

চৌবাচ্চার অঙ্কে জল বেরিয়ে যাবার নলের তোড় যদি বেশি হয়



নাইট্রোজেন-চক্র

তাহলে চৌবাচ্চাটা খালি হতে শুরু করবে। মাটির নাইট্রেটও যদি বেশি তোড়ে খরচ হতে থাকে তাহলে ফুরিয়ে যাবার সম্ভাবনা।

এমনি ব্যাপার অনেক সময়ে ঘটে চাষের জমিতে। বেশি মাত্রার ফলনের জন্যে জমির নাইট্রেটের ভাণ্ডার যতো তাড়াতাড়ি খরচ হয় ততো তাড়াতারি পূরণ হয় না। তখন জমিতে নাইট্রেট সার দেবার প্রয়োজন হয়। কারখানায় নাইট্রেট সার তৈরি হয়ে থাকে অ্যামোনিয়া থেকে আর অ্যামোনিয়া তৈরি হয়ে থাকে নাইট্রোজেন গ্যাসের সঙ্গে হাইড্রোজেন যুক্ত করে। প্রকৃতির রাজ্যেও সম্ভবত এমনি প্রক্রিয়াতেই নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থগুলো তৈরি হয়েছিল।

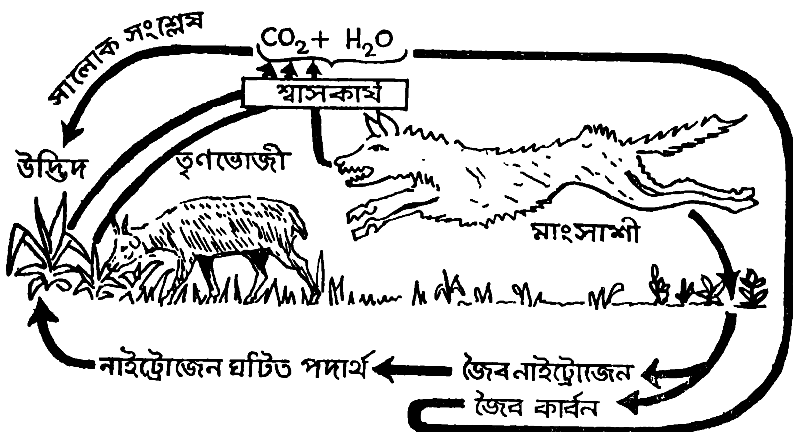
সীম্‌বায়োসিস

তাহলে তিনটি মৌলিক পদার্থ নিয়ে তিনটি চক্র পাওয়া যাচ্ছে। কার্বন, অক্‌সিজেন ও নাইট্রোজেন। জীবের বেঁচে থাকার সঙ্গে এই তিনটি চক্রের গভীর সম্পর্ক। এবারে এই তিনটি চক্রকে একসঙ্গে চোখের সামনে তুলে ধরে জীবজগতের পুরো চেহারাটি সম্পর্কে খানিকটা ধারণা করা যেতে পারে। জীবজগতের একদিকে রয়েছে সবুজ উদ্ভিদ, অন্যদিকে প্রাণী। উদ্ভিদের আছে সালোকসংশ্লেষ, প্রাণীর আছে শ্বাসকার্য। সালোকসংশ্লেষের জন্যেই উদ্ভিদের শরীরে প্রোটিন ও অন্যান্য জৈব পদার্থ তৈরি হতে পারছে আর বাতাসে সরবরাহ হচ্ছে মুক্ত অক্‌সিজেন। অন্যদিকে প্রাণীর নিশ্বাসে পাওয়া যাচ্ছে কার্বন ডাই-অক্‌সাইড। খুবই সরলভাবে দেখার চেষ্টা করলে বলা যেতে পারে, সালোকসংশ্লেষ ও শ্বাসকার্য যেন দুই বিপরীত প্রক্রিয়া।

পৃথিবীর মাটি ও বাতাস থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে প্রোটিন ও জৈব পদার্থ তৈরি করার ক্ষমতা আছে একমাত্র উদ্ভিদেরই। প্রাণীদের এই ক্ষমতা নেই। প্রাণীদের প্রোটিন ও জৈব পদার্থ পাওয়া চাই তৈরী অবস্থায়—আর এজন্যে প্রাণীরা নির্ভর করে শেষ পর্যন্ত উদ্ভিদের ওপরে।

এমনি ভাবে, সবদিক থেকেই দেখা যাবে, উদ্ভিদের বেঁচে থাকতে

হলে প্রাণী থাকা চাই, প্রাণীর বেঁচে থাকতে হলে উদ্ভিদ থাকা চাই। উদ্ভিদ ও প্রাণীর এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকেই বলা হয় সীম্বায়োসিস (symbiosis) বা মিথোজীবিতা।
জীবজগতে একের সঙ্গে অপরের সম্পর্ক এবং একের ওপরে অপরের নির্ভরশীলতাকে একটি ছবিতেও এঁকে দেখানো যেতে পারে।



সীম্বায়োসিস

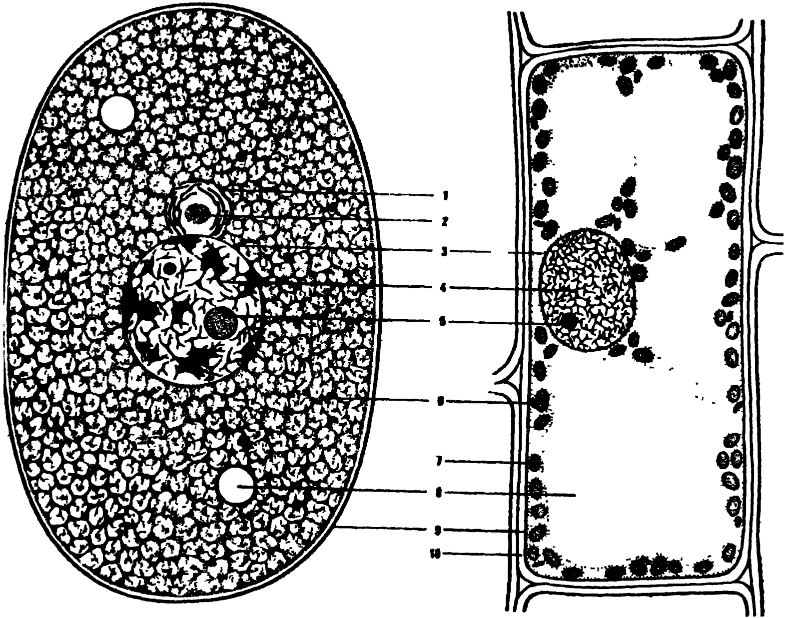
ছবিটি আঁকা হয়েছে খুব মোটা দাগে। ছবিতে লক্ষ্য করা যাবে, মাংসাশী ও তৃণভোজীর মতো উদ্ভিদেরও শ্বাসকার্য রয়েছে। প্রাণীর মতো উদ্ভিদের অবশ্যই নাক ও ফুসফুস নেই। কিন্তু প্রক্রিয়াটি অভিন্ন—অক্সিজেন টেনে নেওয়া এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল ছেড়ে দেওয়া। তবে মনে রাখা দরকার, উদ্ভিদের শ্বাসকার্য চলে দিনে-রাতে সব সময়েই আর সালোকসংশ্লেষ চলতে পারে শুধু দিনের আলোতেই।
ছবি থেকে একথাটিও স্পষ্ট হবে যে সম্পর্ক শুধু জীবের সঙ্গে জীবের নয়, জড়ের সঙ্গে জীবেরও। উদ্ভিদের বেঁচে থাকতে হলে জল-মাটি-বাতাস চাই। জল-মাটি-বাতাসের জড়জগৎ থেকেই উদ্ভিদ সংগ্রহ করে থাকে তার পুষ্টির উপকরণ—কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি। আমরা বলেছি, জড় ও জীবের একটি প্রধান পার্থক্য—জড়ের পুষ্টির প্রয়োজন নেই, জীবের আছে। এই কারণে

প্রাণের উৎসে এই অভিযানে আমাদের বিশেষ করে নজর দিতে হবে পুষ্টির ব্যাপারটির দিকে, বা, জীববিজ্ঞানের ভাষায় যাকে আমরা বলেছি মেটাবলিজম, তার দিকে। আমরা আরো বলেছি, জীবদেহের কোষই হচ্ছে সেই আশ্চর্য কারখানা-ঘর যেখানে এই বিচিত্র ক্রিয়া-কাণ্ড অহরহ অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। অতএব জীবনের এই কর্মশালাটির পরিচয় আরো একটু বিশদভাবে নেওয়া দরকার।

কোষের অভ্যন্তরে

কারখানা-ঘর বা কর্মশালা বা আর যাই বলা হোক না কেন, সবই কিন্তু কল্পনাতীত রকমের ক্ষুদ্র একটি পরিসরের মধ্যে। এক মিলি-মিটারের একশো-ভাগের একভাগ বা এক ইঞ্চির আড়াইহাজার-ভাগের একভাগ –এই হচ্ছে একটি কোষের ব্যাস। অথচ এই অসামান্য রকমের সামান্য পরিসরের মধ্যে যে-সব জটিলতম রাসায়নিক ক্রিয়াকাণ্ড ঘটে চলেছে তা আজ পর্যন্ত কোনো গবেষণাগারে হুবহু নকল করা যায়নি। 'হুবহু' শব্দটির ওপরে জোর দিতে চাই। গবেষণাগারে সামান্য ধরনের জৈব রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটাতে হলেও সময় লাগে অনেক বেশি, আয়োজন করতে হয় অনেক বিরাট। সেজন্যে অবশ্যই চাই বিভিন্ন মাত্রায় তাপ ও বিদ্যুৎ প্রয়োগের ব্যবস্থা, অনেক রকমের পাত্র আর অনেকখানি পরিসর। শেষ পর্যন্ত কোষের ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার একটা নকল অবশ্যই পাওয়া যায়। কিন্তু কোষের অভ্যন্তরে সেই একই ক্রিয়াপ্রক্রিয়া যতো অল্প সময়ের মধ্যে ও যতো নিখুঁতভাবে ঘটে চলেছে—তেমন ভাবে কিছুতেই নয়। তাও এখনো পর্যন্ত কোষের অভ্যন্তরের সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডকে নকল করা সম্ভব হয়নি। চেষ্টা অবশ্যই চলেছে। তবে বিজ্ঞানীদের পক্ষে বলার কথা এই যে কোষের অভ্যন্তরের ক্রিয়াপ্রক্রিয়া সম্পর্কে রাসায়নিক গবেষণা মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ বছরের। তার আগে পর্যন্ত জৈব রসায়নবিদ্যা এতখানি উন্নত হয়নি যে কোষের অভ্যন্তরের ক্রিয়াপ্রক্রিয়া সম্পর্কে কোনো রকম ধারণা করা যেতে পারত। অন্যদিকে, এত অল্প সময়ের মধ্যেই

বিজ্ঞানীরা কোষের অভ্যন্তরের ক্রিয়াপ্রক্রিয়াকে যতোটুকু নকল করতে পেরেছেন, তা অসামান্য কৃতিত্ব বলে স্বীকৃত হয়েছে। সম্ভবত এমন দিন খুব বেশি দূরে নয় যখন কোষের অভ্যন্তরের সমস্ত ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে কৃত্রিমভাবে ঘটানো যাবে। তখন আর মানুষের খাদ্যের কোনো অভাব থাকবে না। কারণ, যে প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে উদ্ভিদের একটি কোষ প্রোটিন ও অন্যান্য জৈব পদার্থ তৈরি করে চলে, তারই একটি নকল মানুষের আয়ত্তে এসে যাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে পরে আবার আমরা আলোচনা তুলব।

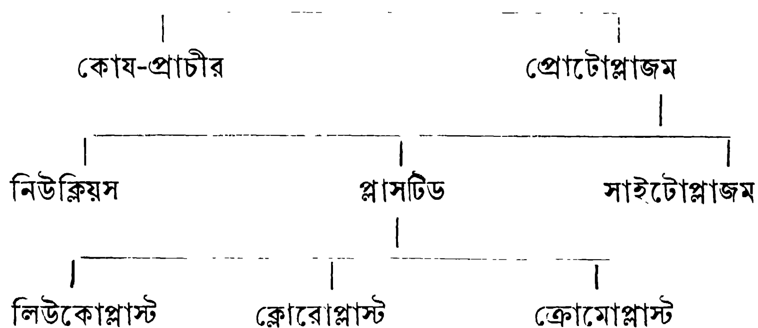


কোষ—(বাঁ দিকে) প্রাণীর, (ডান দিকে) উদ্ভিদের। দুটি কোষেই দেখা যাচ্ছে সাইটোপ্লাজ্‌ম্‌-এর মধ্যে ঘনতর পদার্থের গোলাকৃতি নিউক্লিয়স। প্রাণী-কোষে 1 ও 2 চিহ্নিত যে-দুটি অংশ দেখানো হয়েছে তাদের নাম যথাক্রমে গোল্‌জি পদার্থ ও সেন্ট্রিওসোম। প্রথমটি সম্ভবত গ্ল্যাণ্ডের সক্রিয়তাকে সাহায্য করে। দ্বিতীয়টি সক্রিয় হয়ে ওঠে কোষ-বিভাজনের সময়ে। কোষের অন্যান্য অংশ: (3) নিউক্লিয়াসের মেমব্রেন, (4) ক্রোমোসোম, (5) নিউক্লিওলাস (6) মাইটোকনড্রিয়া, (7) প্লাস্টিড, (8) ভ্যাকুওল, (9) কোষ-পর্দা (10) কোষ-প্রাচীর।

তার আগে কোষের বিভিন্ন অংশের আরো কয়েকটি নাম জেনে রাখা দরকার। কোষের মধ্যে থকথকে জেলির মতো যে পদার্থটি আছে তার নাম প্রোটোপ্লাজম। বাইরের দিকে আবরণ হিসেবে আছে কোষ-পর্দা (cell membrane), যা জীবন্ত প্রোটোপ্লাজমেরই অংশ। উদ্ভিদের কোষে এই পর্দারও বাইরে আছে কোষ-প্রাচীর। এই প্রাচীরটি কিন্তু মৃত পদার্থে তৈরি। প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে যে ঘনতর অংশটি রয়েছে তাকে বলা হয় নিউক্লিয়স। বাকি অংশকে বলা হয় সাইটোপ্লাজম (cytoplasm)। ছবি দেখলে বোঝা যাবে সাইটো-প্লাজমের সমুদ্রে নিউক্লিয়স যেন দ্বীপ। তবে দ্বীপটি যেমনই হোক, সমুদ্রটি কিন্তু কোনো সময়েই স্থির নয়। সমুদ্রের প্রতিটি অংশে প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনের ঝড় বয়ে চলেছে। আর ঝড়ের তাণ্ডবে তৈরি হচ্ছে অবিরাম একটি চলন।

সাইটোপ্লাজমের এই সমুদ্রে নানা বিচিত্র পদার্থকে দেখা যেতে পারে। যেমন, সরু সরু সুতোর মতো কতকগুলো পদার্থ যাদের বলা হয় মাইটোকনড্রিয়া (mitochondria), ক্ষুদে ক্ষুদে গোলকের মতো কতকগুলো পদার্থ যাদের বলা হয় প্লাস্টিড (plastid), তাছাড়াও আরো অনেক কিছু। আবার এই প্লাস্টিডেরও প্রকারভেদ আছে। অবর্ণ ও বর্ণ, অর্থাৎ যাদের রঙ নেই ও যাদের রঙ আছে। রঙহীন প্লাস্টিডকে বলা হয় লিউকোপ্লাস্ট (leucoplast) আর রঙযুক্তদের মধ্যে সবুজকে বলা হয় ক্লোরোপ্লাস্ট (chloroplast) ও সবুজ বাদে অন্যদের ক্রোমোপ্লাস্ট (chromoplast)। নাম ও রঙ শুনেই আঁচ করা যাচ্ছে, ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যেই আছে ক্লোরোফিল।

এই নামগুলোকে একটি ছকের মধ্যে তুলে ধরলে এই রকমটি দেখাবে :



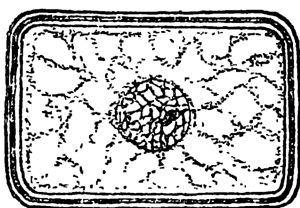
ছবিতে দেখা যাবে, কোষের অভ্যন্তরের সাদা একটি অংশের নাম দেওয়া হয়েছে ভ্যাকুওল (vacuole); এটি আসলে স্বচ্ছ তরল পদার্থের বুদ্‌বুদ। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কোষ যখন বড়ো হয়ে ওঠে তখন আর তার মধ্যে নতুন করে সাইটোপ্লাজম তৈরি হয় না--ফলে ভ্যাকুওলই স্থান জুড়ে বসে। তাই বলে ভ্যাকুওল কিন্তু ভ্যাকুয়াম নয়—তার মধ্যে আছে বাতাস ও নানা ধরনের জৈব ও অজৈব পদার্থ।

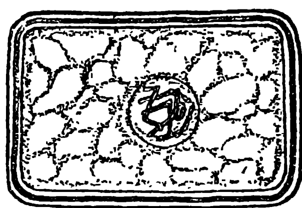
কোষ সম্পর্কে আলোচনা অল্প দু-এক কথায় শেষ হবার নয়। জীব-দেহের কোষ আকারে আণুবীক্ষণিক হওয়া সত্ত্বেও গড়নে ও কার্য-কলাপে খুবই জটিল। ইংরেজিতে এই একটি বিষয়েই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বই লেখা হয়েছে। কিন্তু এই বইয়ের বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ নেই। আমরা চলেছি প্রাণের উৎস আবিষ্কার করতে। এই লক্ষ্য সামনে রাখতে হয়েছে বলে আগেও অনেক বিষয়কে আমরা মাঝপথে ছেড়ে দিয়েছি। তেমনি কোষ সম্পর্কেও অনেক কথা না-বলা থেকে যাবে। আবার অনেক জটিল বিষয়কে কেটে-ছেঁটে উপস্থিত করতে হবে সরলভাবে। তাই বলে বিষয়টির গুরুত্ব কমছে না। পদার্থ সম্পর্কে ধারণা করতে হলে যেমন পরমাণুকে জানতে হয়, তেমনি জীবন সম্পর্কে ধারণা করতে হলে জানতে হবে কোষকে। আমরা বলেছি, কোষ হচ্ছে অতি বৃহৎ ও অতি জটিল

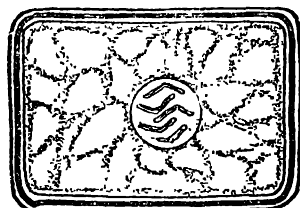
একটি রাসায়নিক কারখানা। কাজেই রসায়ন সম্পর্কেও আমাদের আলোচনা তুলতে হবে। কিন্তু তার আগে, একটি কোষ কি-করে দুটি হচ্ছে সেই প্রক্রিয়া সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে নেওয়া দরকার।

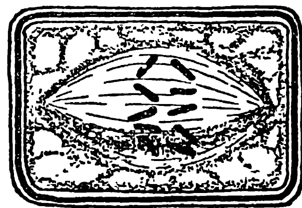
একটি থেকে দুটি

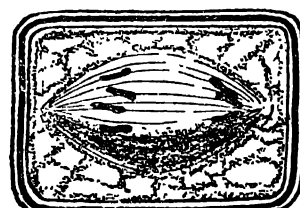
এক থেকে দুই, দুই থেকে চার, চার থেকে আট—এমনি ভাবে

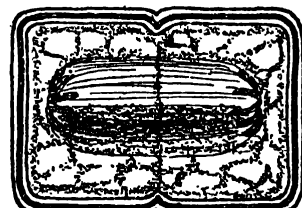

1

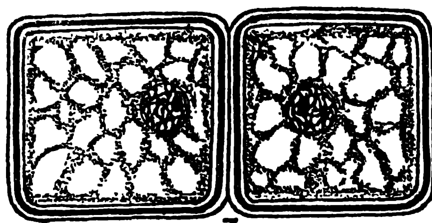

2


3


4


5


6


7

মাইটোসিস

কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়ে চলে। প্রক্রিয়াটি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। প্রাণের মৃত্যুহীন বিজয়-অভিযান প্রধানত এই প্রক্রিয়াটিকে আশ্রয় করেই।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে দেখলে আগাগোড়া প্রক্রিয়াটিকে লক্ষ্য করা যেতে পারে। কোষের ভেতরকার নিউক্লিয়স হয় এই আশ্চর্য নাটকের মঞ্চ। প্রথমে দেখা যাবে, নিউক্লিয়সের উপাদান স্পষ্ট কতকগুলো সুতোর আকার নিতে চাইছে। এই সুতোগুলোকে বলা হয় ক্রোমোসোম (chromosome)। এই ক্রোমোসোমগুলো ক্রমেই হয়ে ওঠে বেঁটে ও মোটা আর কোষের মাঝ-বরাবর বিন্যস্ত হয়। তারপরেই ঘটে সেই আশ্চর্য ব্যাপারটি। প্রত্যেকটি ক্রোমোসোম দু-ভাগ হয়ে যায়। এক থাকলে দুই, দুই থাকলে চার, তিন থাকলে ছয়—এমনি ভাবে ক্রোমোসোমের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে চলে। এইসঙ্গে যে ছবিটি দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যাবে, ৩নং পর্যায়ে ক্রোমোসোম ছিল পাঁচটি—৪নং পর্যায়ে পাওয়া যাচ্ছে তার দ্বিগুণ সংখ্যক, অর্থাৎ দশটি। ইতিমধ্যে লক্ষ্য করা যাবে, নিউক্লিয়স-মঞ্চের বাইরে সাইটোপ্লাজমের অংশেও একটা টানাপোড়েন শুরু হয়ে গিয়েছে আর সব মিলিয়ে কতকগুলো সুতোর মতো আকার গড়ে উঠছে। তারপরে এই সুতোগুলো দুই ঝাঁক ক্রোমোসোমকে দু-দিকে টানতে শুরু করে। ফলে ক্রোমোসোমগুলো সত্যি সত্যিই দুটি ঝাঁকে ভাগ হয়ে যায়। এই অবস্থায় কোষের মাঝ-বরাবর তৈরি হয় একটি পর্দা। ছবির ৬নং পর্যায়ে এই পর্দাটি তৈরি হতে দেখা যাচ্ছে। তারপরে আর একটি কোষ দুটি হয়ে যেতে বিশেষ কোনো বাধা থাকে না।

একটি কোষের দুটি হওয়ার এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় মাইটোসিস (mitosis)।

তবে এমন কতকগুলো বিশেষ কোষও আছে যাদের পক্ষে সরাসরি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় দ্বিগুণ হওয়া সম্ভব নয়। এই কোষে এমনিতে ক্রোমোসোম থাকে অর্ধেক সংখ্যক—বাকি অর্ধেক পাওয়া যায় অন্য

একটি কোষে। একটি কোষ থাকে স্ত্রী-জীবের শরীরে, অন্যটি পুরুষ-জীবের শরীরে। কোষদুটি যদি মিলিত হবার সুযোগ পায় তাহলে দুয়ে মিলে তৈরি হয় পূর্ণাঙ্গ একটি কোষ। তখন এই পূর্ণাঙ্গ কোষটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় দ্বিগুণ হয়ে চলে। এই বিশেষ ধরনের কোষ-বিভাজনকে বলা হয় মাইওসিস (meiosis)। এক্ষেত্রেও মনে রাখা দরকার যে যতোটা সরলভাবে বলার চেষ্টা হল মাইওসিস অবশ্যই তা নয়। প্রক্রিয়াটি খুবই জটিল। জীবের বংশরক্ষার সঙ্গে প্রক্রিয়াটি সম্পর্কিত। প্রজননবিদ্যা নামে জীববিজ্ঞানের পৃথক একটি শাখাই গড়ে উঠেছে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করবার জন্যে।

জিন

নানা রঙের পুঁতি দিয়ে যদি একটি মালা গাঁথা যায়, তাহলে পুঁতিগুলো কি-ভাবে সাজানো হল তারই ওপরে নির্ভর করবে মালার চেহারা। পুঁতিগুলোকে নানাভাবে সাজিয়ে নানারকম চেহারার মালা পাওয়া যেতে পারে। কোষ-নিউক্লিয়সের ক্রোমোসোমকেও তুলনা করা হয়েছে পুঁতি দিয়ে গাঁথা মালার সঙ্গে। নানা রকমের পুঁতি দিয়ে গাঁথা নানা রকমের মালা। ক্রোমোসোমের এই পুঁতিগুলো হচ্ছে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কতগুলো কণিকা যাদের নাম দেওয়া হয়েছে জিন (Gene)। দু-অক্ষরের ছোট্ট নামের এই কণিকাগুলোকেই বলা যেতে পারে কোষের মর্মবাণী। কোষের ক্রিয়াকাণ্ড কেমন হবে তা যেন জিনের অক্ষরে লেখা হয়ে আছে। অনেকটা নির্মাণকার্যের ব্লু-প্রিন্টের মতো। নির্মাণকার্যের সম্পূর্ণ চেহারাটি কেমন হবে তা যেমন ব্লু-প্রিন্টে নির্দিষ্ট করা থাকে, তেমনি জীবের আকৃতি-প্রকৃতি কেমন হবে তা নির্দিষ্ট করা থাকে ক্রোমোসোমের মধ্যে মালার মতো সাজানো জিনের সংখ্যায় ও গঠনে। শুধু তার একার নয়, তার বংশধরদেরও। একই বাপ-মায়ের সন্তানসন্ততি যে একই রকমের হয়ে থাকে তার মূলে আছে এই জিন। এই কারণে জিনকে বলা হয়ে থাকে জীবের বংশগতির

উপকরণ। প্রত্যেকটি জীব আগের বংশ থেকে এই উপকরণটি লাভ করে এবং পরের বংশকে এই উপকরণটি দিয়ে যায়। সাধারণত এই উপকরণটির মধ্যে কোনো অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায় না। ফলে বংশ থেকে বংশে সাদৃশ্য বজায় থাকে।

তবে জীববিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, নানা কারণে মাঝে মাঝে জিনের মধ্যে বিকৃতি এসে যায়। সেই বিকৃত জিনের কোষ শরীরে ধারণ করে যে জীবটি বড়ো হয়ে ওঠে, সে আর বংশের ধারাটিকে পুরোপুরি বজায় রাখতে পারে না। তখন তার চেহারার মধ্যে অন্য বৈশিষ্ট্য এসে পড়ে। এই ব্যাপারটিকে জীববিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয়ে থাকে পরিব্যক্তি বা মিউটেশন। ডারউইন যাকে বলেছেন বিবিধায়ন তা এই পরিব্যক্তিরই ফল। তবে বিবিধায়ন সম্পর্কে ডারউইনের ব্যাখ্যা আজ আর পুরোপুরি গ্রাহ্য নয়। বিষয়টি নিয়ে একটু পরেই আমাদের আলোচনা তুলতে হবে।

মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় একটি কোষের তুটি হয়ে যাবার কথা আগে বলেছি। এই প্রক্রিয়া চলার সময়ে ক্রোমোসোমের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। আসলে দ্বিগুণ হয় জিনের সংখ্যা। ফলে একটি ক্রোমোসোম হয়ে ওঠে হুবহু একই রকমের তুটি। পরে এই তুটি ক্রোমোসোম পৃথক হয়ে গিয়ে সৃষ্টি করে তুটি পৃথক কোষ। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে আগের কোষটিতে জিনের সংখ্যা ও গঠন যেমনটি ছিল, হুবহু সেই রকমটিই পাওয়া যাচ্ছে পরের কোষতুটিতে। ফলে কোষতুটির ক্রিয়াকাণ্ডও হুবহু একই রকমের থেকে যাচ্ছে।

এনজাইম

আমরা জেনেছি, জীবদেহের কোষে জটিল রাসায়নিক ক্রিয়াকাণ্ড ঘটে চলে। আর তা এত অল্প সময়ের মধ্যে ও এমন নিখুঁতভাবে যে বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে তার হুবহু নকল তৈরি করা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, গবেষণাগারে যে-সমস্ত রাসায়নিক ক্রিয়া এতখানি আয়োজন ও সময় সাপেক্ষ তা একটি আণুবীক্ষনিক

কোষের মধ্যে এত সহজে সম্পন্ন হয় কি করে? একটি দৃষ্টান্ত দিলে প্রশ্নটি বুঝতে সুবিধে হবে।

ঈস্ট নিতান্তই একটি এককোষী জীব, জেলির মতো দেখতে অতি ক্ষুদ্র একটি থলি বিশেষ। এই জীবটি শর্করাকে গাঁজিয়ে তুলতে পারে। থলিটি চটচটে তরল পদার্থে ভর্তি, যেখানে অত্যন্ত জটিল সমস্ত রাসায়নিক ক্রিয়াকাণ্ড ঘটে থাকে। যার ফলে শর্করা থেকে তৈরি হয় অ্যাল্‌কোহল। এককোষী জীব ঈস্ট অতি সহজেই এই জটিল ক্রিয়াটি সম্পন্ন করে। অথচ বিজ্ঞানীকে যদি তাঁর গবেষণাগারে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শর্করা থেকে অ্যাল্‌কোহল পেতে হয় তাহলে তাঁকে যে পরিমাণ আয়োজন করতে হবে তা প্রায় একটি অসম্ভবকে সম্ভব করার সামিল। অনেক সময় নিয়ে, নির্দিষ্ট অনুক্রমে অনেকগুলো জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটিয়ে তবেই শর্করা থেকে অ্যাল্‌কোহল পাওয়া সম্ভব। এখানেই প্রশ্ন ওঠে, ঈস্টের মতো অতি নগণ্য একটি জীব এমন আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী হয় কি করে?

একসময়ে ভাবা হত, এই সমস্ত জটিল রাসায়নিক ক্রিয়াকাণ্ড জীবন্ত কোষের সাহায্য ছাড়া ঘটানো সম্ভব নয়। অর্থাৎ ক্রিয়াকাণ্ডগুলো পুরোপুরি ভাবেই জৈবিক। কিন্তু তারপরে একজন জার্মান রসায়নবিদ প্রমাণ করলেন, জীবন্ত কোষের রসটুকুকে যদি নিংড়ে বার করে নেওয়া যায় তাহলে সেই রসের সাহায্যেও শর্করাকে গাঁজিয়ে তুলে অ্যাল্‌কোহল পাওয়া যেতে পারে। তার মানে, জীবন্ত কোষের দরকার হল না, কোষের অভ্যন্তরের রসের সাহায্যেই একই ধরনের রাসায়নিক ক্রিয়াকাণ্ড ঘটানো গেল। তার মানে, এই রসের মধ্যেই এমন কোনো পদার্থ রয়েছে যা সেই আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী। এই পদার্থটির নাম দেওয়া হল এন্‌জাইম (enzymes)।

অজৈব রসায়নে অনেক আগে থেকেই এক ধরনের পদার্থকে বলা হয় ক্যাটালিস্ট বা অনুঘটক। এই ক্যাটালিস্টের সাহায্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে অনেক সহজে ও অনেক কম সময়ের মধ্যে ঘটানো চলে। কিন্তু সম্পূর্ণ রাসায়নিক প্রক্রিয়াটি ঘটে যাবার পরে ক্যাটালিস্ট

কিন্তু একই রকম চেহারায় থেকে যায়। এন্‌জাইমের ভূমিকাও ক্যাটালিস্টের মতো। এন্‌জাইমকে বলা চলে জৈব-ক্যাটালিস্ট। কোষের অভ্যন্তরে এতসব জটিল রাসায়নিক ক্রিয়াকাণ্ড যে এত সহজে সম্পন্ন হতে পারে তার মূলে আছে এই এন্‌জাইম।

জীবদেহে এন্‌জাইম পাওয়া যায় নানা রকমের। যেমন, খাদ্যকে পরিপাক করবার জন্যে প্রাণীর খাদ্যনালীর নানা জায়গায় রয়েছে নানা ধরনের এন্‌জাইম। পাকস্থলীতে পেপ্‌সিন। এই এনজাইমটি প্রোটিনকে বিশ্লিষ্ট করতে শুরু করে। অন্ত্রদেশের অগ্ন্যাশয় বা প্যান্‌ক্রিয়াসেও এন্‌জাইম নিঃসৃত হয়ে থাকে। সেখানে আরো অনেকগুলো রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অনুসন্ধান চালিয়ে গেলে দেখা যাবে প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রতিটি রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পন্ন করবার জন্যে অজস্র এনজাইমের সক্রিয়তা। যেখানেই জীবনের লক্ষণ, সেখানেই এনজাইমের ভূমিকা। জীবনকে এনজাইম-চালিত বললেও ভুল বলা হয় না।

আমরা বলেছি, জীবদেহের কোষ একটি জটিল রাসায়নিক কারখানা। এনজাইমকে বলা চলে এই কারখানানার শ্রমিক, আর জিন্‌কে ফোরম্যান। রাসায়নিক ক্রিয়াকাণ্ডগুলো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে আধুনিক কারখানার অ্যাসেম্ব্লি লাইনে উৎপাদন হওয়ার মতো। তেমনি নিখুঁত সামঞ্জস্য, তেমনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট কাজ। আর সব মিলিয়ে অতি জটিল একটি প্রক্রিয়ার অতি সুশৃঙ্খল রূপায়ণ। প্রাণের উৎসে অভিযানে আমাদের বিশেষ করে আবিষ্কার করতে হবে এই সুশৃঙ্খল রূপায়ণের রহস্যটিকেই। জানবার বিষয় এই নয় যে প্রাণের উপাদানগুলো পাওয়া গেল কোত্থেকে? জানবার বিষয় বিশেষ করে এই যে প্রাণের এই উপাদানগুলোর মধ্যে এমন একটি আশ্চর্য সংগঠন কি করে সম্ভব হল?

সরলতম কোষ

কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোষ হয়ে থাকে খুবই সরল। ব্যাক্‌টেরিয়ার

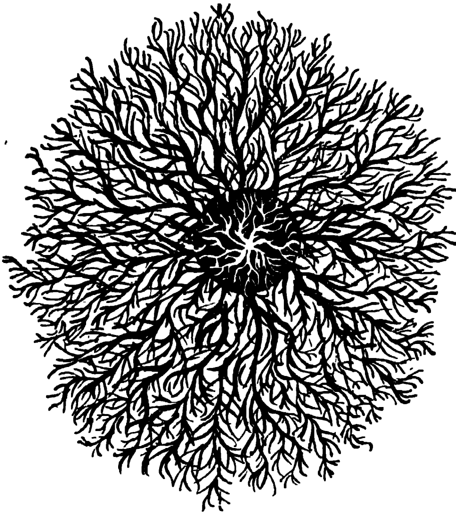
নাম আমরা শুনেছি। ব্যাক্টেরিয়ার কোষে নিউক্লিয়স বলে আলাদা কিছু নেই, যদিও নিউক্লিয়সের উপাদানকে পাওয়া যায় সাইটো-প্লাজমের মধ্যে ছড়ানো ছিটনো অবস্থায়। এই কারণে ব্যাক্টেরিয়ার কোষ বিভক্ত হবার সময়ে জটিল মাইটোসিস প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না। সাধারণ নিয়মেই আধাআধি ভেঙে গিয়ে একটি থেকে দুটি হয়। যেহেতু এই কোষে নিউক্লিয়সের উপাদানগুলো ছড়ানো ছিটনো থাকে, সেই কারণে কোষটি ভেঙে দুটি হবার সময়ে নিউ-ক্লিয়সের উপাদানও দু-ভাগ হয়ে যায়।

শ্যাওলার বেলাতেও দেখা যায়, কোনো কোনো কোষে নিউক্লিয়স তেমন স্পষ্ট নয়, ব্যাক্টেরিয়ার মতোই নিউক্লিয়সের উপাদান ছড়ানো ছিটনো ; আবার কোনো কোনো কোষে নিউক্লিয়সের উপাদান একটি জায়গায় জড়ো হয়েছে বটে কিন্তু তাকে ঘিরে কোনো পর্দা তৈরি হয়নি।

এ থেকে মনে হতে পারে, পৃথিবীতে প্রাণের অভিযান শুরু হয়েছিল একটি ব্যাক্টেরিয়ার কোষকে আশ্রয় করে। এই সরলতম কোষটি পরে ক্রমেই জটিল হয়েছে। খুব সম্ভবত শ্যাওলার কোষ এই জটিলতার দিকে বিবর্তনের প্রথম ধাপ।

জড় থেকে জীব

কোনো কোনো রোগ একধরনের জীবাণুর দ্বারা সংক্রমিত হয়ে থাকে। রোগের কারণস্বরূপ এই জীবাণুগুলোকে বলা হয় ভাইরাস (virus)। রাসায়নিক দিক থেকে ভাইরাসের চালচলন অনেকটা জিন ও ক্রোমোসোমের মতো। এই ভাইরাস যদি কোষকে আশ্রয় করতে পারে তাহলে জিন ও ক্রোমোসোমের মতোই তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়ে চলে। এই বিচারে ভাইরাস অবশ্যই জীব। কিন্তু কোষের বাইরে ভাইরাসের চালচলন একেবারেই জড়ের মতো। তখন আর তাদের সংখ্যাবৃদ্ধিও নেই বা অন্য কোনো ধরনের সক্রিয়তাও নেই। অনেকে বলে থাকেন, ভাইরাস হচ্ছে জড় থেকে জীবে উত্তরণের প্রথম লক্ষণীয় নিদর্শন।



বংশগতি

মাটির হৃদয়খানি ব্যেপে
প্রাণের কাঁপন ওঠে কেঁপে

ডারউইন লক্ষ্য করেছিলেন, প্রত্যেকটি জীবেরই নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য থাকে আর এই বৈশিষ্ট্যগুলো জীবটির সন্তানের মধ্যেও প্রকাশ পায়। ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডারউইন তৎকালীন প্রচলিত মতকেই মেনে নিয়েছিলেন। সে-সময়ে ধারণা ছিল, বাপ ও মায়ের মিলিত বৈশিষ্ট্য নিয়েই সন্তানের জন্ম। অর্থাৎ, সন্তানের মধ্যে বাপ ও মায়ের বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটে। কিন্তু এই মতবাদে অনেকগুলো ব্যাপারের কোনো ব্যাখ্যা নেই। যেমন, একই মায়ের পেটের ভাইদের মধ্যে কেন তাহলে পার্থক্য থাকবে? বাপ ও মায়ের বৈশিষ্ট্য তো সবকটি ভাইয়ের মধ্যেই সমানভাবে ফুটে ওঠা উচিত! অন্য একটি সমস্যাও আছে। ধরে নেওয়া গেল, সন্তানের মধ্যে বাপ ও মায়ের বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটছে। কিন্তু এ-ব্যাপারটা যদি বংশানুক্রমে চলতে থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত এমন একটা অবস্থায় নিশ্চয়ই পৌঁছতে হবে যখন সমন্বয়-সাধন পুরোপুরি ঘটে গেছে। সেক্ষেত্রে আর কোনো নতুন বৈশিষ্ট্যের সম্ভাবনা থাকে না।

অর্থাৎ বংশগতিতে বিবিধায়ন লোপ পায়। সে-অবস্থায় প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়াটিও লোপ পেতে বাধ্য—কারণ বিবিধায়নই যদি না থাকে তো বাছাই হবে কিসের মধ্যে!

ফরাসী বিজ্ঞানী লামার্ক-এর ধারণা ছিল, ইচ্ছা অভ্যাস ব্যবহার বা অব্যবহারের ফলে জীবদেহ বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জন করে এবং পরে এই অর্জিত বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমিক হয়ে ওঠে। কিন্তু বাস্তব নিদর্শন এই ধারণার বিরোধী। জিরাফের ঘাড় লম্বা হয়েছে এই কারণে নয় যে কোনো একটি জিরাফ চেয়েছিল যে তার ঘাড় যেন লম্বা হয়।

এ-অবস্থায় জীবের বিবিধায়নের ব্যাপারটিকে ডারউইন ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। এই ব্যাখ্যা যাঁর গবেষণা থেকে প্রথম পাওয়া গিয়েছিল তিনি হচ্ছেন মেণ্ডেল। মেণ্ডেলের গবেষণার ফলাফল ১৮৬৫ সালেই প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু ১৯০০ সাল পর্যন্ত তিনি প্রায় অনাবিষ্কৃত ছিলেন। অন্তত ডারউইন এখবর রাখতেন না বলেই মনে হয়।

মেণ্ডেলের গবেষণার মূল কথা: বংশগতি নির্ভর করে কয়েকটি পারমাণবিক বিন্দুর ওপরে। এই বিন্দুগুলোর নাম, আমরা জেনেছি, জিন্। বিষয়টি নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি—এখানে শুধু একটি উপমার সাহায্যে বিষয়টিকে আরেকটু স্পষ্ট করতে চাই। কোষকে যদি পদার্থের অণুর সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে জিন্ হচ্ছে পরমাণু, যাদের সমন্বয়ে অণুটি গঠিত। পরমাণুর সমন্বয়ের ওপরে যেমন পদার্থের প্রকৃতি নির্ভর করে তেমনি জিনের সমন্বয়ের ওপরে নির্ভর করে বংশগতি। উপমাটি অন্য একদিক থেকেও ঠিক। আধুনিক পরমাণু-তত্ত্ব যেমন ডাল্টনকে ছাড়িয়ে বহুদূর অগ্রসর হয়ে গেছে, তেমনি অগ্রসর হয়েছে আধুনিক প্রজননবিদ্যা মেণ্ডেলীয় গবেষণাকে ছাড়িয়ে। আমাদের আলোচনার পক্ষে মেণ্ডেলীয় গবেষণার বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। আমরা শুধু জানতে চেষ্টা করব, প্রজননবিদ্যার গবেষণা ও আবিষ্কারের ভিত্তিতে

ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের সূত্রটিকে কোথায় কোথায় সংশোধন করা দরকার। তার আগে খুব সংক্ষেপে মেণ্ডেলের জীবন ও গবেষণা সম্পর্কে কিছু খবর জানা যেতে পারে।

জোহান গ্রেগর মেণ্ডেল

১৮২২ সালের জুলাই মাসে একটি কৃষক পরিবারে জোহান মেণ্ডেলের জন্ম। জন্মস্থান মোরাভিয়া, সে-সময়ে অস্ট্রিয়ার অংশ, এখন চেকোস্লোভাকিয়ার।

কৃষি ও বাগানের কাজে বাবাকে সাহায্য করতে গিয়ে ছেলেবেলা থেকেই তিনি প্রকৃতিপ্রেমিক হয়ে উঠেছিলেন। লেখাপড়া প্রথমত গ্রামের প্রাথমিক স্কুলে, তারপরে শহরের মাধ্যমিক স্কুলে। সতেরো বছর বয়সে স্কুলের লেখাপড়া শেষ হবার পরে চার বছর একটি ইনস্টিটিউটে। ছাত্রজীবনের শেষের কয়েক বছর কেটেছিল চরম আর্থিক অনটনে। উপোস দিতে দিতে শরীর গিয়েছিল ভেঙে। একুশ বছর বয়সে তাঁর এক শিক্ষকের পরামর্শে তিনি পাদ্রী-সম্প্রদায়ে যোগ দিলেন। তারপরে তাঁর জীবন কেটেছিল স্থানীয় মাধ্যমিক স্কুলে বদলী শিক্ষক হিসেবে ক্লাশ নিয়ে আর মঠের বাগানে নিজস্ব ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে। বদলী শিক্ষক এই কারণে যে মাধ্যমিক স্কুলের কর্তৃপক্ষ পৃথিবীর এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীকে শিক্ষকতার স্থায়ী পদের যোগ্যতাসম্পন্ন মনে করেননি। শেষ জীবনে তিনি মঠের প্রধানও হয়েছিলেন। ১৮৮৪ সালে তাঁর মৃত্যু। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর সম্মান তিনি পেয়েছিলেন মৃত্যুরও ষোল বছর পরে—১৯০০ সালে।

যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে তাঁর এই সম্মান তা তাঁর কালের পক্ষে একটু অসাধারণই বলতে হবে। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন বংশগতির সূত্র—পারিবারিক বৈশিষ্ট্য কি-ভাবে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়ে থাকে তার নিয়ম। এজন্যে তাঁকে আট বছর ধরে নিখুঁত একটি পরিকল্পনা নিয়ে ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করতে হয়েছিল। আট বছর

ধরে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার পরেই তিনি একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে পৌঁছতে পেরেছিলেন।

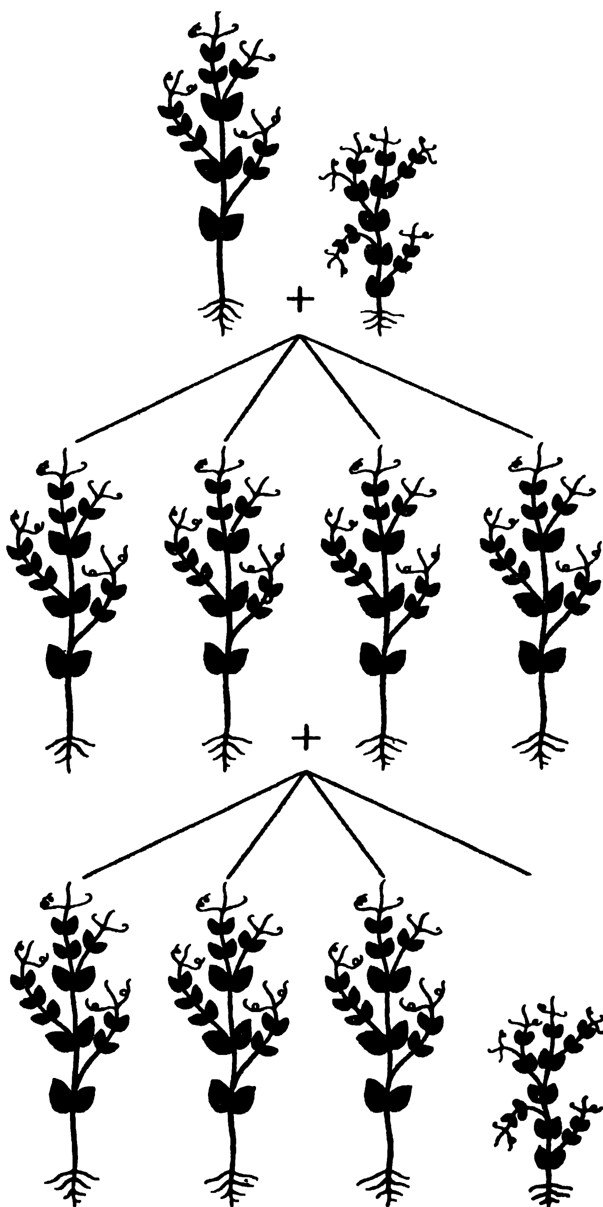
এই তত্ত্বটি, আগেই বলেছি, বংশগতি সম্পর্কে। বিষয়টি নিয়ে যে গবেষণা করার কিছু আছে তা সাধারণ বুদ্ধিতে ধারণা করা সম্ভব ছিল না। কটা-চোখ বাপের ছেলের চোখও যদি কটা হয় তাহলে ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক ধরে নিয়ে সবাই মন্তব্য করে থাকে, 'ছেলে হয়েছে ঠিক বাপের মতো।' মেণ্ডেলই প্রথম প্রশ্ন তুললেন, কেন এমনটি হবে? পারিবারিক সূত্রগুলো কোন্ নিয়মের সূত্রে বংশ থেকে বংশে সঞ্চারিত হয়ে থাকে?

একই বাপ-মায়ের ছেলেমেয়েরা মোটামুটি একই রকমের দেখতে হয়ে থাকে। কিন্তু হুবহু একই রকমের নয়। মিলের মধ্যেও পাওয়া যায় অমিল। একই রকমের আদল হওয়া সত্ত্বেও ফুটে ওঠে পৃথক পৃথক লক্ষণ।

বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে মেণ্ডেল প্রথমেই পৃথক পৃথক লক্ষণগুলোকে বিশুদ্ধ আকারে পেতে চেষ্টা করলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, বাগানের মটরশুঁটি গাছগুলো নানা রকমের হয়ে থাকে। কোনোটা লম্বা, কোনোটা বেঁটে। কোনোটার শুঁটিগুলো যেন ফুঁ দিয়ে ফোলানো। কোনোটা আঁটসাঁট। কোনোটার মটরদানা হলদে, কোনোটার সবুজ। এমনিভাবে তিনি সাতটি পৃথক পৃথক লক্ষণকে চিহ্নিত করলেন।

তারপরে তাঁর গবেষণা শুরু হল নির্ভেজাল লক্ষণ বিশিষ্ট দু-ধরনের মটরশুঁটির গাছ নিয়ে। একটি বিশুদ্ধ লম্বা। অপরটি বিশুদ্ধ বেঁটে। দেখা গেল লম্বা গাছের বীজ থেকে যে চারা গজাচ্ছে সেগুলোও বিশুদ্ধ লম্বা। বেঁটে গাছের চারা বিশুদ্ধ বেঁটে। তারপরে তিনি লম্বার সঙ্গে বেঁটের মিলন ঘটিয়ে সৃষ্টি করলেন সংকর চারা, যার মধ্যে লম্বা ও বেঁটে দুটি লক্ষণই যুক্ত হল। কিন্তু মেণ্ডেল অবাক হয়ে আবিষ্কার করলেন, সংকর হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকটি চারাই হয়ে উঠল লম্বা লক্ষণের। বেঁটে একটিও নেই।

বেঁটে লক্ষণটি কি তাহলে লোপ পেল? তারপরে তিনি সেই সংকর গাছগুলো থেকে একের সঙ্গে অপরের মিলন ঘটিয়ে সৃষ্টি



লম্বা ও বেঁটে মটরশুঁটির গাছ নিয়ে মেণ্ডেলের গবেষণার ফলাফল

করলেন আরো একদল নতুন চারা। এবারে দেখা গেল, প্রতি চারটি চারার মধ্যে তিনটি লম্বা লক্ষণের, একটি বেঁটে লক্ষণের। তার মানে, বেঁটে লক্ষণটি প্রকাশ পাচ্ছে ঠিক পরের বংশে নয়, পরের পরের বংশে। তার মানে, বাচ্চার লক্ষণগত মিল যতোটা না বাপের সঙ্গে তার চেয়েও বেশি ঠাকুর্দার সঙ্গে।

মেণ্ডেল সিদ্ধান্ত করলেন, লম্বা ও বেঁটে ছুটি লক্ষণই টিকে আছে। তবে প্রাধান্য থাকছে অবশ্য লম্বাদেরই। এত বেশি প্রাধান্য যে পরের বংশে লম্বারাই সব, বেঁটেরা কোথাও নেই। কিন্তু তাই বলে বেঁটেরা লোপ পায়নি। পরের বংশে প্রতি চারজনের মধ্যে এক-জনকেই এই লক্ষণবিশিষ্ট পাওয়া যাচ্ছে।

মেণ্ডেল আরো লক্ষ্য করলেন, ছুটি সংকর গাছের সব চারাই সংকর নয়, কয়েকটি পাওয়া যায় বিশুদ্ধ লক্ষণবিশিষ্ট। একটি নির্ভেজাল লম্বা ও একটি নির্ভেজাল বেঁটে মটরশুঁটির গাছ মিলিয়ে যে চারাগুলো পাওয়া গিয়েছিল তারা ছিল সবাই সংকর। কিন্তু ছুটি সংকর গাছ মিলিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে যে চারাগুলো পাওয়া যাবে তাদের মধ্যে অর্ধেকসংখ্যক হবে বিশুদ্ধ। ছুটি সাদা গোরুর সবকটি বাচ্চাই সাদা হয়ে থকে। ছুটি কোলো গোরুর সবকটি বাচ্চাই কালো। কিন্তু একটি সাদা ও একটি কালো গোরুর বাচ্চারা আর নির্ভেজাল সাদা বা নির্ভেজাল কালো থাকবে না। তারা হবে ফুটফুট সাদা দাগওলা কালো। কিন্তু ছুটি ফুটফুট সাদা দাগওলা গোরুর বাচ্চার মধ্যে অর্ধেকসংখ্যক পাওয়া যাবে নির্ভেজাল সাদা ও কালো।

মেণ্ডেল অবশ্যই বংশগতি সম্পর্কে সবকথা বলে যেতে পারেননি। বিজ্ঞানীরা এখনো বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করছেন। এবং, যে-কথা আগে বলেছি, আধুনিক প্রজননবিদ্যা মেণ্ডেলের গবেষণাকে ছাড়িয়ে বহুদূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছে।

প্রজননবিদ্যার গবেষণাকে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে কৃষিকার্যে ও পশুপালনে। আগে, কোন্ বীজ থেকে কী ফসল পাওয়া যাবে তার ওপরে মানুষের কোনো হাত ছিল না। গৃহপালিত পশুর

কি-ধরনের বাচ্চা হবে তার ওপরেও নয়। কিন্তু প্রজননবিদ্যা মানুষকে এমন ক্ষমতা দিয়েছে যে বিশেষ বিশেষ বীজকে অনায়াসেই বিশেষ বিশেষ লক্ষণবিশিষ্ট করে তোলা যেতে পারে। এই কারণে সাইবেরিয়ার বরফের দেশেও এখন আর গমের চাষ অসম্ভব নয়। জীববিজ্ঞানীদের ধারণা, আগামী একশো বছরের মধ্যে শুধু ফসলের ক্ষেত্রে নয়, শুধু গৃহপালিত পশুর ক্ষেত্রে নয়, এমন কি মানুষের ক্ষেত্রেও বংশগতির ব্যাপারটিকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

প্রাকৃতিক নির্বাচনের গতিপ্রকৃতি

ডারউইনের ধারণা ছিল, বিবর্তনের প্রক্রিয়াটি ঘটে থাকে খুবই আস্তে আস্তে। এত আস্তে আস্তে যে সব সময়ে টের পাওয়া যায় না। কিন্তু হালের জীববিজ্ঞানীদের হাতে যে-সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে তা থেকে বলা যেতে পারে, কথাটি সব সময়ে ঠিক নয়। খুবই সহজ একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কিছুকাল আগেও মশা মাছি ও অন্যান্য পোকামাকড়কে ডি-ডি-টি প্রয়োগে ধ্বংস করা যেত। আজকাল আর যায় না। এত অল্প সময়ের মধ্যেই মশা মাছি পোকামাকড়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় বিবিধায়নটি ঘটে গিয়েছে। তেমনি লক্ষ্য করা গিয়েছে যে নিউমোনিয়ার জীবাণু অনেক ক্ষেত্রে পেনিসিলিনকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা অর্জন করে। ইনফ্লুয়েঞ্জার জীবাণুর স্ট্রেপ্টোমাইসিনকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা।

হালের গবেষণা থেকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের আরেকটি লক্ষণ জানা গিয়েছে। প্রাকৃতিক নির্বাচন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেন্দ্রমুখী। অর্থাৎ, প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রত্যেকটি প্রজাতির স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে চেষ্টা করে। দৃষ্টান্ত দিলে বুঝতে সুবিধে হবে। লণ্ডনের একটি হাসপাতালে হিসেব নিয়ে দেখা গিয়েছে যে জন্মের সময়ে যে-সব বাচ্চার ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বা কম তাদের মধ্যে মৃত্যুর হার বেশি। কথাটি বয়স্কদের পক্ষেও সত্যি। জীবজন্তুর বেলাতেও একই ব্যাপার লক্ষ্য করা গিয়েছে। অস্বাভাবিক লক্ষণবিশিষ্টরাই

সবচেয়ে কম সময় বাঁচে।

অন্য ধরনের দৃষ্টান্তও আছে। সাধারণত দেখা যায়, সংকর উদ্ভিদ বা প্রাণীর বংশরক্ষার ক্ষমতা থাকে না। যেমন নেই খচ্চরের বা অন্যান্য আরো অনেক সংকর জীবের। প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রত্যেকটি প্রজাতিকে স্ব-স্ব সীমানায় আবদ্ধ রাখতে চায়।

এ-নিয়মের অবশ্যই ব্যতিক্রম আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গিয়েছে যে সংকর জীবের পক্ষেও বংশরক্ষা সম্ভব। এইভাবে নতুন একটি প্রজাতির সূত্রপাত হওয়াও অসম্ভব নয়। হালের গবেষণায় এ-ব্যাপারে দৃষ্টান্তও আছে। আফগানিস্তানের গমক্ষেতে একধরনের ঘাস-জাতীয় আগাছা জন্মায়। এই আগাছা ও আজকের দিনের ম্যাকারনি জাতের সংকর এমন এক বিশেষ ধরনের গম যা আফগানিস্তানে ছ-হাজার বছর আগে জন্মাত। বিবর্তন যে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা তার সপক্ষেও এটি একটি দৃষ্টান্ত।

হালের গবেষণায় বিবর্তনের প্রক্রিয়ার আরো একটি দিক জানা গিয়েছে। ব্যাঙ বা শুঁয়োপোকার মতো কোনো কোনো জীব পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠার আগে লার্ভা বা শূক অবস্থার একটি পর্যায় পার হয়। এমনও হতে পারে যে এই শূক অবস্থায় থাকতে থাকতেই কোনো জীব বংশবৃদ্ধি করছে। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন একটি জীব পাওয়া যেতে পারে। জীববিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করে দেখেছেন, পোকা-মাকড়-কীট-পতঙ্গ জাতীয় কোনো কোনো জীব শূক অবস্থাতেই বংশবৃদ্ধি করতে পারে। একটি শূক থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি, চারটি থেকে আটটি—এমনিভাবে বংশবৃদ্ধির ব্যাপারটা চলতে থাকে। এভাবে বংশবৃদ্ধি করাকে ইংরেজিতে বলে নিওটেনি (neoteny)। হালের জীববিজ্ঞানীদের ধারণা, জীবজগতের একাধিক প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে এমনি নিওটেনির ব্যাপার থেকে। এমন কি মানুষের বিবর্তনের মূলেও এমনি ধরনের একটি ব্যাপার থাকা অসম্ভব নয়।

প্রাকৃতিক নির্বাচনের এ-সমস্ত লক্ষণ ও গতিপ্রকৃতি গত একশো

বছরের আবিষ্কার, যা ডারউইনের কাছে অজ্ঞাত ছিল। এই তথ্য-গুলো যদি ডারউইনের জানা থাকত তাহলে তিনি নিশ্চয়ই অন্য ভাষায় তাঁর প্রাকৃতিক নির্বাচনের সূত্রটি বিবৃত করতেন। খুব সম্ভবত তাঁর বিবৃতিটি এই হত :

"সমস্ত প্রজাতির মধ্যেই বিবিধায়ন ঘটে। কিন্তু সমস্ত বিবিধায়ন বংশগতি লাভ করে না। প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রজাতির স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে চেষ্টা করে। বেশির ভাগ বিবিধায়ন সম্পর্কেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের আনুকূল্য নেই। অল্প কয়েকটি বিবিধায়ন সম্পর্কে আছে। যদি এই আনুকূল্য-প্রাপ্ত বিবিধায়নগুলো বংশগতি লাভ করে তাহলে নতুন প্রজাতির উদ্ভব হবে।"*

এবার তাহলে সেই চূড়ান্ত প্রশ্নের মুখোমুখি আমাদের দাঁড়াতে হচ্ছে। বিবর্তন কি-ভাবে ঘটে? প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় কি? ডারউইনের জবাব ছিল, হ্যাঁ। কারণ তাঁর ধারণা ছিল প্রত্যেকটি প্রজাতির মধ্যে নিয়তই সম্ভাব্য সকল বিবিধায়ন ঘটছে এবং কোনো একটি বিশেষ বিবিধায়ন হয়তো প্রাকৃতিক নির্বাচনের আনুকূল্য লাভ করতে পারে। কিন্তু এ-প্রশ্নের জবাবে হালের জীববিজ্ঞানীরা এমন খোলাখুলি 'হ্যাঁ' বলতে পারেননি। তাঁরা সংশয় প্রকাশ করেছেন। কারণ, হালের গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে যে প্রজাতির মধ্যে কত রকমের বিবিধায়ন ঘটছে তার ওপরে বিবর্তনের প্রক্রিয়াটি নির্ভর করে না। কারণ প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রজাতির স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে চেষ্টা করে এবং অধিকাংশ বিবিধায়নই বাতিল হয়ে যায়। কোনো একটি বিশেষ প্রজাতির মধ্যে খুব সামান্য ধরনের অল্প কয়েকটি বিবিধায়নেরই শেষ পর্যন্ত বংশগতি লাভ করা সম্ভব। কাজেই এ-অবস্থায় যদি বলা হয় যে একমাত্র প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়াতেই বিবর্তন ঘটছে

---

* অধ্যাপক জে. বি. এস. হলডেনের একটি বক্তৃতা থেকে সামান্য অদলবদল করে এই সংজ্ঞাটি নেওয়া হয়েছে।

তাহলে কথাটা হয়তো পুরোপুরি ঠিক হবে না। আবার একেবারেই বেঠিক তাও নয়। কোনো বড়ো ঘটনাই একটিমাত্র কারণে ঘটে না। সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি, বিবর্তন যে-যে কারণে ঘটেছে তার মধ্যে একটি কারণ প্রাকৃতিক নির্বাচন। হয়তো অন্যতম মুখ্য কারণ।

প্রাকৃতিক নির্বাচনের বিরুদ্ধে একটি যুক্তি এই: জীবের কোনো কোনো প্রত্যঙ্গের বিকাশ এত জটিল যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ব্যাখ্যা সেক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। যেমন, মানুষের বা পাখির চোখ। জীবের শরীরের এই যন্ত্রটি খুবই জটিল, ক্রমবিকাশের অনেকগুলো ধাপ পেরিয়ে এসে শেষ পর্যন্ত লেন্স ও রেটিনা সমেত পুরোপুরি একটি চোখ তৈরি হতে পারে। কারও কারও মতে, এ-সমস্ত ধাপের অনেকগুলোই প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মে বাতিল হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যেহেতু তা বাতিল হয়নি, অতএব প্রাকৃতিক নির্বাচন বাতিল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হালের গবেষণায় জানা গিয়েছে, অনেক সময়ে জীবের শরীরে অনেকগুলো পরিবর্তন এমনভাবে একযোগে ঘটে যে আলাদা আলাদাভাবে বিচার করলে যদিও প্রত্যেকটি পরিবর্তন জীবের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক কিন্তু সব মিলিয়ে উপকারী। প্রাকৃতিক নির্বাচন এক্ষেত্রে সামগ্রিক বিচার করে।

কোনো কোনো বিজ্ঞানীর ধারণা, বিশেষ করে মানুষের এমন কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে যা প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা চলে না। যেমন মানুষের সম্পত্তিবোধ। এক্ষেত্রেও হালের গবেষণা ভিন্ন মত পোষণ করে। জন্তুজানোয়ারের মধ্যেও সম্পত্তি-বোধ লক্ষ্য করা গিয়েছে।

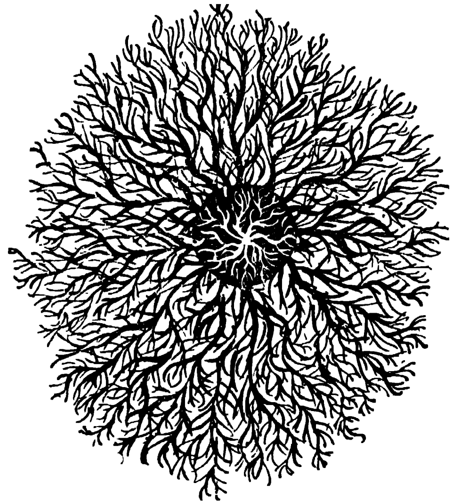
ডারউইনের বইয়ে একটি পরিচ্ছেদে প্রবৃত্তি (instinct) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবৃত্তি সম্পর্কে সবচেয়ে সহজ ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে প্রবৃত্তি হচ্ছে কতকগুলো বংশগত অভ্যাস বা ধারণা। কিন্তু ডারউইন লক্ষ্য করেছিলেন যে সামাজিকভাবে গোষ্ঠীবদ্ধ জীব পিঁপড়ে বা মৌমাছির বেলায় এই ব্যাখ্যা সঠিক নয়।

একটি কর্মী-মৌমাছি নাচের মধ্যে দিয়ে অন্যদের খাদ্যের হদিশ জানায় আর অন্যরা তাকে অনুসরণ করে। কর্মী-মৌমাছির এই প্রবৃত্তিটি নিশ্চয়ই বংশগত অভ্যাস বা ধারণা নয়, কারণ যে-পুরুষ ও স্ত্রী মৌমাছির বংশজাত এই কর্মী-মৌমাছিটি, তাদের কোনো কালে খাদ্যের সন্ধানে ডানা মেলতে হয়নি।

মেরুদণ্ডীদের দিকে তাকালে মনে হতে পারে, প্রবৃত্তিও যেন ধাপে ধাপে প্রকাশ পায়। কোনো কোনো পাখি খাঁচায় বড়ো হলেও নিজের থেকেই বৈশিষ্ট্যসূচক ডাক ডাকতে শেখে। কোনো কোনো পাখি শেখে না, তারা যা শোনে তাই শেখে, অবশ্য সবচেয়ে কম সময়ে শেখে নিজের বৈশিষ্ট্যসূচক ডাক। এই দু-ধাপের পাখিদের দেখে বোঝা যায়, প্রবৃত্তিরও ক্রমবিকাশ আছে। গোড়ার অবস্থায় যা দেখে বা শুনে শেখা পরে তাই প্রবৃত্তি।

কেউ কেউ ডারউইনবাদের বিরুদ্ধে এই বলে সমালোচনা করেছেন এই মতবাদে বিবর্তনের যে-ছবি পাওয়া যাচ্ছে তা একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া মাত্র, সেখানে মনের কোনো স্থান নেই। এই সমালোচনা ঠিক নয়। বিবর্তনের ব্যাপারে মানসিক উদ্যোগের ভূমিকা ডারউইনবাদে স্বীকৃত। যেমন, ডানাওলা জীবদের উড়তে শেখার ব্যাপারটি। ডানাওলা জীবদের পক্ষে এই উৎকর্ষ আয়ত্ত করার জন্যে গোড়ার দিকে অনেকখানি মানসিক উদ্যোগের প্রয়োজন ছিল। প্রাকৃতির নির্বাচন এই উদ্যোগের সহায়ক হয়েছে। মানসিক উদ্যোগ ও প্রাকৃতিক নির্বাচন—এ দুটো ব্যাপার পরস্পর-বিরোধী নয়। বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্যে একটি উপমা দেওয়া যেতে পারে।

মানুষের চিন্তা বুঝতে হলে ভাষা জানা চাই। ভাষা জানতে হলে ব্যাকরণ জানা চাই। ভাষা ও ব্যাকরণ—দুই-ই বাস্তব ব্যাপার আর দুই ব্যাপারকেই পুরোপুরি বর্ণনা করা চলে। প্রাকৃতিক নির্বাচনও তেমনি একটি বাস্তব ব্যাপার আর এই ব্যাপারটিরও পুরোপুরি বর্ণনা সম্ভব। কিন্তু চিন্তাকে যেমন বর্ণনা করা যায় না, তেমনি বর্ণনা করা যায় না বিবর্তনকে।



প্রাণের উৎস সন্ধানে

প্রাণের রহস্য সুগভীর
অন্তরগুহায় ছিল স্থির,
সে আজ বাহির হল দেহ লয়ে উন্মুক্ত আলোতে
অন্ধকার হতে

সকল জৈব পদার্থের একটি অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে কার্বন। প্রাণের উৎস সন্ধানে এই কার্বনের দিকেই আমাদের বিশেষ করে নজর রাখতে হবে।

পদার্থটি খুবই মিশুক প্রকৃতির। একলা থাকাটা একেবারেই অপছন্দ। যদি অপর কোনো পদার্থকে নাগালের মধ্যে না পায় তাহলে কার্বনের পরমাণুগুলো একে অপরের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে সারি বাঁধতে শুরু করে। আর যদি হাইড্রোজেনকে নাগালের মধ্যে পায় তাহলে কার্বন ও হাইড্রোজেনের সহযোগে তৈরি হতে পারে অন্তত ২৩০০ বিভিন্ন রকমের পদার্থ। রসায়নবিদরা প্রমাণ পেয়েছেন, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পদার্থ তৈরি হয়ে থাকে এই কার্বন সহযোগেই।

প্রাণের উৎপত্তির মূলে রয়েছে কার্বনের এই অতি-মিশুক প্রকৃতির

অবদান। কার্বন-ঘটিত পদার্থ আর তার ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সেই পদার্থগুলো এমন কতকগুলো গুণ অর্জন করেছিল যা একমাত্র জীবন্ত প্রাণীর মধ্যেই থাকা সম্ভব। আমরা এবারে এই কাহিনীটিকেই ধাপে ধাপে অনুসরণ করতে চেষ্টা করব।

পরমাণুর আকার

পরমাণুর মধ্যে আছে তিন ধরনের অতি ক্ষুদ্র কণিকা—প্রোটোন (proton), নিউট্রন (neutron) ও ইলেকট্রন (electron)। প্রোটোন ও নিউট্রন কণিকাগুলো জড়ো হয়ে থাকে পরমাণুর কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রটিকে বলা হয় নিউক্লিয়স। ইলেকট্রনগুলো থাকে নিউক্লিয়সকে ঘিরে। স্থির হয়ে নয়, অনবরত নিউক্লিয়সের চারদিকে পাক খেয়ে—সূর্যের চারদিকে গ্রহের পাক খাওয়ার মতো।

ইলেকট্রন ও প্রোটোন কণিকাগুলো বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ নয়। ইলেকট্রনে আছে নেগেটিভ বৈদ্যুতিক চার্জ, প্রোটোনে পজিটিভ বৈদ্যুতিক চার্জ। এই দুটিকে বাদ দিলে পরমাণুর মধ্যে তৃতীয় যে পদার্থটি রয়েছে, অর্থাৎ নিউট্রন, তা বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ। ইলেকট্রনের নেগেটিভ চার্জ আর প্রোটোনের পজিটিভ চার্জ ঠিক সমান মাত্রার।

আমরা বলেছি, প্রোটোনের স্থান নিউক্লিয়সে। এই কারণে নিউক্লিয়সটি হয়ে ওঠে পজিটিভ বৈদ্যুতিক চার্জ বিশিষ্ট। স্বাভাবিক নিয়মেই পজিটিভ বৈদ্যুতিক চার্জ বিশিষ্ট নিউক্লিয়স আকর্ষণ করে নেগেটিভ চার্জ বিশিষ্ট ইলেকট্রনকে। আকর্ষণের এই ক্ষেত্রটি তৈরি হয় বলেই ইলেকট্রন নিউক্লিয়সের চারদিকে পাক খায়। নিউক্লিয়সে যতো সংখ্যক প্রোটোন থাকে, ঠিক ততো সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে নিউক্লিয়সটিকে ঘিরে। ফলে, প্রোটোনের পজিটিভ চার্জ ইলেকট্রনের নেগেটিভ চার্জের সঙ্গে কাটাকুটি হয়ে গিয়ে পরমাণুটি হয়ে ওঠে বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ।

ইলেকট্রনের খোলক

ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়সকে ঘিরে থাকে পৃথক পৃথক খোলকে (shells)। ভেতর থেকে বাইরের দিকে এই খোলকগুলো সাজানো থাকে অনেকটা পেঁয়াজের খোসার মতো। একেবারে ভেতরের দিকে রয়েছে যে খোলকটি তাতে জায়গা হতে পারে তুটি ইলেকট্রনের। এটি প্রথম খোলক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খোলকের প্রত্যেকটিতে জায়গা হতে পারে আটটি করে ইলেকট্রনের।

প্রোটোনের সংখ্যা সমস্ত মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে সমান নয়। কোনোটিতে একটি, কোনোটিতে তুটি, কোনোটিতে তিনটি। পদার্থ থেকে পদার্থে প্রোটোনের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে বেড়ে চলে। আর প্রত্যেকটি পদার্থে ঠিক যতো সংখ্যক প্রোটোন আছে, ঠিক ততো সংখ্যক ইলেকট্রন থাকতেই হবে।

হাইড্রোজেন (H) পরমাণুর নিউক্লিয়সে আছে একটি প্রোটোন। সেই সঙ্গে একটি ইলেকট্রন আছে তার প্রথম খোলকটিতে। হিলিয়াম (He) পরমাণুর নিউক্লিয়সে আছে তুটি প্রোটোন। সেই সঙ্গে তুটি ইলেকট্রন তার প্রথম খোলকটিতে। লিথিয়াম (Li) পরমাণুর নিউক্লিয়সে আছে তিনটি প্রোটোন। কাজেই ইলেকট্রনও অবশ্যই তিনটি। কিন্তু প্রথম খোলকটিতে তুটির বেশি ইলেকট্রনের জায়গা হওয়া সম্ভব নয়। এই কারণে লিথিয়ামের পরমাণুতে একটি ইলেকট্রন থাকে দ্বিতীয় খোলকে। এই দ্বিতীয় খোলকে জায়গা হতে পারে আটটি পর্যন্ত ইলেকট্রনের। তারপরে তৃতীয় খোলক। সেখানেও আটটি পর্যন্ত ইলেকট্রন। এমনিভাবে ব্যাপারটা চলতে থাকে।

নিচের ছক থেকে প্রথম আঠারোটি মৌলিক পদার্থের পরমাণুর গড়ন সম্পর্কে ধারণা করা যাবে।

মৌলিক পদার্থ	প্রতীক	ইলেকট্রনের মোট সংখ্যা	ইলেকট্রনের সংখ্যা প্রথম খোলকে	দ্বিতীয় খোলকে	তৃতীয় খোলকে
হাইড্রোজেন	H	১	১		
হিলিয়াম	He	২	২		
লিথিয়াম	Li	৩	২	১	
বেরিলিয়াম	Be	৪	২	২	
বোরোন	B	৫	২	৩	
কার্বন	C	৬	২	৪	
নাইট্রোজেন	N	৭	২	৫	
অক্সিজেন	O	৮	২	৬	
ফ্লোরিন	F	৯	২	৭	
নিয়ন	Ne	১০	২	৮	
সোডিয়াম	Na	১১	২	৮	১
ম্যাগ্নেসিয়াম	Mg	১২	২	৮	২
অ্যালুমিনাম	Al	১৩	২	৮	৩
সিলিকন	Si	১৪	২	৮	৪
ফস্ফরাস	P	১৫	২	৮	৫
সালফার	S	১৬	২	৮	৬
ক্লোরিন	Cl	১৭	২	৮	৭
আর্গন	A	১৮	২	৮	৮

রাসায়নিক ক্রিয়া

রাসায়নিক দিক থেকে পরমাণু কতখানি সক্রিয় হতে পারবে তা প্রধানত নির্ভর করে পরমাণুর সবচেয়ে বাইরের দিকের খোলকে কত সংখ্যক ইলেকট্রন আছে তার ওপরে। যদি দেখা যায়, এই খোলকে যতো সংখ্যক ইলেকট্রনের জায়গা হওয়া সম্ভব, ইলেকট্রন আছে তার চেয়েও কম, তাহলে পরমাণুটির রাসায়নিক সক্রিয়তা থাকবে।

যদি দেখা যায়, পরমাণুর সবচেয়ে বাইরের খোলকে যতো সংখ্যক ইলেকট্রনের জায়গা হওয়া সম্ভব, ইলেকট্রন আছে ঠিক ততো সংখ্যকই, তাহলে পরমাণুটি হবে রাসায়নিক দিক থেকে নিষ্ক্রিয়। পাশের ছকে দেখা যাবে, আর্গন একটি নিষ্ক্রিয় পদার্থ, কারণ আর্গনের সবচেয়ে বাইরের দিকের তৃতীয় খোলকে ইলেকট্রন থাকা সম্ভব আটটি—আছেও আটটি। একই কারণে নিয়ন ও হিলিয়ামও নিষ্ক্রিয় পদার্থ।

পাশের ছকে যে আঠারোটি পদার্থের নাম বলা হয়েছে তাদের মধ্যে বাকি পনেরোটিই সক্রিয়। কারণ এই পনেরোটি পদার্থের পরমাণুতেই সবচেয়ে বাইরের দিকের খোলকে ইলেকট্রন আছে প্রয়োজনের চেয়ে কম। এই পরমাণুগুলো যখন অন্য কোনো পরমাণুর সংস্পর্শে আসে তখন দু-ধরনের ব্যাপার ঘটতে পারে। হয় এই পরমাণু অন্য পরমাণু থেকে কিছু সংখ্যক ইলেকট্রন টেনে নিয়ে বাইরের দিকের ঘাটতি পূরণ করবে, কিংবা, কিছু সংখ্যক ইলেকট্রনকে ছেড়ে দিয়ে বাইরের দিকের খোলকের ঘাটতির ব্যাপারটাকেই মুছে দেবে। পাশের ছকে দেখা যাবে, লিথিয়াম বেরিলিয়াম ও বোরোনের বাইরের দিকের খোলকে ইলেকট্রন আছে যথাক্রমে একটি দুটি ও তিনটি। অথচ প্রয়োজন আটটির। এক্ষেত্রে ঘাটতি পূরণ করার চেয়ে ঘাটতিকে মুছে দেওয়াটাই অপেক্ষাকৃত সহজ। এই কারণে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটবার সময়ে এই তিনটি পদার্থ সাধারণত একটি দুটি ও তিনটি করে ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে থাকে। কিন্তু নাইট্রোজেন অক্সিজেন ও ফ্লোরিনের বেলায় দেখা যাচ্ছে, ঘাটতি পূরণ হবার জন্যে প্রয়োজন যথাক্রমে তিনটি দুটি ও একটি ইলেকট্রনের। এই কারণে এক্ষেত্রে ঘাটতি পূরণ হওয়াটাই অপেক্ষাকৃত সহজ। রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটবার সময়ে এই তিনটি পদার্থের পরমাণু ইলেকট্রন টেনে নেয়। রসায়নবিদরা ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়ার দলের পদার্থগুলোকে বলে থাকেন ইলেকট্রোপজিটিভ, আর ইলেকট্রন টেনে নেওয়ার দলের পদার্থগুলোকে ইলেকট্রোনেগেটিভ। প্রথম দলের

বাইরের দিকের খোলকে ইলেকট্রন থাকে প্রয়োজনের অর্ধেকের চেয়েও কম। দ্বিতীয় দলে অর্ধেকের বেশি।
কিন্তু কার্বনের বেলাতে দেখা যাচ্ছে, এই পদার্থটি কড়াকড়িভাবে কোনো দলেই পড়ছে না। এই পদার্থটির বাইরের দিকের খোলকে রয়েছে চারটি ইলেকট্রন। ঘাটতি পূরণ করতে হলেও চারটি টেনে নেওয়া দরকার, ঘাটতি মুছে দিতে হলেও চারটি ছেড়ে দেওয়া দরকার। কার্বনের এই বিশেষত্বের জন্যেই কার্বনের চালচলনও বিশেষ রকমের। এ-বিষয়ে একটু পরেই আমরা আলোচনা তুলব।

পরমাণুর বন্ধন

সোডিয়াম পরমাণুর বাইরের দিকের খোলকে আছে একটিমাত্র ইলেকট্রন। কাজেই অন্য পরমাণুর সংস্পর্শে এলে সোডিয়াম পরমাণু সহজেই এই ইলেকট্রনটি ত্যাগ করে। অন্যদিকে ক্লোরিনের পরমাণুর বাইরের দিকের খোলকে আছে সাতটি ইলেকট্রন—অর্থাৎ, একটি কম। কাজেই এই পরমাণুটি সব সময়েই একটি ইলেকট্রন টেনে নেবার চেষ্টা করে। তাহলে সোডিয়ামের একটি পরমাণু আর ক্লোরিনের একটি পরমাণু যদি পরস্পরের সংস্পর্শে আসে তাহলে সোডিয়াম পরমাণুর একটি ইলেকট্রন খোয়া যায়, ক্লোরিন পরমাণুর একটি ইলেকট্রন লাভ হয়। এমনিতে একটি পরমাণুর প্রোটোনের পজিটিভ চার্জ আর ইলেকট্রনের নেগেটিভ চার্জ সমান মাত্রার হয়ে থাকে। কিন্তু যেহেতু সোডিয়ামের একটি ইলেকট্রন খোয়া যাচ্ছে, অতএব সোডিয়াম পরমাণুটি হয়ে ওঠে বৈদ্যুতিক চার্জের দিক থেকে পজিটিভ। অন্যদিকে, যেহেতু ক্লোরিনের একটি ইলেকট্রন লাভ হচ্ছে, অতএব ক্লোরিন পরমাণুটি হয়ে ওঠে বৈদ্যুতিক চার্জের দিক থেকে নেগেটিভ। এমনি ভাবে ইলেকট্রন খুইয়ে বা ইলেকট্রন লাভ করে পরমাণুর যে বৈদ্যুতিক চার্জ বিশিষ্ট অবস্থাটি পাওয়া যায় তাকে বলা হয় আয়ন (ion)। এক্ষেত্রে সোডিয়াম আয়ন ও ক্লোরিন আয়ন। প্রথমটি পজিটিভ, দ্বিতীয়টি নেগেটিভ। আমরা জানি,

পজিটিভ চার্জ ও নেগেটিভ চার্জ পরস্পরকে আকর্ষণ করে থাকে। এই আকর্ষণেই সোডিয়াম ও ক্লোরিন আয়নদুটি মিলিত হয়ে তৈরি হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণ।

পরমাণুর বন্ধন সবসময়ে এমনিধারা না হয়ে অন্য ধরনেরও হতে পারে। হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুকে দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যাক। এই পরমাণুতে আছে একটিমাত্র ইলেকট্রন (প্রথম খোলকে)। আমরা জানি, প্রথম খোলকে জায়গা হতে পারে দুটি ইলেকট্রনের। এই ঘাটতি পূরণের জন্যে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু অপর একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে সম্পর্ক পাতালেও আপত্তি করার কিছু নেই। আর এই সম্পর্ক এমনই গভীর হয়ে ওঠে যে দুই পরমাণুর মোট দুটি ইলেকট্রনের সাহায্যে প্রত্যেকটি পরমাণু আপন আপন খোলককে পূর্ণাঙ্গ করে তোলে। অর্থাৎ, ব্যাপারটা যেন দাঁড়াল এই যে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু আপোসে নিজেদের ইলেকট্রনের সম্পদকে মিলিয়ে দিচ্ছে, তারপরে সেই মিলিত ভাণ্ডারের ওপরে প্রত্যেকেই অধিকার কায়েম করছে। এমনিভাবে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু মিলিত হয়ে তৈরি করে হাইড্রোজেন গ্যাসের একটি অণু।

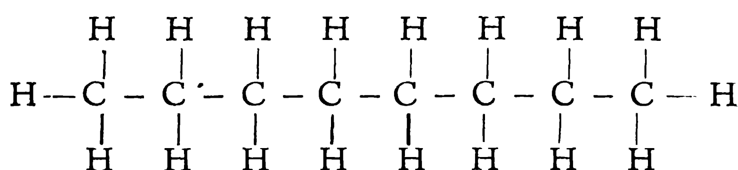
অক্‌সিজেনের বেলায় দেখা যাচ্ছে, সবচেয়ে বাইরে রয়েছে দ্বিতীয় খোলকটি আর এই খোলকে ইলেকট্রনের সংখ্যা ছয়। অর্থাৎ, দুটি কম। এক্ষেত্রেও ঘাটতি পূরণের জন্যে দুটি অক্‌সিজেন পরমাণুর মধ্যে সম্পর্ক হতে পারে। আমাদের হাতে আছে ছ-টি ইলেকট্রন। এই ছ-টির মধ্যে চারটি যেমন আছে থাকুক, অন্য দুটি যাক মিলিত ভাণ্ডারে। একটি থেকে দুটি, অপরটি থেকে দুটি—দুটি দুটি চারটি। হাতের চার আর এই মিলিত ভাণ্ডারের চার—দুয়ে মিলে আট। এমনিভাবে দুটি অক্‌সিজেন পরমাণু মিলিত হবার পরে প্রত্যেকেরই বাইরের দিকের খোলকটি পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে আর আমরা পাই অক্‌সিজেন গ্যাসের একটি অণু। দুই বা ততোধিক পরমাণুর এমনি ধরনের মিলনকে রসায়নবিদরা অনেক সময়ে একটি বিন্যাসগত সূত্রে উপস্থিত করতে চেষ্টা করেন। এই সূত্রে মিলিত ভাণ্ডারের প্রত্যেক

জোড়া ইলেকট্রনকে বোঝানো হয়ে থাকে একটি দাগ টেনে। যেমন, আমরা বলেছি, দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু মিলিত হয়ে হাইড্রোজেন গ্যাসের একটি অণু। তার মানে, হাইড্রোজেন গ্যাসের আণবিক সূত্রটি দাঁড়াচ্ছে H_2; অন্যদিকে, যেহেতু দুটি ইলেকট্রনে মিলিত ভাণ্ডার, অতএব বিন্যাসগত সূত্রটি হবে $H-H$। এমনিভাবে অক্সিজেনের আণবিক সূত্র O_2, বিন্যাসগত সূত্র $O=O$। জলের আণবিক সূত্র H_2O, বিন্যাসগত সূত্র $H-O-H$।

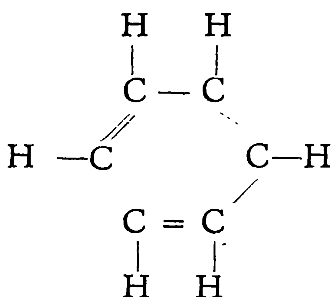
সারি ও চক্র

প্রাণের উৎস সন্ধানে আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম কার্বন নিয়ে। সেই আলোচনাতেই ফিরে আসা যাক।

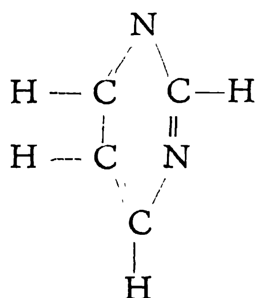
কার্বন পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে কখনো কখনো সারি বেঁধে, কখনো কখনো চক্রাকারে। যেমন:



(অকটেন)



(বেনজিন)

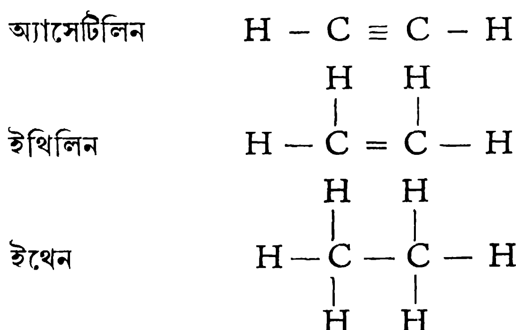


(পাইরিমিডিন)

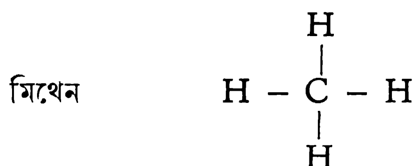
একেবারে শেষ সূত্রটিতে দেখা যাচ্ছে, চক্রের মধ্যে কার্বন ছাড়াও নাইট্রোজেন এসে গিয়েছে। আবার, অনেক সময়ে একটি চক্রের সঙ্গে অপর একটি চক্র যুক্ত হতেও কোনো বাধা নেই। জটিলতর জৈব পদার্থে তাই হয়ে থাকে।

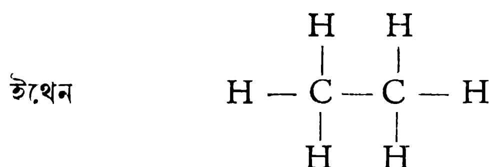
হাইড্রোকার্বন

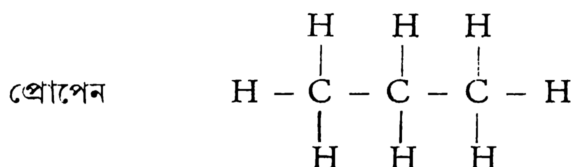
ওপরের সূত্রে অক্টেন ও বেনজিনের বেলায় দেখা যাচ্ছে, কার্বন ও হাইড্রোজেন ছাড়া তৃতীয় কোনো মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব নেই। এমনি পদার্থ আরো অজস্র আছে যা শুধু কার্বন ও হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে তৈরী। এই পদার্থগুলোকে বলা হয় হাইড্রো-কার্বন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

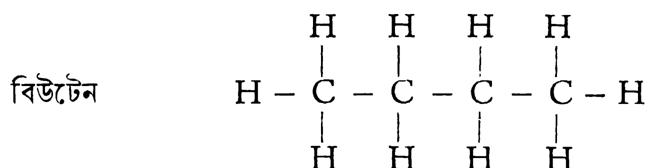


লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে বিন্যাসগত গড়নের দিক থেকে সব চেয়ে সরল হচ্ছে ইথেন। এই পদার্থটি বিশেষ একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, যার নাম প্যারাফিন। এই গোষ্ঠীর একেবারে গোড়ায় রয়েছে মিথেন, তারপরে ধাপে ধাপে ইথেন, প্রোপেন, বিউটেন, ইত্যাদি। মিথেনে আছে একটি কার্বন পরমাণু, ইথেনে ছুটি, প্রেপেনে তিনটি, বিউটেনে চারটি। ইতিপূর্বে উল্লিখিত অক্টেনে আছে আটটি। সূত্রের চেহারায় উপস্থিত করলে বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা আরো স্পষ্ট হবে।









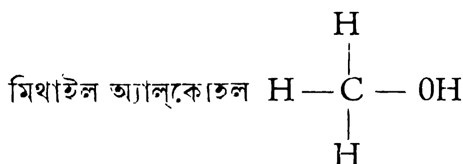
প্যারাফিন গোষ্ঠীর এই পদার্থগুলোকে পাওয়া যায় পেট্রোলিয়ামে। এগুলো হচ্ছে সরলতম জৈব পদার্থ।

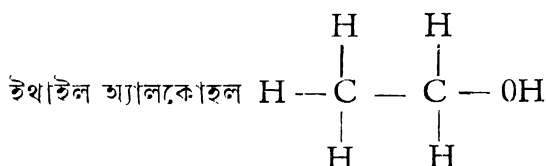
অ্যালকোহল ও অন্যান্য

প্যারাফিন গোষ্ঠীর এই সরলতম জৈব পদার্থে নানা ধরনের জটিলতা আসতে পারে। ফলে তৈরি হতে পারে নানা ধরনের জৈব পদার্থ। দু-একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক।

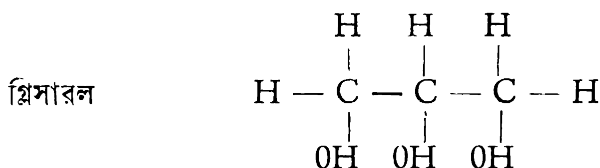
আমরা দেখেছি, মিথেনের বিন্যাসগত চেহারায় বিন্দুমাত্র জটিলতা নেই। মধ্যিখানে একটি কার্বন পরমাণুর চারটি বাহুতে চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু—এই হচ্ছে মিথেন। কিন্তু এমনও হতে

পারে, একটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে সরিয়ে দিয়ে সে-জায়গাটিতে জুড়ে বসেছে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ OH।* তাহলে যে পদার্থটি পাওয়া যাচ্ছে তারই নাম অ্যাল্কোহল। বিন্যাসগত সূত্রে এই রকম :





এমনও হতে পারে, একটি নয় একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণুকে হটিয়ে দিয়ে তাদের জায়গা জুড়ে বসেছে 0H। এমনি একটি পদার্থ গ্লিসারল। বিন্যাসগত সূত্রটি এই রকম :



* জলের (H_2O) একটি অণুতে থাকে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণু। কখনো কখনো এমন ব্যাপার ঘটে থাকে যে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে একটির ইলেকট্রন খোয়া যায়। আর এই বিশেষ হাইড্রোজেন পরমাণুটি বাদ দিলে জলের অণুর বাকি যে অংশটি থাকে— অর্থাৎ **OH**—তারই সঙ্গে যুক্ত হয় এই ইলেকট্রনটি। এই **OH**কেই বলা হয়ে থাকে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ।

আবার, এমনও হতে পারে, হাইড্রোজনের জায়গা জুড়ে বসেছে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ 0H নয়, অ্যামিনো গ্রুপ NH_2। ফলে যে নতুন পদার্থ পাওয়া যায় তার নাম অ্যামাইন।
কিংবা, এমনও হতে পারে, হাইড্রোজেনের জায়গা জুড়ে বসেছে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ 0H নয়, অ্যামিনো গ্রুপ NH_2 নয়, কার্বক্সিল গ্রুপ C00H। এক্ষেত্রে পাওয়া যাবে ফ্যাটি অ্যাসিড।
এমনি সামান্য হেরফেরেই পাওয়া যেতে পারে অ্যাল্‌ডিহাইড ও আরো নানা জটিল জৈব পদার্থ।

প্রকৃতির রসায়নাগার

দুশো কোটি বছর আগে পৃথিবীর আদিম সমুদ্রে এমনি নানা প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠেছিল নানা সরল ও জটিল পদার্থ। আমরা জানি অধিকাংশ পদার্থ জলে দ্রবীভূত হয়। বৃষ্টির জল বাতাসের ও মাটির বহু পদার্থকে এমনি দ্রবীভূত অবস্থায় সমুদ্রে হাজির করে। সমুদ্র হচ্ছে প্রকৃতির রসায়নাগারে বিরাট একটি টেস্ট টিউব। সারা পৃথিবীর রাসায়নিক পদার্থগুলো এই টেস্ট টিউবে সংগৃহীত হয়ে চলে ও নানা বিচিত্র রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অসংখ্য রূপে প্রকাশ পেতে থাকে। এমনি অজস্র রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই প্রকৃতির রসায়নাগারের এই বিরাট টেস্ট টিউবে আজ থেকে দুশো কোটি বছর আগে পৃথিবীর প্রথমতম প্রাণের উদ্ভব।
সমস্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়, কয়েকটির হদিশ মাত্র জানবার চেষ্টা করা যাক।
কোনো একটি অ্যাসিড ও কোনো একটি ক্ষারক (base) দ্রবীভূত অবস্থায় পরস্পরের সম্মুখীন হলে সব সময়েই বিশেষ একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে থাকে। অ্যাসিডের হাইড্রোজেন আয়ন আর ক্ষারকের হাইড্রোক্সিল আয়ন যুক্ত হয়ে তৈরি হয় জল আর অন্য দুটি আয়ন যুক্ত হয়ে তৈরি হয় লবণ। যেমন, অ্যাসিডটি যদি হয় হাইড্রোক্লোরিক আর ক্ষারকটি যদি হয় সোডিয়াম

হাইড্রোক্সাইড—তাহলে শেষ পর্যন্ত জলে দ্রবীভূত অবস্থায় যে লবণটি পাওয়া যায় তার নাম সোডিয়াম ক্লোরাইড।

আরো একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটতে পারে কার্বন পরমাণু ও ধাতুর পরমাণুর মধ্যে। এই দুটি পরমাণু যুক্ত হলে যে পদার্থটি পাওয়া যায় তার নাম কার্বাইড (carbide)। পৃথিবীর নবীন অবস্থায় লৌহ নিকেল কোবাল্ট ইত্যাদি ধাতু গলিত অবস্থায় এসে জড়ো হচ্ছিল পৃথিবীর অভ্যন্তরে কেন্দ্রের কাছে। তার সঙ্গে ছিল কার্বন। ফলে কার্বনের সঙ্গে ধাতুর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়েছিল কার্বাইড। তারপরে এই কার্বাইডের একটি অণু যদি কোনোক্রমে জলের একটি অণুর সংস্পর্শে আসে তাহলে দুই অণুর মধ্যেকার পরমাণুগুলো অনায়াসেই সঙ্গী বদল করে বসে। কার্বাইডের কার্বন যুক্ত হয় জলের হাইড্রোজেনের সঙ্গে। এইভাবে কার্বন ও হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে যে পদার্থটি পাওয়া যায় তার নাম হাইড্রোকার্বন। একটি পরিচিত দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে। ক্যালসিয়াম কার্বাইড ও জলের রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটলে ক্যালসিয়াম কার্বাইডের কার্বন যুক্ত হয় জলের হাইড্রোজেনের সঙ্গে আর তার ফলে যে হাইড্রোকার্বনটি তৈরি হয় তার নাম অ্যাসেটিলিন ($C_2 H_2$)। কলকাতার রাস্তায় হকাররা যে গ্যাস-বাতি ব্যবহার করে থাকে তার শিখাটি এই অ্যাসেটিলিন গ্যাস জ্বালিয়ে। এই গ্যাসটি তৈরি করবার জন্যে গ্যাস-বাতির ফুটো দিয়ে কারবাইডে জল ঢালতে হয়।

সেই নবীন পৃথিবীতে অভ্যন্তরের কার্বাইড অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে অনবরত বাইরে বেরিয়ে আসছিল। বাইরের বাতাসে ছিল জল। সেই জল আর কার্বাইডের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি হচ্ছিল হাইড্রোকার্বন। তারপর বৃষ্টির জলের সঙ্গে সেই হাইড্রোকার্বন গিয়ে হাজির হচ্ছিল সমুদ্রে। নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সেই হাইড্রোকার্বন ক্রমে সরল থেকে জটিল হয়ে উঠেছিল। এমনি ভাবে পৃথিবীর সেই নবীন সমুদ্রে তৈরি হয়েছিল প্রাণের উদ্ভব

হবার মতো অবস্থাটি।

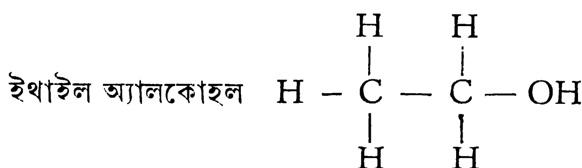
অন্যদিকে উচ্চ তাপমাত্রায় কার্বাইডের সঙ্গে নাইট্রোজেনের রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটাও অসম্ভব নয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে নাইট্রোজেন-ঘটিত যে পদার্থ পাওয়া যায় তার নাম সায়ানামাইড (cyanamides)। পৃথিবীর সেই নবীন অবস্থায়, যখন অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে কার্বাইড নিঃসৃত হচ্ছিল, তখন সেই কার্বাইড ও নাইট্রোজেনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠে অবশ্যই তৈরি হয়েছিল সায়ানামাইড। আর তারপরে ভূপৃষ্ঠের এই সায়ানামাইডের সঙ্গে জলের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়েছিল অ্যামোনিয়া। বিষয়টি খুবই জরুরি, কারণ প্রাণের উদ্ভব হবার জন্যে আগে থেকেই একটি অ্যামোনিয়ার ভাণ্ডার মজুদ থাকার প্রয়োজন ছিল। কারণ, এই অ্যামোনিয়া থেকেই তৈরি হতে পারত অ্যামিনো অ্যাসিড, আর অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে প্রাণের অপরিহার্য উপাদান প্রোটিন।

তবে এতক্ষণের আলোচনা থেকে একথাটি নিশ্চয়ই বুঝতে পারা গিয়েছে যে প্রাণের উদ্ভবের জন্যে সবচেয়ে অপরিহার্য যে উপাদানটির প্রয়োজন ছিল তা হচ্ছে জল। এতক্ষণ অন্য যে-সব উপাদানের নাম করা হয়েছে—যেমন হাইড্রোকার্বন বা অ্যামোনিয়া বা প্রোটিন—জল না থাকলে কোনোটাই পাওয়া যেত না। পৃথিবীর নবীন অবস্থায় যখন প্রথম বৃষ্টি পড়েছিল, সেই বৃষ্টির জল অজস্র জৈব পদার্থকে বহন করে নিয়ে এসেছিল সমুদ্রে। তারপরে পৃথিবীর সেই আদিম সমুদ্রের উষ্ণ জলে ঘটতে পেরেছিল নানা ধরনের রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া। তৈরি হয়েছিল অতি সরল হাইড্রোকার্বন থেকে শুরু করে অ্যালকোহল অ্যাল্ডিহাইড ও আরো অজস্র জটিল জৈব পদার্থ। সেই আদিম সমুদ্রের জলে অ্যামোনিয়াও ছিল। অ্যামোনিয়া থেকে পাওয়া গিয়েছিল অ্যামাইন ও অ্যামাইড়। তারপরে ঘটে চলেছিল আরো নানা ধরনের রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু যুক্ত হয়ে তৈরি হচ্ছিল বৃহৎ বৃহৎ অণু। বৃহৎ বৃহৎ অণু ভেঙে গিয়ে তৈরি হচ্ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু। এমনি ভাবে পৃথিবীর আদিম সমুদ্রটি হয়ে

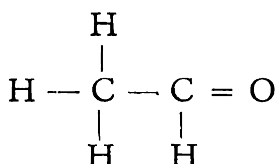
উঠেছিল সরলতম থেকে জটিলতম পর্যন্ত অজস্র জৈব পদার্থের ভাণ্ডার। আর এই ভাণ্ডারটি তৈরি হয়েছিল বলেই পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব।

শর্করা ও শ্বেতসার

প্রথমে ইথাইল অ্যালকোহলের কাঠামোটি আরেকবার স্মরণ করতে হবে। তা এই :

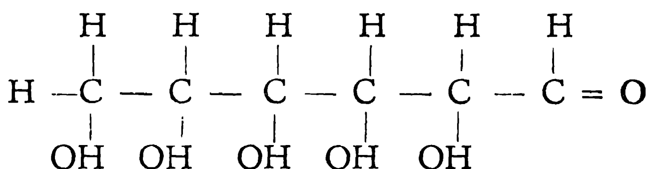


শেষ কার্বন পরমাণুটির সঙ্গে যুক্ত আছে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি OH গ্রুপ। এবারে যদি একটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও OH গ্রুপটিকে হটিয়ে দিয়ে জোড়া বন্ধনের মধ্যে একটি অক্সিজেন পরমাণুকে হাজির করা যায় তাহলে চেহারাটি দাঁড়াবে এই রকম :



এমনি ব্যাপার ঘটলে যে পদার্থটি পাওয়া যায় তার নাম দেওয়া হয়েছে অ্যালডিহাইড। ইথাইল অ্যালকোহল থেকে যে বিশেষ অ্যাল্‌ডিহাইডটি পাওয়া যাচ্ছে তার নাম অ্যাসিটাল্‌ডিহাইড।
লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে অ্যালকোহলের OH গ্রুপটি অ্যাল-ডিহাইডে CO গ্রুপে রূপান্তরিত হচ্ছে।
কিন্তু কোনো কোনো পদার্থে দুটি গ্রুপই থেকে যায়। এ-ধরনের

পদার্থের সবচেয়ে পরিচিত দৃষ্টান্ত হচ্ছে গ্লুকোজ। গ্লুকোজের আণবিক কাঠামোটি এই রকম :

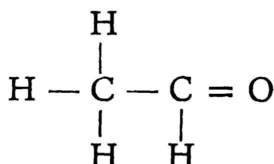


এই পদার্থটি একাধারে অ্যালকোহল ও অ্যালডিহাইড। অ্যাল-কোহল—যেহেতু OH গ্রুপ পাওয়া যাচ্ছে। অ্যালডিহাইড—যেহেতু CO গ্রুপ পাওয়া যাচ্ছে। এই পদার্থটিকে বলা হয় শর্করা বা শুগার।

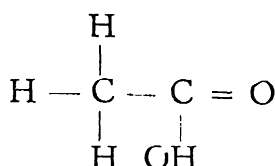
তবে সব শর্করাই গ্লুকোজের মতো সরল নয়। জটিলও হয়ে থাকে। সরল শর্করা থেকেই নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জটিলটিকে পাওয়া যেতে পারে। আঙুর বা গ্লুকোজ যেমন সরল শর্করার দৃষ্টান্ত, আখ তেমনি জটিল শর্করার দৃষ্টান্ত। সরল শর্করা থেকে আরো দুটি পদার্থ তৈরি হতে পারে—স্টার্চ বা শ্বেতসার ও সেলুলোজ। তুলো ও কাঠ সেলুলোজের দৃষ্টান্ত। কাজেই সেলুলোজ থেকেও সরল শর্করাকে উদ্ধার করা অসম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু প্রক্রিয়াটি এখনো পর্যন্ত খুবই জটিল ও ব্যয়সাধ্য। রসায়নবিদরা যদি সহজ কোনো উপায়ে এই উদ্ধারকার্যটিকে সমাধা করতে পারেন তাহলে ভবিষ্যতে কাঠ থেকেই চিনি তৈরি হতে পারবে।

অ্যামিনো অ্যাসিড

প্রথমে একটি অ্যালডিহাইডের কাঠামোকে চোখের সামনে রাখা যাক :

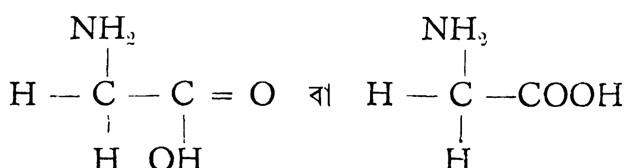


এবারে যদি শেষ কার্বন পরমাণুটির সঙ্গে যুক্ত হাইড্রোজেন পরমাণুটির জায়গায় OH গ্রুপ বসে তাহলে কাঠামোটি হবে এই রকম :



এক্ষেত্রে শেষ কার্বন পরমাণুটি O এবং OH এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তৈরি করছে কার্বক্সিল গ্রুপ COOH। যে পদার্থের অণুর মধ্যে এই কার্বক্সিল গ্রুপটিকে পাওয়া যায় তার নাম দেওয়া হয়েছে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড।

এবারে যদি এই কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের অন্য একটি কার্বন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর জায়গা জুড়ে বসে অ্যামিনো গ্রুপ NH_2—তাহলে যে পদার্থটি পাওয়া যাবে তার কাঠামোটি হবে এই রকম :



এই পদার্থটিই অ্যামিনো অ্যাসিড। বলা বাহুল্য, অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায় নানা ধরনের। কোনো কোনোটির কাঠামো খুবই জটিল। তবে যতো জটিলই হোক, অ্যামিনো অ্যাসিডের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হবে এই যে একই কার্বন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত থাকবে অ্যামিনো গ্রুপ NH_2 এবং কার্বক্সিল গ্রুপ COOH।

অ্যামিনো অ্যাসিড থেকেই তৈরি হয়ে থাকে জীবদেহের অপরিহার্য উপাদান প্রোটিন।

হাইড্রোক্সি অ্যাসিড

অ্যামিনো অ্যাসিডের অ্যামিনো গ্রুপটির জায়গায় যদি একটি হাইড্রোক্সিল গ্রুপ বসে তাহলে যে পদার্থটি পাওয়া যায় তার নাম হাইড্রোক্সি অ্যাসিড। দুটি পরিচিত দৃষ্টান্ত—দইয়ের ল্যাক্টিক অ্যাসিড ও কমলালেবুর রসের সাইট্রিক অ্যাসিড।

দইয়ের ল্যাকটিক অ্যাসিড এমনিতে তৈরি হয় না, সেজন্যে ব্যাক্টেরিয়ার সাহায্য চাই। এই ব্যাক্টেরিয়া আসলে দুধের শর্করাকে গাঁজিয়ে তোলে। পেশীর কোষেও এই ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হয়ে থাকে। আর সাইট্রিক অ্যাসিডের ভূমিকা জীবন্ত কোষের রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এমনি নানা রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর আদিম সমুদ্রে তৈরি হয়েছিল অজস্র জৈব পদার্থ। তারপরেও আরো নানা রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় জৈব পদার্থের মধ্যে এসেছিল বিশেষ একটি বিন্যাস।

আগের আলোচনায় আমরা বলেছি, জীবকোষের অভ্যন্তরে জটিল ও বিপুল রাসায়নিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়া ঘটে থাকে। বিষয়টিকে এবার আমাদের রাসায়নিকের দৃষ্টি থেকে দেখবার চেষ্টা করতে হবে। প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কে ধারণা করতে হলে প্রাণের এই কর্মশালার রহস্য জানা চাই। কারণ, কথাটা আমরা আগেও বলেছি, প্রাণের উপাদানগুলো কিভাবে পাওয়া গেল—তা খুব বড়ো প্রশ্ন নয়। পৃথিবীর জল-মাটি-বাতাসেই উপাদানগুলো থেকে গিয়েছিল। আমাদের কাছে তার চেয়েও বড়ো প্রশ্ন : এই উপাদানগুলোর মধ্যে এমন আশ্চর্য বিন্যাস কি-করে সম্ভব হল? আণুবীক্ষণিক একটি প্রাণবিন্দু—অথচ তারই মধ্যে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অকসাইড ও জল থেকে তৈরি হচ্ছে শর্করা! তারই মধ্যে শর্করা স্টার্চ ও ফ্যাট "পুড়িয়ে" উৎপন্ন হচ্ছে শক্তি! এ-ব্যাপারটি কি করে ঘটতে পারল? জীববিজ্ঞানীরা রসায়নবিদ্যার সাহায্যে পর্যবেক্ষণ ও